সেকেলে কথা

শতক সূচনায় মেয়েদের স্মৃতিকথা

সংকলন ও সম্পাদনা

অভিজিৎ সেন   অভিজিৎ ভট্টাচার্য

নয়া উদ্যোগ ।। কলকাতা

সূচি

সংকলন প্রসঙ্গে

সমাজ-ইতিহাসচর্চার অনেক উপাদানের মধ্যে ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণও যে একটি উপাদান হতে পারে, সে-কথা ভেবেই এই সংকলন। তবে উপাদান হিসেবে সেগুলো আদৌ গ্রহণযোগ্য কিনা সে বিচারের ভার সমাজ-ইতিহাস গবেষকের। বর্তমান সংকলনভুক্ত রচনাগুলো (হেমলতা ঠাকুরের লেখাটি বাদে) এই শতকের প্রথমার্ধে লেখা। প্রতিটি লেখাই তৎকালীন খ্যাতনামা মহিলাদের দ্বারা রচিত, যাঁদের অনেকেই আজ বিস্মৃত। এবং এদের মধ্যে কোনো লেখাই এককভাবে বা একত্রিত হয়ে অন্য কোনো সংকলনে স্থান পেয়েছে বলে জানা নেই।

মেয়েদের লেখা স্মৃতিকথা কেন—এ-প্রশ্ন উঠতে পারে। একটা সম্ভাব্য উত্তর হল কয়েকবছর আগে থেকে কিছু প্রতিষ্ঠানিক উদ্যোগে মেয়েদের রচনা উদ্ধার করার চেষ্টা চলছে বা উদ্ধার করা হচ্ছে—সেই সূত্র ধরেই এই সংকলন। আবার উদ্ধার করাটা প্রয়োজনীয়ও হয়ে পড়েছে। পুরুষকেন্দ্রিক ব্যবস্থার অবহেলায় এই অমূল্য রচনাগুলো ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাবার আগে যতটা উদ্ধার করা সম্ভব সে-কথা মাথায় রেখে। অন্য একটা উত্তর হতে পারে— লেখাগুলো এই শতকের, কিন্তু এদের অধিকাংশেরই বিষয়বস্তু হল গত শতকের ব্যক্তিত্ব, প্রতিষ্ঠান, বা সাধারণভাবে সামাজিক রীতিনীতি। আর সেই সময়টা বাঙলাদেশে মেয়েদের অবস্থা পরিবর্তনেরও একটা বিশেষ সময়। এই বিশেষ সময়ের ইতিহাসের প্রায় সবটাই নথিভুক্ত; কিন্তু নথিভুক্ত ইতিহাসই তো আর সমগ্র সমাজ-ইতিহাস নয়! কোনো ঐতিহাসিক মুহূর্তের টানাপোড়েনের অনেককিছুই ঐতিহাসিক দলিলের মধ্যে না-বলা থেকে যায়। তার আবার অনেকটাই ধরা পড়ে এইসব ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণের মধ্যে—বিশেষ করে তা যদি কোনো মহিলার কলমে লেখা হয়। বর্তমান সংকলনের লেখাগুলো থেকেই পাঠক বুঝবেন 'পুরুষালি' নথিভুক্তকরণের পরিবর্তে এখানে অধিকাংশ রচনাতেই গুরুত্ব পেয়েছে ব্যক্তিগত অনুভূতির। আর এই অনুভূতির সাহায্যেই ইতিহাসের পাতা থেকে বেরিয়ে ঘটনাগুলোকে দেখা যেতে পারে নতুন আলোয়।

'পুরাতন বেথুন স্কুল'—লীলাবতী মিত্রের এই লেখাটি দিয়ে সংকলনের শুরু। এ-দেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে বেথুন স্কুল ও কলেজের অগ্রণী ভূমিকার কথা সবাই জানেন। নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। লীলাবতী মিত্র তাঁর লেখায় পুরোনো দিনের বেথুন বিদ্যালয়ের—অর্থাৎ তিনি যে-সময়ে এখানকার ছাত্রী ছিলেন, সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করেছেন।

প্রসন্নময়ী দেবীর আত্মজীবনী *পূর্বস্মৃতি* আমরা অনেকেই পড়েছি। এর বাইরে আরো

কিছু পবিবাবিক স্মৃতি-বিষযক টুকবো লেখা তিনি লিখেছিলেন। এগুলো কোনোটাই কিন্তু *পূর্বস্মৃতি*-তে বর্ণিত ঘটনাব পুনবাবৃত্তি নয। *ভাবতবর্ষ* পত্রিকায প্রকাশিত 'আশুতোষ' বচনাটিতে, প্রমথ চৌধুবীব অগ্রজ, বর্তমানে প্রায-বিস্মৃত আশুতোষ চৌধুবীব জীবন ও দেশহিতব্রত-কার্যেব বিস্তৃত পবিচয আছে।

যে প্রবন্ধেব নামানুসাবে সংকলনেব নামকবণ, স্বর্ণকুমাবী দেবীব সেই 'সেকেলে কথা' বচনায ঠাকুব-পবিবাবে মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীব অন্তঃপুবশিক্ষাব নিটোল একটা ছবি আমবা পাবো। লেখাটি সুপবিচিত হলেও সম্ভবত এব আগেকাব কোনো সংকলনে প্রকাশিত হযনি।

গিবীন্দ্রমোহিনী দাসীব *ভাবতী*-কেন্দ্রিক লেখাটিতে স্বর্ণকুমাবী দেবী এবং *ভাবতী* সম্পাদনায তাঁব অবদানেব কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হযেছে। মানকুমাবী বসু, নিস্তাবিণী দেবী, সবোজকুমাবী দেবী এবং কামিনী বায—প্রধানত কবি হিসাবে খ্যাতিলাভ কবলেও এঁদেব গদ্যবচনা যে কতটা সাবলীল, আশা কবি প্রত্যেক পাঠকই তা উপলব্ধি কববেন।

হিবণ্ময়ী ও সবলা দেবী চৌধুবানীব বচনাদ্বযে *ভাবতী* পত্রিকাব যুগ্ম-সম্পাদনায এঁদেব ভূমিকা এবং ঠাকুব-পবিবাবেব স্মৃতিচাবণে দু-ধবনেব মনোভঙ্গিব পবিচয আছে। সবলা দেবীব 'আমাব বাল্যজীবনী', পববর্তীকালে প্রকাশিত তাঁব সুপবিচিত স্মৃতিকথা *জীবনেব ঝবাপাতা* বইযেব বীজ-স্বরূপ।

স্বল্পখ্যাত দুই লেখিকাব যে-দুটি লেখা সংকলিত হল, তাঁবা হলেন মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায ও সজলনযনা দেবী। মতিলাল ঘোষেব কন্যা সজলনযনা ১৮৮০-৯০-এব ঢাকা শহবেব স্মৃতিচাবণ কবেছেন। মৃণালিনী তাঁব পিতাব কর্মস্থল মথুবায প্রাক্-বিবাহ-জীবন কাটিয়েছেন। তীর্থ-শহব মথুবা ও বৃন্দাবনে অনুষ্ঠিত নানা ধর্মীয পার্বণেব বিস্তৃত বিববণ ও স্থানমাহাত্ম্য অসমাপ্ত এই বচনাটিতে বর্ণিত হযেছে।

সবলা দেবী, সবোজকুমাবী দেবী, মানকুমাবী বসুদেব পববর্তী প্রজন্মেব দুই প্রখ্যাত লেখিকা অনুরূপা ও নিরুপমা দেবীব *ভাবতী*-স্মৃতিতেও একই বিষযেব ওপব দুটো লেখায দুবকম আস্বাদ আমবা পাই।

সংকলনেব সব শেষেব লেখা হেমলতা ঠাকুবেব। তাঁব পিতৃবংশ ও শ্বশুববাড়িব স্মৃতিকথা অনেক পববর্তী সময়ে *দেশ* পত্রিকায মুদ্রিত হযেছিল।

সংকলনে মূলেব ভাষাবীতি ও বানান অক্ষুণ্ণ বাখা হয়েছে। মূলেব বানানে যেরকম অসাম্য ছিল. সেটিও অপবিবর্তিত আছে। পাঠকেব পক্ষে লেখার বসগ্রহণে তা হয়ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। বর্ণিত ঘটনাবলীব গুরুত্ব অনুসাবে কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে, অনবধানতাবশত কিছু হয়ত বাদ গেছে। সংকলনে এ-ধবনের ত্রুটির জন্য শুধুমাত্র সংকলকদ্বয়ই দায়ী থাকবেন। সংকলনভুক্ত প্রায়-বিস্মৃত এই বচনাগুলোকে এখনকার

পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়াই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এইসব রচনা পাঠে তাঁরা যদি আনন্দিত ও কিছুমাত্র উপকৃত হন তবেই আমাদের শ্রম সার্থক বিবেচনা করব।

বইটি প্রকাশের ব্যাপাবে অনেকেব সাহায্যলাভ করেছি। ছাপাবার ঝুঁকি নিয়েছেন নয়া উদ্যোগ-এব কর্ণধাব শ্রী পার্থশংকব বসু। দৃষ্টিনন্দন প্রচ্ছদ এঁকে দিযেছেন শ্রদ্ধেয় শ্রী অজয় গুপ্ত। নিরন্তর উৎসাহ প্রদান করেছেন বন্ধুবর শ্রী তরুণকান্তি পাইন। সজলনয়না দেবীর রচনাটি ছাপানোর জন্য উদ্ধার করে দিয়েছেন শ্রী সত্যব্রত ঘোষাল। শ্রী অভিজিৎ মুখোপাধ্যাযের সুপরামর্শে উপকৃত হযেছি। সংকলনভুক্ত প্রায় প্রতিটি লেখার হদিশ পেযেছি শ্রীমতী চিত্রা দেবের *অন্তঃপুরের আত্মকথা* নামক বইযে মুদ্রিত তালিকা থেকে। মুদ্রণকার্য চলাকালীন স্বার্থহীনভাবে সহায়তা করেছেন শ্রীমতী করুণা চক্রবর্তী, শ্রীমতী নূপুব সরকার ও শ্রীমতী দীপান্বিতা দাস। এঁদেব প্রত্যেকের কাছেই আমবা কৃতজ্ঞ।

অভিজিৎ সেন

অভিজিৎ ভট্টাচার্য

পুরাতন বেথুন স্কুল

লীলাবতী মিত্র

অদ্য এখানে পুরাতন ও নূতন ছাত্রীর সম্মিলন। অদ্যকার দিনে একবার অতীতের ও বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

আমি এই স্কুলের পুরাতন ছাত্রী। তখনকার সঙ্গে ও এখনকার সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায়, তখন স্কুলের কি শোচনীয় অবস্থা ছিল আর এখন কি উন্নতি হইয়াছে। শুধু দেশে নয়, সমস্ত সভ্য জগতের নিকট বেথুন কলেজ আজ সম্মানিত হইয়াছে। বাঙ্গালার দেশাচারে নিষ্পেষিত নারী জাতির মধ্যে এই কলেজ, জ্ঞান বিস্তার করিয়া পাশ্চাত্ত্য জগতের নিকট গৌরব স্থল হইয়াছে। আমি যখন স্কুলে আসি তখন আমার সাত বৎসর বয়স। তখনকার কথা আমার সব মনে পড়ে। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়[১] নামক আর একটি যে স্কুল ছিল, তাহাতে বয়স্ক মেয়েরা শিক্ষা পাইত। সে স্কুল যখন এই স্কুলের সঙ্গে একত্র হয় তখন আমার বয়স চৌদ্দ বৎসর। তখনি এই কলেজের উন্নতির সূত্রপাত হইল। শিক্ষা প্রণালী সব বদলাইয়া নব প্রণালীতে শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমার মনে বড় আনন্দ হইল যে, আমি উচ্চ পরীক্ষা দিব। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পিতা অসুস্থ হওয়াতে আমাকে লইয়া বিদেশে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য যাইলেন। আমার মনে একটা আঘাত লাগিল যে, আমার কিছুই লেখাপড়া হইল না।

আমি যখন স্কুলে আসি তখন দুই জন ইংরাজ শিক্ষয়িত্রী ও একজন ফিরিঙ্গি শিক্ষয়িত্রী এবং একজন পণ্ডিত শিক্ষা দিতেন। এই স্কুলে একজন বৃদ্ধা ঝি ছিল। সে বাড়ী বাড়ী গিয়া প্রত্যেক মাতাকে বুঝাইত যে কন্যাদের লেখা পড়া শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইহা দ্বারা সে খুব কৃতকার্য্য হইত। অনেক মেয়ে এই স্কুলে ভর্ত্তি হইত। বোধ হয় শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে তাহার একটা বন্দোবস্ত ছিল। দশ বার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত মেয়েরা এখানে পড়িত। স্কুল ছাড়াইয়া লইয়া পিতা মাতা তাহাদের বিবাহ দিতেন। আমি এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছোট মেয়ে শরৎকুমারী, আমরা তখনকার স্কুলের বড় মেয়ে ছিলাম। বার তের বৎসর আমাদের বয়স ছিল। তখন এ স্কুলে সামান্য লেখা পড়া হইত। উচ্চ শ্রেণীতে— নবনারী, চারুপাঠ, বস্তুবিচার, ভূগোল, অঙ্ক ও থার্ড বুক এই পড়া হইত। একবার এই পর্য্যন্ত দুটী মেয়ের পড়া সম্পূর্ণ

হইল দেখিয়া বড় মেম ঠাট্টা করিয়া সে মেয়ে দুটিকে বলিলেন– "এখন তোমরা কলেজে ছেলেদের সঙ্গে পড় গিয়ে।" তিনি জানিতেন না যে–

যে বৃক্ষ রোপিছ তুমি ছাইবে সে বঙ্গ ভূমি!

আজ বহু নারী কলেজে পড়িতেছে, সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতেছে, কি আনন্দ!

তখন নয়টার সময় স্কুলে আসিয়া মেয়েরা এগারটা পর্য্যন্ত খেলা করিত। স্কুল এগারটার সময় বসিত। মেয়েদের পড়াশুনা কেমন হইতেছে সে দিকে শিক্ষকদের কিছু মাত্র দৃষ্টি ছিল না। আমি বাড়ীতে আসিয়া বইগুলি চাঙ্গারী চাপা দিয়া রাখিতাম, স্কুলে যাইবার সময় তাহাই লইয়া যাইতাম। শিক্ষকেরা পড়া শেষ হইল কি না তাহার যত্ন লইতেন না। এক পড়াই আমাদের ২/৪ দিন থাকিত। কেবল পাঠ দিবার সময় মেয়েদের একবার মানেগুলা বলিয়া দিতেন। যে মেয়ের স্মরণ শক্তি প্রখর সে ক্লাশে উঠিতে সমর্থ হইত। তখন স্কুলের বড়মেম মধ্যে মধ্যে মেয়েদের বাড়ী যাইয়া তাহাদের মায়েদের সঙ্গে দেখা করিতেন। যে দিন যে বাড়ী যাইতেন তাহার পূর্ব্ব দিন সে মেয়েকে বলিয়া দিতেন যে কল্য তোমাদের বাড়ী যাইব। মেমরা হিন্দি এবং এক একজন বাঙ্গালাও বলিতে জানিতেন। মেমরা যখন কার্য্যত্যাগ করিয়া বিলাত যাইতেন তখন এই গ্যালারিতে সকল মেয়েকে বেলা দুইটার সময় বসাইতেন। এবং একজন শিক্ষয়িত্রী নামের খাতা লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। এক একটী মেয়ের নাম ধরিয়া ডাকিতেন আর বড় মেম গম্ভীরমুখে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাহাকে চুম্বন করিতেন। কোন কোন মেম কখনও কখনও কাঁদিয়া ফেলিতেন। অনেক ছাত্রীর মনে বড় মেমের বিদায়ের জন্য দুঃখ হইত। আমার মনে আছে এক একজন শান্তপ্রকৃতি মেমের জন্য আমার বড় দুঃখ হইত। তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলে ৩/৪ দিন পর্য্যন্ত বাড়ীতে কাঁদিয়া অধীর হইতাম। পিতা মাতা কত রকমে ভুলাইতেন। কিছুতে ভুলিতাম না ; পরে আপনা হইতে বিষাদ কমিত।

যখন স্কুল বসিত তখন একটা সঙ্গীত হইত। সে গান সম্পূর্ণ মনে নাই। তাহার একটু মনে আছে–

আইস আমরা পাঠশালায় যাই,
ছোট ছেলে ছোট মেয়ে পাঠশালার মধ্যে তুষ্ট হয়।

কি যে অপূর্ব্ব গান! কিন্তু আমাদের ভাল লাগিত। যখন গ্যালারিতে আমরা আসিয়া বসিতাম, কিছুক্ষণ মেয়েরা বড় গোলমাল করিত, কিছুতে থামিত না, তখন পণ্ডিত আসিয়া মুখে একটা আঙ্গুল রাখিয়া গানের স্বরে বলিতেন–

চুপ চুপ করো চুপ, একেবার কর চুপ,
কারণ শিক্ষক বলেন চুপ, চুপ.চুপ চুপ।

তখন মেয়েরা ভয়ে চুপ করিত। একবার স্কুলে কথা হইল, যে মেয়ের গান ভাল

হইবে তাহাকে বড় মেম মেডেল দিবেন। বড় মেমের সুন্দর মেয়েদের উপর কৃপাদৃষ্টি ছিল। স্কুলের মধ্যে একটী মেয়ে ছিল, সে দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু তাহার গলা মোটেই সুন্দর ছিল না। তবু যখন গ্যালারি সুদ্ধ সব মেয়েরা গান করিত; তিনি বলিতেন সেই মেয়ের গান ভাল, অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীরা আড়ালে বলিতেন, "তাহা নয়।" কিন্তু বড় মেমের কাছে বলিতেন, হাঁ, ওর গানই ভাল, ইহাতে সে মেয়েটী প্রাইজের সময় স্বর্ণ মেডেল পাইল। মেমের পক্ষপাতিতাতে তখন রাগ ধরিয়াছিল; এখন মনে হয়, সৌন্দর্য্যের এমনি প্রভাব!

তখনও প্রাইজের সময় সমস্ত স্কুল সাজান হইত এবং কলিকাতার অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করা হইত। বড়লাট-পত্নী কিম্বা কন্যা আসিয়া প্রাইজ দিতেন। একবার প্রাইজের সময় বড়লাট নর্থব্রুকের কন্যা আসিলেন। তাঁহার সম্মানের জন্য বড় মেম আমাদিগকে নিম্নলিখিত সঙ্গীত শিখাইয়াছিলেন—

নমস্কার, নমস্কার, সুমতি মিস ব্যারিঙ্,
এখন আমরা হর্ষিত হই, কারণ আপনার দর্শন পাই,
নমস্কার, নমস্কার গুণবতী; দয়া কর এই বিদ্যালয়ের প্রতি। ইত্যাদি।

একবার কোন লাটপত্নী প্রাইজ হইবার সময় একটী মেয়েকে খুব গহনা পরিয়া আসিতে দেখিয়া শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "এ কাহার মেয়ে?" সেই হইতে প্রত্যেক প্রাইজের সময় শিক্ষয়িত্রীরা মেয়েদের যার যা গহনা আছে পরিয়া আসিতে বলিয়া দিতেন। আমি দেখিতাম বড় লোকের মেয়েরা মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত এত গহনা পরিয়া ঝনর ঝনর শব্দ করিয়া আসিত যে তাহাদিগকে একটা গহনাঢাকা জন্তু বিশেষ বলিয়া মনে হইত। এমন আড়ষ্ট হইয়া, অলঙ্কার হারাইবে ভয়ে বিষণ্ণ হইয়া বেড়াইত, যেন গহনার বোঝা নয়, সাক্ষাৎ দুঃখের বোঝা ঘাড়ে করিয়া বেড়াইত। যার গহনা বেশী, শিক্ষয়িত্রীরা তাহাকে প্রথম লাইনে বসাইতেন, কেননা লাটপত্নীর নজর তার উপরে পড়িবে। প্রাইজের দিন লাটপত্নীর দর্শনের জন্য মেয়েদের সব সেলাই একটা টেবিলে সাজান হইত। সেলাই, কার্পেট বুনন, গলাবন্ধ, চাদরের ধার মুড়িয়া বখেয়া সেলাই। পড়ার পুরস্কারের চেয়ে সেলাইয়ের পুরস্কার যেন ভাল হইত বলিয়া মনে হয়। প্রাইজ সভা ভাঙ্গিবার সময় 'গড সেভ দি কুইন' গান হইত।

এক একদিন ক্লাশ বসিবার পূর্ব্বে শিক্ষয়িত্রীরা বলিতেন, অদ্য তোমাদের ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাতের অনুকরণ করিতে হইবে। আমাদের তাহা এইরূপে শিখাইয়াছিলেন, প্রথম গ্যালারি সুদ্ধ মেয়ে মুখে হিস্ হিস্ শব্দ করিত, শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে আমাদিগকে ইহার অনুকরণ করিতে হইত। পরে হাতের আঙ্গুল গ্যালারিতে ফেলিয়া টপ্ টপ্ শব্দ করিতে হইত। তাহা বৃষ্টির অনুকরণ। যখন সব মেয়ে বসিয়া গ্যালারিতে এক সঙ্গে পায়ের দুম্ দুম্ শব্দ করিত তখন তাহাই বজ্রের অনুকরণ হইত। তন্মধ্যে যে

মেয়ের পায়ে মল থাকিত, শিক্ষয়িত্রীরা বড় খুশী হইয়া বলিতেন যে তার পায়ের শব্দের সঙ্গে বজ্রের শব্দের তুলনা হইতেছে। মলের সমাদর দেখিয়া প্রায়ই মেয়েরা মল পরিত।

একবার একজন বড় মেম গ্যালারিতে দাঁড়াইয়া আমাদের ড্রিল করাইতেন। প্রথমে তিনি নিজে যে প্রকার করিয়া হাত ঘুরাইতেন, আমাদেরও সেই প্রকার করিতে হইত। ইহাতে আমাদের বড় হাসি পাইত। কিন্তু কষ্টে হাসি চাপিয়া রাখিতাম। আবার গ্যালারি হইতে নামাইয়া সঙ্গে সঙ্গে এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বেড়াইয়া আনিয়া তবে ক্লাশে আমাদের পড়িবার হুকুম দিতেন। ইহাতে পাঠের অনেক সময় চলিয়া যাইত। তখন স্কুলের সকল কার্য্যই বিশৃঙ্খলার সহিত হইত। এখন কত শৃঙ্খলার সহিত সুন্দর দৃষ্টান্তের দ্বারা কলেজের কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

যখন বঙ্গমহিলা স্কুল এই স্কুলের সঙ্গে যুক্ত হইবার কথা হইল, আমার তখন একটু বেশী বয়স হইয়াছে, আমি স্পষ্টই বুঝিলাম সমস্ত শিক্ষয়িত্রী ও পণ্ডিত মহাশয়গণ বিরক্ত হইলেন। তাঁহারা হয়ত ভাবিলেন কেন এতদিন ত বেশ ছিলাম; আবার দুইটা স্কুল একত্র হইয়া সব বদলাইয়া যাইবে। যাহা হউক, দুইটা স্কুল এক হইয়া গেল; কয়েকজন পূর্ব্বের শিক্ষয়িত্রী আর কয়েকজন বঙ্গমহিলা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী রহিলেন। কিছু দিন এই ভাবে স্কুল চলিতে লাগিল। বঙ্গমহিলা স্কুলের শিক্ষয়িত্রী মেয়েদের লইয়া ছুটির সময় নানা প্রকার ক্রীড়া করিতেন। আমাদের স্কুলের যে দুই এক জন শিক্ষয়িত্রী ছিলেন তাঁহারা আমাদিগকে শিখাইয়া দিতেন, উহাদের চীৎকার করিয়া এই কথা বল বুড়মেয়ে বুড়ীমাগী নাচিতেছ, এই কথা বারে বারে বল। এ দলের মেয়েরা তাহাই বলিত। কিন্তু বঙ্গমহিলার শিক্ষয়িত্রী বাঙ্গালা বুঝিতেন না বলিয়া কিছুই বলিতেন না। পরে আমার খুব কঠিন পীড়ার জন্য তিন মাস স্কুল ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। আরোগ্য হইয়া আসিয়া দেখিলাম পুরাতন শিক্ষয়িত্রী কেহই নাই। কেনই বা থাকিবে। সদ্ভাব বিনা কি কাজ চলে ? পূর্ব্বেকার শিক্ষয়িত্রীরা স্কুলের উন্নতি বুঝিলেন না।

বাৎসরিক পরীক্ষার সময় কয়েকজন সহরের নামজাদা বাঙ্গালী আমাদের পরীক্ষা করিতেন। পরীক্ষার ফলে কোন মেয়ে সেদিন ক্লাশে উঠিতে না পারিলেও পরদিন তাহাকে ক্লাশে উঠাইয়া দেওয়া হইত।

আমরা বাড়ী যাইবার সময় গাড়ীতে খুব চীৎকার করিয়া পদ্যপাঠের পড়া মুখস্থ করিতাম। 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে' ইত্যাদি আওড়াইতে আওড়াইতে বাটীতে আসিতাম। তখন সিডিশন ছিল না।

তখনকার সঙ্গে এখনকার তুলনায় কি আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখা যাইতেছে। শিক্ষার প্রকৃত ফল আমাদের বঙ্গীয়া ভগিনীদের হৃদয়ে কি সুন্দর রূপে ফুটিয়াছে।

আমাদের বঙ্গনারীরা বি. এ., এম. এ. পাশ করিয়া কেমন সুশৃঙ্খলার সহিত এই কলেজের গুরুতর ভার চালাইতেছেন। এই কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কত মহিলা এক একটি গৃহকে সুখ-শান্তিময় করিয়া রাখিয়াছেন। এবং পতি, পুত্র, ভ্রাতাকে দেশের সৎকার্য্যের উপযোগী করিতেছেন। এ সকল দেখিয়া কাহার না প্রাণ আনন্দে পুলকিত হয়। এই স্কুলে এখন মেয়েরা কত বড় হইয়াও লেখা পড়া শিখিতেছেন। আদর্শ শিক্ষয়িত্রীদের পরিচালনায় তাঁহারাও কালে আদর্শ পরিবারে পরিণত হইয়া দেশের উপকারে আসিতেছেন। নারীজীবন যে আর অবহেলা অবজ্ঞার জীবন নয় তাহা দেশীয় লোকেরা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছেন। রমণী সুশিক্ষিতা হইলে যে সংসারের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হয় এই দৃষ্টান্ত এখন আর কেবল পাশ্চাত্য দেশের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। আমাদের দেশে পুরাকালে তাহার কত প্রমাণ রহিয়াছে। এখন আবার দেশ তাহার প্রমাণ পাইতেছে। অতএব এই ক্ষেত্রে বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাতাগণকে এবং লেডি প্রিন্সিপালমহাশয়া এবং অন্যান্য শিক্ষয়িত্রীদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া আমরা থাকিতে পারিতেছি না। তাঁহারা যোগ্য হইয়া যে এই মহৎ ব্রত লইয়াছেন ইহাই আমাদের প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন।*

* বেথুন স্কুলেব ছাত্রী-সম্মিলনীতে পঠিত।

ভাবতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

সেকালের কথা

প্রসন্নময়ী দেবী

অদ্য যে সময়ের কথা বলিতে যাইতেছি সে প্রায় একশত বৎসরেরও পূর্ব্বের কাহিনী। তখনকাব আচাব ব্যবহার রীতি নীতি এক্ষণকার অপেক্ষা স্বতন্ত্র। সে সময এ দেশের অবস্থা বড় সুখের ছিল, দীন দুঃখী স্নিগ্ধস্নাত তৈলাক্ত দেহে দুই বেলায় উদর পূরিয়া আহারান্তে নিজ নিজ কর্ত্তব্য কার্য্য করিত। টাকায় তখন দশ সের তৈল, চারি পাঁচ সের গব্য ঘৃত ও দেড় কি দুই মণ চাউল। ক্ষেত্রে অজস্র শস্য জন্মিত। গৃহপালিত গাভিগণ স্বচ্ছন্দ ভাবে দুগ্ধ দান করিত। বাগানের তরকারী-ফল, পুকুরের মৎস্য ও গ্রামের জমীদার মহাশয়েরা দানে মুক্ত হস্ত। পুত্রের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, কন্যার বিবাহ ও পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিতে যেমন গ্রামের ও তাহার নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইতেন, তেমনি গ্রামের গরীব লোক ও দাস দাসী-বর্গের পরিবারগণকে খাওয়ান হইত। এক এক ভূস্বামীর গৃহে নিত্য একশত ব্যক্তি আহার করিত। তাহার উপর অতিথি অভ্যাগতের সেবা ছিল। কর্ত্তাদিগের দাবা পাশা খেলার সঙ্গীরাও রাত্রে আহার করিয়া যাইত, তাহাদের চির নিমন্ত্রণ। বৈঠকখানার আঙ্গিনার এক পার্শ্বে দিব্য বড় একখানি ঘর থাকিত, তাহাতে একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য ভাণ্ডার রক্ষা করিত। সেই ঘর "গোলাঘর" ও ভৃত্য "গোলাদাব" নামে কথিত হইত। সে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া– নিত্যকর্ম্ম "সিধা" মাপিতে বসিত, তাহার হাতের ও মুখের বিরাম বিশ্রাম থাকিত না, ক্রমাগত লোকসংখ্যা গণনা করিয়া দ্রব্যাদি যোগাইত। গৃহদেবতার ভোগের সহিত বিধবাগণের, গৃহস্বামীর অন্তঃপুরের আত্মীয় স্বজনের "সিধা" ভিতরে পাঠান হইত, তাহার পর যে সকল অতিথি বাড়ীতে রন্ধন করিয়া খাইবে তাহাদের যোগ্যরূপ অযাচিতে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হইত। মুসলমান কর্ম্মচারী গোমস্তা পাইক সর্দ্দার কৃষাণ ও প্রজাগণ (যাহারা জমীদারের কাছারীতে কার্য্যগতিকে আসিত) হিন্দুর অন্নপাক খাইত না–তাহাদের সমুদায় আহারীয় প্রদান করিতে হইত। ইতিমধ্যে মুষ্টিভিক্ষা, অন্দরের দৈনিক দানের চাউল ইত্যাদিও দিতে হইত। বেলা আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত গোলাদার অবসর মাত্র পাইত না। ইহা ব্যতীত কোন কিছু কম পড়িলে গৃহিণী প্রেরিতা প্রাচীনা দাসীর ভর্ৎসনা নীরবে সহ্য করিয়া কার্য্য সমাধা করিত। মাসিক

ভাণ্ডারের ব্যয়ের হিসাব তাহার হস্তে, সে ব্যক্তি প্রতি মাসের শেষে সন্তোষজনক হিসাব নায়েব মহাশয়ের নিকট দাখিল করিয়া পুনর্ব্বার দ্রব্যাদি আনয়ন করিতে পারিত।

বৃহৎ পরিবারে দাস দাসীর অভাব ছিল না। পাঠশালার পরিচর্য্যায় পাঁচ ছয় জন চাকরাণী ও দুই তিন জন চাকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত; কেহ মৎস্য, কেহ তরকারী কুটিয়া সকলকে বিতরণ করিত। দুগ্ধ জ্বালের জন্য পৃথক একখানি ঘরে কেবলমাত্র দুগ্ধ জ্বাল, দধি ও ঘৃত প্রভৃতি তৈয়ার হইত। সেই দধি দুগ্ধ, গৃহস্বামীর পরিবার হইতে কৃষকগণ পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দভাবে পাইত, তাহাতে গৃহকর্ত্রী দ্বিরুক্তি করিতেন না। পূজারী ব্রাহ্মণও কর্ত্তার সহিত সমান ভাগে উপাদেয় দ্রব্যাদি খাইতে পাইত। সে সময়ে কেন, অদ্যাপিও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী পল্লীগ্রামে পাচক ব্রাহ্মণগণ বাবুদের খাদ্যের সকল অংশই পাইয়া থাকে।

গৃহিণীমার দৈনিক কার্য্য ছিল দেবপূজা, অতিথি সেবা, পুত্র, কন্যা, পুত্রবধূ, ভাগিনেয় জামাতা নাতী নাতিনী এবং আত্মীয় কুটুম্বগণের ও দাস দাসীর আহারাদি দেখা। প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে বংশানুক্রমিক বিগ্রহ "শ্যামরায়" "মঠের শিব" এবং " মঙ্গলচণ্ডী"র মন্দির প্রক্ষালন করিয়া স্বহস্তে তাঁহাদের পূজার আয়োজন করিতেন ও নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ, পূজা ধ্যান ধারণান্তে অন্দর মহলে আসিয়া কাহার কি প্রয়োজন এবং দৈনিক আহারের ব্যবস্থা করিতেন। গৃহিণীর জ্যেষ্ঠ কন্যা বা—(বিধবা) পুত্রবধূ সকলের জলযোগের আয়োজন করিতেন, সে ভার তাঁহাদের হস্তে। সবাই স্নাত হইয়া, পূজান্তে সধবাগণ ললাটে রক্তচন্দনের ও সীমন্তে সিন্দূর ফোটা পরিয়া গৃহকার্য্যে লক্ষ্মীপ্রতিমাবৎ শোভা পাইতেন; আর; বিধবাগণের শ্বেতচন্দন চর্চ্চিত ভালে, সংযমিত জীবন, শুভ্র বস্ত্র পরিহিতা ব্রত-নিয়মে কৃশাঙ্গী যেন সৌন্দর্য্যময়ী মহাশ্বেতার ন্যায় ব্রহ্মচারিণী সদা দয়া মমতায় দ্রবীভূত হইয়া, বিষাদহাস্যে বৈধব্যভার বহন করিয়া, রোগীর সেবায় ও গৃহ কার্য্য পালনে জীবন উৎসর্গ করিয়া সবাইকে সাহায্য করিতেন। ছোট ছোট বধূরা রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা—পাচক ব্রাহ্মণদিগের হস্তে আহার করা তখন নিয়ম ছিল না। কর্ত্তার মধ্যম কি কনিষ্ঠা ভ্রাতৃজায়ারা সেই সকলের পর্য্যবেক্ষণে ব্যস্ত থাকিতেন। গৃহের বৃদ্ধা পিতৃষ্বসা ও বড় ভগ্নীরা উপনয়ন বিবাহ "বার মাসে তের পার্ব্বণ" প্রভৃতি ভারি ভারি ব্যাপারে লোক লৌকিকতা রক্ষা, দানাদির ব্যবস্থায় নিযুক্ত রহিতেন। কর্ত্তা গৃহিণী তাঁহাদের মতানুসারেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। আবার অন্তঃপুরের বিচারকর্ত্রী তাঁহারাই; যদি কেহ কখন কলহ বিবাদ করিয়া গৃহশান্তি ভঙ্গ করিত তাঁহারা বিচারাসনে বসিয়া পুনঃ শান্তি স্থাপনান্তে তাহাদিগকে কঠোর ভর্ৎসনার শাসনে ও সৎপরামর্শ দানে ঠাণ্ডা করিয়া দিতেন।

এখনকার মত আমলা ও মামলায় জমীদারেরা সর্ব্বস্বান্ত হইত না; ভূস্বামী স্বয়ং জজ ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। প্রজার বিচার গ্রামের দলাদলি ও জ্ঞাতি বিরোধ ইত্যাদির মীমাংসা তিনি দশ পাঁচজন বিজ্ঞ আত্মীয় সহ মিলিয়া করিতেন। এক কপর্দ্দকও

পয়সা ব্যয় ছিল না, সকলেই তাহাতে খুসি হইয়া তাঁহার আজ্ঞা মানিয়া লইতেন। কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বা ভ্রাতুষ্পুত্র ছোট ভ্রাতা ভাগিনেয় ভগ্নিপতী এবং জামাতা জমীদারীর কার্য্য চালাইতেন। কোন প্রকার অত্যাচার কিম্বা অযথা শাসন ছিল না। রাজা প্রজা আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া সুখে দুঃখে পূর্ণতর সহানুভূতিতে জীবন কাটাইয়া দিত।

এই গ্রীষ্ম প্রধান দেশের পক্ষে মধ্যাহ্নে কোন গুরুতর কার্য্য করা সম্ভবে না, সেই জন্য প্রাতঃ সন্ধ্যায় লেখাপড়া ও জমীদারীর কার্য্য করিবার নিয়ম ছিল। বেলা আড়াই প্রহর অতীত হইলে আহারান্তে দিবা-নিদ্রার জন্যে সকলেই শয়নাগারে যাইতেন। পূর্ব্বে কর্ত্তারা স্বজন সহ পরিবেষ্টিত হইয়া, তৎপরে গৃহিণীরা ও সর্ব্বশেষে বধূগণ আহার করিতেন। দাস দাসীরা পর্য্যন্ত বধূগণের অগ্রে খাইত, তাহাতে কেহই অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইতেন না। তাহাদের জীবনে সংযম শিক্ষা প্রতিদিনই হইত। সেকালে প্রভু ভৃত্যে গুরু শিষ্য রাজা প্রজা এবং পিতা পুত্র সম্বন্ধ ছিল। বিজাতি সভ্যতার অনুকরণে আজিকালিকার দাস দাসীগণ ক্রীতদাসের ন্যায় সতত ব্যবহৃত। কর্ত্তা গৃহিণী এমন কি তাঁহাদের পঞ্চম বর্ষীয় পুত্র কন্যারাও গালি অপমানে সর্ব্বদা তাহাদিগকে উৎপীড়িত করিতে পশ্চাৎপদ নহে। এই সব কারণে পরিচারকবর্গও যথেচ্ছাচারী, প্রভুর সর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিতে পারিলে কৃতার্থ মনে করে।

সেকালের মেয়েদের মধ্যেও লেখা পড়া শিক্ষার নিয়ম ছিল। দিবাবসানে গৃহিণীরা একত্র হইলে কোনও প্রবীণা রামায়ণ ও মহাভারত অধ্যয়ন করিয়া শুনাইতেন। বধূগণ তাহা শুনিতে শুনিতে সিকা, চুলের দড়ি গাঁথা, সাঁচ কাটা ও পৈতা কাটা প্রভৃতি শিল্প কাজে রত থাকিতেন। কখন কখন পরচর্চ্চা হাস্য পরিহাসেও সময় অতিবাহিত হইত। বধূরা শাশুড়ী, বড় ননদিনী, গুরুজন দিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেন না, আকার প্রকারে ও দাসীর সাহায্যে কাজ উদ্ধার করিতে হইত।

এক্ষণকার ন্যায় সেকালে লেখাপড়া নারীগণের প্রধান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত ছিল না, গৃহকার্য্য, সন্তান পালন, দেব সেবা, এবং পরিবারবর্গের পরিচর্য্যা করাই অতীব সম্মানের বিষয় বলিয়া সকলে মনে করিতেন ও তাহাই রীতিমত মাতা-মাতামহীর নিকট শিক্ষা হইত। তথাপি ভদ্র কন্যাগণ গৃহ প্রতিষ্ঠিত (চণ্ডীমণ্ডপের) বিদ্যালয়ে, গ্রাম্য বালকের সহিত পিতামহদেবের কিম্বা জ্যেষ্ঠতাতের কাছে অধ্যয়ন করিত।

দশম বা একাদশ বর্ষীয়া বালিকা যৎকালে বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরালয়ে গমন করিত তখন তাহাদের বোর্ডিংস্কুলে যাইবার মত জীবনের সব প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য শিক্ষা সংযম ও নিয়মাদি পালন করিয়া পরে প্রকৃত রমণীয় গুণে ভূষিতা হইতেন। শাস্ত্রে বলে "যে গৃহে নারীর সম্মান আছে, সেই গৃহ প্রকৃত গৃহ নামের যোগ্য।"

পূর্ব্বে বিবাহাদি নিকট সম্পর্কীয় লোকের সঙ্গে হইত না। রাজসাহী পাবনা জেলার কন্যাগণ ঢাকা ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা সুবর্ণগ্রাম বিক্রমপুরে এবং সে অঞ্চলের কুমারীগণ পাবনা রাজসাহীতে পরিণীতা হইয়া আসিতেন। এইরূপ কুটুম্বিতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া আপৎ বিপদে পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিতেন। অতি দূরতর বংশ পরম্পরায় উদ্বাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় তখনকার সন্তানাদি বলবান সুস্থকায় এবং দীর্ঘজীবী হইত।

পূর্ব্বে দূরদেশ হইতে কন্যা ও বধূদিগকে গৃহে আনয়ন করিবার সময় জল ও স্থলপথে দস্যু ভয় প্রযুক্ত পাইক সর্দ্দার এবং লাঠিয়াল পাঠাইবার রীতি ছিল এবং শুনিতে পাওয়া যায়, কখন কখন দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া প্রভুর পদমর্য্যাদা রক্ষার্থে ভৃত্যগণ প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। অনেক জমীদার সে কালে ডাকাত বা ডাকাতের সর্দ্দার ছিলেন এবং লুকাইয়া লুকাইয়া দস্যুবৃত্তির সাহায্য করিয়া ধন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন।

সে কালে যেমন একান্নবর্ত্তী পারিবারিক নিয়ম ছিল, তেমনি সাংসারিক কার্য্যাদি সমস্ত বিষয় সুব্যবস্থা থাকায়, জমীদারগণের বিষয় সম্পত্তি অকালে লোপ পাইত না। ভ্রাতৃ বিরোধ গৃহ বিচ্ছেদ এবং শাশুড়ী বধূতে ঝগড়া বিবাদ তখনও যে ছিল না এমন নহে; তথাপি পুত্রগণের পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি গুরুজনের প্রতি আস্থা অচল থাকায় শাশুড়ীগণই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন ও বধূরা তাঁহার সম্মান রাখিয়া চলিতেন। আধুনিক কুলবধূর ন্যায় অগ্রে ভোজন, সৌখিন বিহার ও পাখার বাতাসে শয়ন করিয়া স্বামীরত্নের কর্ণকুহর শাশুড়ীর নিন্দাবাদে পরিপূর্ণ করিবার অবসর তাঁহারা পাইতেন না; রাত্রে লুকাইয়া কদাচিৎ কোন কথা বলিলে কর্ত্তার ভয়ে পুত্র সে কথা জীর্ণ করিয়া ফেলিতেন। উপার্জ্জিত অর্থ পত্নীর হস্তে দেওয়া নিতান্ত লজ্জার ও অসারতার বিষয় ছিল, পিতা মাতাই পুত্রধনের অধিকারী, তাঁহারা বধূগণের প্রয়োজন বুঝিয়া সবই দিতেন ও বাকী অর্থ সরকারে জমা করিয়া সন্তানের ধন বৃদ্ধি করিতেন।

কালসহকারে জাতীয় জীবন নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছে, দেশের ধন ধান্য লুপ্তপ্রায়, দুর্ভিক্ষ মহামারীতে সমগ্র ভারত জর্জ্জরিত, সৌভাগ্য লক্ষ্মীর অন্তর্দ্ধানে মনুষ্য প্রকৃতিরও পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দরিদ্র হইলে মনুষ্যজাতি নিতান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠে, সামাজিক সুপ্রথা তিরোহিত হয় এবং যাহা নাই তাহা দেখাইবার নিমিত্ত বাহ্য দৃশ্য বজায় রাখিতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অন্তঃসার শূন্য হইয়া থাকে, তাহাতেই—দেব সেবা অন্নদান গুরুজনের প্রতি ভক্তি প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে চলিয়া যায়, তখন লোক আপন আপন লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং সেকালের সহিত একালের মিল হইবার সম্ভাবনা নাই। সময়ের পরিবর্ত্তনে সমুদায় ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, যাহা ছিল তাহা আর নাই, সেদিনের লুপ্ত স্মৃতিমাত্র বহন করিয়া অদ্য আমরাও সেকালের অতীতের শ্রুত কাহিনী সমাপ্ত করিতেছি।

অন্তঃপুর, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮

ঘটক আগমন

প্রসন্নময়ী দেবী

রাজসাহী জেলার চারিদিকে রাজা মহারাজা, রাণী মহারাণী ও ধনী জমিদারগণের বাস। তাঁহাদের পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ দিবার বয়স হইলে তাঁহারা গ্রামে গ্রামে ঘটক পুরোহিত ও পুরাতন দাসদাসী পাঠাইয়া পাত্র ও কন্যা নির্ব্বাচন করাইতেন। কাহার ঘরে কাহার সন্তানসন্ততিগণের বিবাহ হইতে পারে তাহা সকলেই অবগত আছেন। চৌধুরী কন্যার কুলীন ভিন্ন কাপ শ্রোত্রিয়ের সঙ্গে বিবাহ হয় না। ধনবান উচ্চ কুলীন আবার কাপের ঘরে বিবাহ করিয়া ভঙ্গ হইতে মোটেই রাজি নয়। কন্যাগত কুল—সেইজন্য হরিপুর, কাশিমপুর ও নালোরের মেয়েদিগের সেকালে বিবাহ দেওয়া বড় কঠিন ব্যাপার ছিল। আজকাল অনেক সুবিধা হইয়াছে, তেমন কঠিন আর নাই। আমাদিগের ঘরের সুন্দরী ভগিনীদিগের বডমানুষের পুত্রের সহিত বিবাহ হইত। মৈমনসিংহের জমীদারগৃহে অনেকেরই সেকালে বিবাহ হইয়াছে।

"হাটিকুমড়োলের" লাহিড়ীদিগের ঘটক ও অন্যান্য লোকজন পাড়ায় পাড়ায় মেয়ে দেখিয়া অবশেষে শ্যামবর্ণা হরিপ্রিয়াদিদিকেই পছন্দ করিয়া "পালোট" (পরিবর্ত্তে) ছোট দিদির বড় দাদা সারদাভূষণ সান্ন্যালের সহিত লাহিড়ী-কন্যা চিন্ময়ী দেবীর ও তাহার ভ্রাতা বিপিন লাহিড়ীর সঙ্গে ছোট দিদির সম্বন্ধ স্থির করিয়া গেলেন। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল যে কাল, অত্যন্ত চঞ্চল দুরন্ত দস্যু মেয়ের এমন বিবাহ হওয়া একটা বড় সৌভাগ্যের কথা। মেয়ের অদৃষ্ট খুব ভাল।

সারদা দাদার সম্বন্ধে দু'চারি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। তিনি সেকালের হিন্দুকলেজের জুনিয়র সিনিয়র পাস, ৪৫৲টাকা বৃত্তিপ্রাপ্ত খ্যাতনামা ছাত্র ও সরকারী জেলা স্কুলে হেডমাষ্টারী করিতেন। অঙ্কে সুপণ্ডিত, স্কুলে ছেলেদের শিক্ষা দেবার পক্ষে কিরূপ ছিলেন জানি না, তবে গৃহে ও সমাজে একেবারে অচল। সামাজিক বিধিব্যবস্থা জানিতেন না, যাহা তাহা করিয়া বসিতেন। বুদ্ধিমতী মাতার শাসনে কোনরূপে চলিয়া যাইত। প্রবীণারা তাঁহার সঙ্গে স্ব-ইচ্ছায় কথা কহিতেন না। ভাষা "হালুম খালুম গেলুম"—পুরা কলকাত্তাই। গ্রামে পুষ্পগন্ধবিশিষ্ট (fool) বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এক একদিন এক এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া গ্রামসুদ্ধ হাসাইতেন। এক কালীপূজার রাত্রে ঘরে বসিয়া পুঁথিপত্র পড়িতেছেন, আহার করিতে ডাকিলে কিছুতেই

আসেন না ; ব্রাহ্মণ তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইতেছিল, তখন পিসীমা স্বয়ং যাইয়া পুত্রকে আহার করিবার জন্য ডাকিতে লাগিলেন। কোন উত্তর না পাইয়া তিনিও রাগ করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় ঘর হইতে সারদা দাদা বলিয়া উঠিলেন, "মা, আমি খাইয়াছি, এখন উঠিতে মাথা ঘুরিতেছে, হাঁটিতে পারি না।" পিসীমা আবার খুব রাগেব সহিত যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, " কি খাইয়াছিস্?" তখন তিনি বলিলেন, "Wine", তাহাতে পিসীমা জানিতে চাহিলেন সে কি জিনিস। সরল পুত্র বলিলেন, "কারণ"। শুনিয়া তিনি ত একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিলেন ও বলিলেন, "আজ যা হইবার হইযাছে, পুনর্ব্বার যদি 'কারণ ফারণ' খাও ত বাড়ী ও গ্রাম হইতে 'পাক' দিয়া গলাধাক্কায বাহির কবিয়া দিব। তোমার বাপ পিতামহের বাডী না, আমাব পিতৃদত্ত বাড়ী, ইহাতে হাড়ী ডোমের খাদ্য অনাচার চলিবে না। খবরদাব।" সমস্ত রাত্রি দ্বাব রুদ্ধ করিযা ঘরে রাখিযা দিলেন। কথাটা গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া হাসিঠাট্টার তরঙ্গ বহিযা গেল। পিসীমাই লজ্জায় কিছুকাল বাড়ী হইতে বাহির হন নাই।

আর এক সময় স্ত্রী বর্ত্তমানে সারদা দাদা সমাজ-সংস্কাবক হইয়া বিদ্যাসাগব মহাশয়ের মতে বিধবাবিবাহ করিতে ব্যস্ত হইযা উঠিয়াছিলেন। সাজসজ্জা করিযা কোন এক ধনীব অন্দরমহলের বাহির দ্বারের পার্শ্বে লুকাইযা থাকিয়া দাসদাসীদিগকে দিয়া প্রস্তাবটা অন্তঃপুরে পাঠাইয়াছিলেন ; তাহার পর, কথাটা চারিদিকে জানাজানি হইলে অতিশয় অপমানিত হইয়া সে স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। স্ত্রী এই ব্যাপারে অনেক দিন আর স্বামীর মুখদর্শন করেন নাই। সাবদা দাদা যাঁহাকে বিবাহ করিতে ক্ষেপিয়াছিলেন তিনি সম্পর্কে শ্যালিকা ও বঙ্গদেশের এক প্রধান রাজবংশের রাজমাতা। এসব মহিমময়ী রমণী ও এসব সাধ্বী নারী সংসারে বিরল।

মাতৃ-মন্দিব, আশ্বিন ১৩৩১

আশুতোষ

প্রসন্নময়ী দেবী

"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে পাবনা জিলার বাগ গ্রামে ১৩ই জুন, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার মধ্যাহ্নে মাতামহ- আলয়ে আশুতোষ চৌধুরীর জন্ম হয়। তাঁহার মাতা মগ্নময়ী দেবী বঙ্গদেশের দ্বাদশ ভূম্যধিকারীর অন্যতম কালীচন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যা। রায় মহাশয়ের পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা দ্রবময়ী দেবী বালবিধবা; নাটোরের নিকটবর্ত্তী বক্তারপুর গ্রামের ভবানী খাঁ মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে বিধবা হইয়া তিনি চিরজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া পরসেবায় ও পূজা-ব্রত-নিয়মে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। কনিষ্ঠা পরমা সুন্দরী ও সৌভাগ্যবতী মগ্নময়ী দেবী ৯/১০ বৎসর বয়সে (পূর্ব্বে রাজসাহী, এক্ষণে) পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামের অতি পুরাতন চৌধুরী বংশের ৺দুর্গাদাস চৌধুরী মহাশয়ের সহিত পরিণীতা হন। বাগ-কাশীনাথপুরের রায় মহাশয়দিগের পূর্ব্ব মান-সম্ভ্রম, বিষয়-সম্পদ অতুলনীয় ছিল। কালে সে সব ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—কেবল নামমাত্র আছে। রায় মহাশয়দিগের পুরাতন দেবমন্দির, প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও পরিখা-বেষ্টিত দুর্গ অদ্যাপি ছাতকে দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

আশুতোষের জন্মের সহিত পরিবারে অনেক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ শ্রীমানের জন্মের পরই মায়ের এক অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া যায় এবং নাটোর রাজধানীতে মাতৃস্বসা-গৃহে পিতৃদেব কঠিন পীড়ায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত হন। এই সব বিপদের উপর আবার অল্প দিনের ভিতর নবজাত শিশু অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে ও তাহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে।

দেশ-দেশান্তর হইতে গণক, জ্যোতিষী, এবং ঝাড়া জলপড়ার জন্য সেকালের সব গুণী, ওঝা আনা হইয়াছিল। জ্যোতিষীগণ গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, শিশু আশুতোষের পিতামাতার সৌভাগ্যবশতঃ পুত্র যদি রক্ষা পাইয়া যায়, তাহা হইলে সে ভারতবর্ষের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ লোক হইবে ও পিতৃমাতৃ বংশ উজ্জ্বল করিবে। পিতামাতার জীবন রক্ষা হইয়া গেল; ক্রমে শিশুও আরোগ্য লাভ করিল।

আমি পিতামাতার প্রথম সন্তান। আমার জন্মের পাঁচ বৎসর ৮ মাস পরে প্রথম

পুত্রসন্তান আশুতোষের জন্মের উৎসবটা অনেক দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। যে সকল লোক এই শুভসংবাদ লইয়া কুটুম্ব-গৃহে ও গ্রামে-গ্রামে গিয়াছিল, নিদর্শন স্বরূপ তাহারা এমন সব পারিতোষিক পাইয়াছিল যে, তাহার সাল-বনাত বহু বৎসর তাহাদের গৃহে রক্ষিত ছিল।

ছয় মাস বয়স্ক সুস্থ, সবল ও সুন্দর শিশু পুত্র লইয়া মাতা মগ্নময়ী দেবী হরিপুরে আসিয়াছিলেন। সে যেন এক নব পুণ্যাহের দিন। কত গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পুরাতন প্রজাবর্গ ও আত্মীয়-স্বজনে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। অনেক "মুখ-দেখানি"ও লাভ হইয়াছিল। আমাদিগের গৃহের পূর্ব্ব নিয়মানুসারে পুত্রসন্তান জন্মিলে একটী "ছোকরা ভাণ্ডারী" বালক ভৃত্য ও একজন প্রাচীনা পরিচারিকার উপর শিশুর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়া হইত। মায়ের শরীর তখনও বড় দুর্ব্বল ছিল বলিয়া শিশুকে স্তন্য দিবার জন্য একটী "মেটেলনী" রাখা হইয়াছিল। শিশুকাল হইতে আশু বড় বাধ্য ও স্বভাবগুণে সকলেরই অতীব প্রিয় ছিল। খেলার মধ্যে তাহার প্রধান খেলা ছিল পুরাতন ভৃত্যগণের সহিত একত্র বসিয়া বাসন মাজা ও গৃহের একদল রাজহাঁসকে পুষ্করিণীতে লইয়া গিয়া খৈ মুড়কী প্রভৃতি খাদ্য আনিয়া খাওয়ান। সেই সময় কুলপুরোহিত চক্রবর্ত্তী মহাশয় নাম, শ্লোক শিখাইতেন ও মুখে মুখে চাণক্যের শ্লোক মুখস্থ করাইতেন।

আশুর জন্ম-বৎসরের কার্ত্তিক মাসে জ্যেষ্ঠ-তাত তাঁহার পুত্র ৺ নবকুমার চৌধুরী দাদা মহাশয়ের অতি সমারোহে বিবাহ দেন ও সেই বিবাহে পিতাঠাকুর শারীরিক পরিশ্রম ও অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। সেই সময় জ্যেঠা মহাশয় নববধূর পাকস্পর্শের দিন আশুর অন্নপ্রাশন দিবার সমস্ত ঠিক করায়, পিতৃদেবের মন বড় বিরূপ হইয়া যায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের অন্নপ্রাশন তাহার দাদার বৌভাতের সঙ্গে দিতে তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না। আশুর নয় মাস বয়সে তাঁহার পিসিমাতারা শিশুর অন্নপ্রাশনের জন্য বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ভ্রাতৃগণের নিকট পত্র লিখিয়া লোক পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু পিতৃদেব সন্তানের অন্নপ্রাশনে আর কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি "আশুতোষ" নাম রাখিতে বলিয়া পাঠাইলেন; রাশিনাম "প্রবোধচন্দ্র" কোষ্ঠীতে উঠিল। নিরুপায় আত্মীয়গণ নাটোর মহারাজের ভবানীপুরের ভবানী ঠাকুরাণীর প্রসাদ আনিয়া আশুতোষের অন্নপ্রাশন করাইলেন।

পিসীমারা এইরূপ অন্নপ্রাশনে মনে অত্যন্ত ব্যথা বোধ করিয়াছিলেন; মা কিন্তু ক্ষুণ্ণ হন নাই। তিনি হাস্যমুখে বলিয়াছিলেন; "আপনারা কেন দুঃখ করিতেছেন। ভবিষ্যতে আমার এই ক্ষুদ্র বালক মানুষ হইয়া কত লোককে অন্ন-বস্ত্রে প্রতিপালন করিবে; কত লোকের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহ দিয়া দিবে। ভবানী মায়ের প্রসাদের মাহাত্ম্যে অদ্যকার এই অন্নপ্রাশনে তাহার জীবন সার্থক হইয়া যাইবে।"

বড় ভাইয়ের অন্নপ্রাশন কি উপনয়ন না হইলে ছোট ভাইয়ের শাস্ত্রসম্মত ভাবে কোন সংস্কার হইতে পারে না; এজন্য আশু-যোগেশের একত্র অন্নপ্রাশন খুব জাঁকের সহিত আবার দেওয়া হইল। আশুর বয়স তখন তিন বৎসর নয় মাস। বাড়ীতে সেই সময়ে অন্যান্য আত্মীয় ছেলেদের হাতেখড়ির ধূম পড়িয়া গেল। আশুর অন্নপ্রাশন যেমন হয় নাই, সেইরূপ হাতেখড়িও হয় নাই। উপনয়নও দুইবার হইয়াছিল। অসময়ে মেঘ-গর্জ্জন হইলে যজ্ঞোপবীত নষ্ট হইয়া যায়। সেই কারণে দুইবার পৈতা দিতে হয়। সেই বৎসরই আমার জ্যেঠিমাতার মৃত্যু ও তৃতীয় ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হইয়াছিল। অর্দ্ধোদয় যোগের সময় পরিবারের অনেকের অকালমৃত্যু হওয়াতে বড় পিসীমাতা রোগশয্যায় শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। জ্যেঠা মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র কালীপ্রসন্ন দাদা ও কন্যা স্বর্ণময়ী দেবী অসময়ে মারা যান। এই সমস্ত শোকে পিতৃদেবও একা প্রবাসে না থাকিতে পারিয়া নববর্ষের প্রারম্ভে বৈশাখ মাসে আমাদিগকে তাঁহার কর্ম্মস্থান বনগ্রামে লইয়া যান। তিনি সেখানকার ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। আশু তখন সাড়ে চারি বৎসরের। তিন বৎসর বয়সে আশুকে হরিপুরের গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্ত্তি করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাহার পর বনগ্রামে ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। বনগ্রামে আসিবার পরেই বড় পিসীমাতার গঙ্গাপ্রাপ্তির সংবাদ পাইয়া পিতৃদেব একেবারে শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। শোক দুঃখের মধ্যে সংসারযাত্রা যেমন সকলেরই চলিতে থাকে, সেইরূপই আমাদিগেরও চলিতে লাগিল। আশুও নিয়মিত ভাবে স্কুলে যাতায়াত করিতে লাগিল। সেই সময় হঠাৎ এক দিন স্কুলের ইনস্‌পেক্টর আসিয়া বালকদিগের পরীক্ষা করেন। হরিপুর ও বনগ্রামের স্কুলে আশু ২/৩ খানা পুস্তক শেষ করিয়া প্রমোশন প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ইনস্‌পেক্টর বাবু তাঁহার রচিত "কুসুমাঞ্জলি" আশুকে উপহার দিয়া পিতৃদেবকে লিখিয়া পাঠান যে, "আশু একটী অক্ষরও চেনে না। অসাধারণ মেধা ও স্মরণ-শক্তির জন্য চারিখানি পুস্তকের পাঠে সম্পূর্ণরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছে; অন্য পুস্তক পড়িতে দেওয়ায় তাহার এক বর্ণও চিনিতে পারে নাই। বালককে যত্ন পূর্ব্বক অক্ষর পরিচয় করাইয়া আর এক ক্লাসে প্রমোশন যেন দেওয়া হয়। অসাধারণ প্রতিভাবান বালককে যথারীতি শিক্ষা দিলে, কালে সে দেশের একটা গৌরব স্থানীয় হইবে।"

বনগ্রাম তখনকার যশোহর জেলার একটা সাব-ডিভিসন। সেইখানেই কুমুদের[২] জন্ম। সবডিভিসনাল অফিসারের সহিত পিতৃদেবের অতিশয় আত্মীয়তা ছিল। তাঁহার বদলীর আদেশ আসিলে, তাঁহার গৃহসজ্জা ও অন্যান্য দ্রব্য প্রকাশ্যে বিক্রয় হইতে লাগিল। তাঁহার অতি প্রিয় Mary নাম্নী ঘোটকী বিক্রয়ের নিমিত্ত লটারী খেলা হয়। এক এক টাকার টিকিট কিনিয়া অনেক লোক সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল। সহসা দর্শক-মণ্ডলীর মধ্যে একটা কোলাহল পড়িয়া গেল। মৌলবী সাহেব সেখানে

উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, আশুর নামে ঘোড়া উঠিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া সুসজ্জিত করিয়া, সেই প্রকাণ্ড ঘোড়ার উপর আশুকে চড়াইয়া, তাঁহার অতি পুরাতন এক-চক্ষু সহিসের হস্তে আশুকে সমর্পণ করিয়া গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বৃহৎ ঘোড়া, তাহার পৃষ্ঠোপরি ক্ষুদ্র বালক সোয়ার—এই অভিনব দৃশ্য দেখিবার জন্য রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সেই হইতে আশুকে অশ্বচালনা শিখাইবার জন্য পিতাঠাকুর একটী ছোট টাট্টু কিনিয়া দিলেন। প্রত্যহ প্রাতে সেই টাট্টুতে আশু ও Mary-তে পিতৃদেব চড়িয়া প্রাতঃভ্রমণ করিয়া আসিতেন। তাহাতে আশু বেশ ঘোড়ায় চড়া শিখিয়াছিল।

দ্বিতীয় বৎসর আবার ইনস্পেক্টর বাবু স্কুল দেখিতে আসিয়া আশুর পাঠের উন্নতি দর্শনে অবাক্ হইয়া যান; এবং অনেকগুলি ভাল ভাল পুস্তক তাহাকে উপহার স্বরূপ দিয়া পিতৃদেবের আতিথ্য গ্রহণ করেন। আশু দিবাভাগে স্কুলে ও রাত্রে পিতাঠাকুরের নিকট অধ্যয়ন করিত,—তাহার কোন গৃহ-শিক্ষক ছিল না। বনগ্রাম পল্লীগ্রাম হইলেও তথায় সাবডিভিসন থাকায় দুইজন হাকিম, স্কুল, হাসপাতাল ও কয়েদি রাখিবার ক্ষুদ্র কারাগৃহ ছিল। সুন্দর মুক্ত স্থান ও স্বাস্থ্য ভাল থাকায় আমরা সকলেই সেখানে ভাল ছিলাম।

সরকারী কর্ম্মচারীদের এক স্থানে স্থায়ী ভাবে থাকিবার সৌভাগ্য হয় না। পিতৃদেবও সেই কারণে ম্যালেরিয়া-প্রধান যশোহর সদরে বদলী হইয়া যান। সেখানে ভ্রাতৃগণকে জেলা স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়। পিসতুত ভ্রাতুস্পুত্র নগেন্দ্রনাথ আশুর অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় হইয়াও তাহারই সহিত এক শ্রেণীতে পড়িতেন। আশু তখন পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া অতি প্রশংসার সহিত প্রাইজ ইত্যাদি পাইত।

যশোহরে থাকার কালে আশুতোষের তৃতীয় সহোদর প্রতিভাসম্পন্ন বালক দেবেন্দ্রনাথের সংক্রামক রোগে হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায়, যশোহর-বাস সকলের পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিলে, পিতৃদেব কমিশনার লর্ড ইউনিক ব্রাউনকে বলিয়া কৃষ্ণনগরে বদলী হন। দেবেন্দ্র যদিও ছয় বৎসরের বালক, তথাপি তাহার অসামান্য প্রতিভা দর্শনে সমস্ত স্কুলের শিক্ষকগণ ও হেডমাষ্টার ৺ উমাচরণ দাস মহাশয় তাহার অকাল বিয়োগে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া পড়েন ও অশ্রু বর্ষণ করিতে থাকেন। পিতৃঠাকুর সপরিবারে কৃষ্ণনগরাভিমুখে রওনা হইয়া পথে বনগ্রামে সমাজ-সংস্কারক পিতৃবন্ধু ৺ শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গৃহে অতিথি হন। সেখানে আমরা সকলে ২/৩ দিন অবস্থান করি। আমরা দেশ হইতে প্রথম এই বনগ্রামে আসিয়াছিলাম। এইখানেই কুমুদনাথের জন্ম হয়—এইখানকার স্কুল হইতে আশু প্রথম প্রাইজ পাইয়া যশোহরে গিয়াছিল। সেই পুরাতন বনগ্রামে আসিয়া সকলেই বড় আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন। আশু তখন ১২ বৎসরের বালক।

প্রথমতঃ কৃষ্ণনগরে যাইয়া কাছারীর অতি সন্নিকটে একটী সুবিধাজনক বাসা-বাটী পাওয়া গিয়াছিল। সঙ্গে পুরাতন দাস-দাসী থাকায় কোন কষ্ট হয় নাই। তবে কৃষ্ণনগরে আমাদিগকে প্রথম প্রথম লোকে খৃষ্টান মনে করিত বলিয়া দাস-দাসী পাচক-ব্রাহ্মণ ইত্যাদি পাওয়া বড় কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। শ্রদ্ধেয় ৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় এই সংবাদ পাইয়া তমলুক হইতে স্বয়ং আসিয়া আমাদিগের এই অসুবিধা দূর করিয়া দিয়া যান।

পাঠে অসাধারণ মনোযোগ, স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রখর মেধার জন্য আশু শিক্ষকগণের অতীব প্রিয়-পাত্র হইয়াছিল। সেই সময় প্রবেশিকা পরীক্ষার বয়স ১৬ বৎসর থাকায়, প্রথম শ্রেণীতে প্রমোশন পাইয়াও সে বয়স অল্প বলিয়া পরীক্ষা দিতে পারিল না। তখন সু-পণ্ডিত লব সাহেব[৪] কালেজের প্রিন্সিপ্যাল। তিনি স্ব-ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া ডিরেক্টারকে এ বিষয় জানাইয়া একটা ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতৃদেব ইউনিভারসিটির নিয়ম ভঙ্গ করিয়া পুত্রকে পরীক্ষায় পাঠাইতে অসম্মত হইলেন।

এই সময় কর্ত্তৃপক্ষ কালেজ লাইব্রেরীতে বিনা চাঁদায় আশুকে পুস্তক পড়িবার অনুমতি দিয়াছিলেন, সুপণ্ডিত ৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়[৫] ও রো সাহেব অবকাশ সময়ে তাহাকে অতি যত্নে সাহিত্য, ইতিহাস, ইংরাজী কবিতা, জীবন-চরিত পড়াইতেন। প্রথম শ্রেণীতে তাহার নাম রহিয়া গেল। সে প্রত্যহ স্কুলে উপস্থিত হইয়া নাম রেজেষ্ট্রি করাইয়া পরে লাইব্রেরীতে যাইয়া নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিল। অতি কঠিন কঠিন পুস্তক সকল পড়িয়া প্রিন্সিপ্যালের আদেশানুসারে তাহা হইতে প্রবন্ধ রচনা করিত। কালেজের ছাত্রবৃন্দ ও আশুর বন্ধুরা আমাদিগের গৃহে যাতায়াত করিতেন। আশুর সহিত সকলেরই খুব ভাব ছিল। "উদার চরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্"। তাহার কেহ শত্রু ছিল না; আশৈশব সে অজাতশত্রু। কালেজের সভা-সমিতিতে ইংরাজী প্রবন্ধ রচনার ভার তাহারই উপর পড়িত। আশু চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিল, তাহা এখনও ইউনিভারসিটির ক্যালেণ্ডারে মুদ্রিত রহিয়াছে।

১৬ বৎসর বয়সে আশু প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১০ টাকা বৃত্তি পায়। ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি থাকায় যদিও এফ-এ পরীক্ষায় দুই এক নম্বরের জন্য সে একবার ফেল হয়, দ্বিতীয়বারের পরীক্ষায় সুখ্যাতির সহিত পাস করিয়া ১১ টাকা "শঙ্কর" বৃত্তি পাইয়াছিল। তাহার বৃত্তি হইতে কালেজের বেতন কাটিয়া দিতে হয় নাই। অতীব স্নেহশীল পিতার ইচ্ছানুসারে কালেজের বেতন গৃহ হইতে দেওয়া হইত। ঐ ১১ টাকা তাহার ইচ্ছামত সে ব্যয় করিত, তাহা হইতে প্রতি মাসে ছোট ভাই ভগিনী ও আমাকে অনেক সুন্দর সুন্দর ছোট-খাট উপহার দিত।

তখন কৃষ্ণনগরে মধু নামে এক মুসলমান শিকারী ছিল। সে আশুকে বড় ভালবাসিত; এবং তাহার ভাল অবস্থার সময় নানাপ্রকার খাদ্য আনিয়া আশুকে ও অন্যান্য ভাইদিগকে খাইতে দিত। দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই সে আমাদিগের বাড়ী থাকিত। আশুর পাঠাগারে বসিয়া সে অনেক ভূত-প্রেতের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প করিত। তাহার এই নূতন আরব্য উপন্যাসের কাহিনী শুনিবার জন্য কালেজের বহু ছাত্র আমাদের বাড়ীতে মিলিত হইত। নিঃসন্তান মধু বহুকাল রোগ-শয্যাগত থাকায় তাহার সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আশু বৃত্তির টাকা ও নিত্য আহার্য্য দিয়া তাহার জীবন রক্ষা করে। আশু যখন কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়িতে যায়, তখন মধুর রোদনে আমরা সবাই বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। ছুটীর সময় আশু বাড়ী আসিলে সর্ব্বাগ্রে মধু আসিয়া দেখা দিত। আশু তাহাকে কাপড় ও খাদ্য দিত এবং তাহার স্ত্রীর নাম করিয়া দুই একটা সৌখীন জিনিসও দিত। বাসা-খরচের টাকা হইতে যাহা বাঁচিয়া যাইত, তাহাও দিত। মা তাই পরিহাস করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন "শ্বশুর"।

আশৈশব গরীব দুঃখীর প্রতি দয়া থাকায়, অনেক লোক আশুর বড় ভক্ত ছিল। জীবনে আশুতোষ কখনও ধূমপান করে নাই, কিন্তু ঐ কৃষ্ণনগরেই একজন হিন্দুস্থানী তামাকওয়ালা তাহার অনুগত ভৃত্যবৎ হইয়াছিল। প্রত্যহ সে পিতৃদেবের জন্য তামাক দিতে আসিয়া ছেলেদের ঘরে যাইয়া বসিয়া থাকিত। রবিবারে খড়ে নদীতে স্নানের সময় তেল গামছা কাপড় ইত্যাদি বহন করিয়া লইয়া যাইত। সে টাকাকড়ি কিছুরই প্রত্যাশা করিত না। সে অবস্থাপন্ন লোক। অবকাশ-দিনে সে এমন সব অদ্ভুত হিন্দুস্থানী কাহিনী বলিত, তাহার সত্যাসত্য বিচার করিবার কাহারো ইচ্ছা হইত না। গল্প শুনিয়া সবাই মুগ্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত। সে কখন কখন দুই চারি আনার আতর আনিয়া সবাইকে উপহার দিয়া যাইত। সে পাঞ্জাবী, ধুতি, চাদর সুন্দর রূপে "চুন্‌ট" ও কখন-বা গিলা করিয়া দিত। ছেলেদের পাঠাগারে সে সর্ব্বদা বসিয়া থাকিত বটে, কিন্তু কখন বালকদিগের পড়ার কোন ক্ষতি করিত না। আশু কলিকাতায় চলিয়া গেলে তাহার মনে অতিশয় কষ্ট হইত। সে যখন-তখন আসিয়া তাহার খবর-বার্ত্তা জানিয়া যাইত ও আশুর পত্রাদি পাইবার জন্য ডাকের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। আশু শিশুকাল হইতেই অতি স্নেহশীল, সরল-প্রকৃতি ও প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল।

দাস-দাসীর ও আমাদিগের কুটুম্বগণের ছেলেদিগকে আশু নিজে পড়াইত। তাহাতে দাস-দাসীগণ তাহাকে বড় মান্য ও স্নেহ করিত। আশু কলিকাতায় চলিয়া গেলে, তাহার পাঠশালা উঠিয়া যায়।

পিতৃদেব আশুর প্রবেশিকা পরীক্ষার পরেই আশুকে সিভিল সার্ভিস দিবার জন্য বিলাতে পাঠাইবার আয়োজন করিয়া, তাহাকে সঙ্গে লইয়া ৺আনন্দমোহন বসু ও

৺মনোমোহন ঘোষ মহাশয়দিগের[৬] সহিত পরামর্শ করিতে গিয়াছিলেন। তখন সিভিল সার্ভিসের বয়স ১৯ বৎসর থাকায়, বসু ও ঘোষ মহাশয় অত অল্প বয়সে আশুকে বিলাত পাঠাইবার বিষয়ে ঘোর আপত্তি করিয়াছিলেন। অপরিণত-বয়স্ক ছেলেরা বিলাত-প্রবাসে কিরূপ কুপথগামী হইতে পারে, তাঁহারা তাহার অনেক উদাহরণ দেন। সুতরাং তৎকালে আশুর বিলাত গমন বন্ধ হয়। আশু প্রেসিডেন্সিতে বি-এ পড়িতে থাকে। মেসে কিম্বা ছাত্রাবাসে না থাকিয়া আশু চাঁপাতলায় একটী বাড়ীর অর্দ্ধেক ভাড়া করিয়া সেখানেই থাকিত। দুইজন গৃহ-ভৃত্য তাহার সঙ্গে থাকে। ভ্রাতুষ্পুত্র নগেন্দ্রনাথ আশুর অপেক্ষা তিন বৎসরের বড় বলিয়া তিনি সেই বাসায় থাকিয়া আশুর তত্ত্বাবধান ও এলবার্ট কলেজে অধ্যয়ন করিতেন।

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২

২

আশু যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ, এম-এ ও বি-এল পড়িত, তখন আমি অসুস্থ হইয়া কলিকাতায় তাহার বাসা-বাড়ীতে ৺চন্দ্রকিশোর সেন কবিরাজ মহাশয় দ্বারা চিকিৎসা করাইতে গিয়াছিলাম। আমাদের পিসতাত-ভ্রাতা ৺আনন্দনাথ সান্ন্যাল মহাশয় আমাদিগের সহিত সেখানে ছিলেন। সেকালের খাঁটি ভদ্রলোক, —রোগে সেবা ও আত্মীয়গণকে সতত সকল প্রকারে সাহায্য করিবার জন্য তিনি উন্মুখ থাকিতেন। তিনি কখনও জীবনে তোষামোদের ধার ধারিতেন না। রাজসাহীর কোন এক রাজা একসময় শীতবস্ত্র বিলাইবার দিন তাঁহাকে একযোড়া গঙ্গাজলী শাল উপহার পাঠাইয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সেই বাহকের হাতেই সে শাল ফেরত পাঠাইয়া অতি অপমানসূচক পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। কতক্ষণ পরে রাজা বাহাদুর স্বয়ং আসিয়া তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি তাহাতে বলিয়াছিলেন, "আমি জাতে কুলীন ব্রাহ্মণ; অতি গরীব হইলেও, অব্রাহ্মণের দান কখন স্পর্শ করিতে পারি না। তোমাকে যে দাদা বলিয়া ডাকিবার অধিকার দিয়াছি, ইহা সৌভাগ্য মনে করিবে। শাল-দোশালা কখন উপহার পাঠাইবে না।" সেই হইতে রাজসাহী জেলার রাজা-মহারাজা, জমীদারবর্গ তাঁহাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিতেন। কিন্তু আপদ বিপদে সকলের দ্বারেই তিনি অযাচিতভাবে যাইয়া উপস্থিত হইতেন। তিনি আমাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। কখনও আমাদের কোন ত্রুটি ধরিতেন না।

আশুর চাঁপাতলার বাসা একটা বিদ্যাপীঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সে বড় সুখের দিন গিয়াছে। কত ছাত্র, কত সম্পাদক, কত লেখক ও কত গণ্যমান্য ব্যক্তি শনি রবিবারে আশুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। আশু তখন যুবক মাত্র। তাঁহাদিগের

সহিত সাহিত্যচর্চ্চা হইত। "Indian Mirror"-এর সহকারী সম্পাদক আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি ঈশানচন্দ্র (কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়েরা[৭] অনেকেই সাহিত্যালোচনা করিয়া যাইতেন। সেই সময় একদিন "সাধারণী" সম্পাদক অক্ষয়বাবু তাঁহার যুক্তাক্ষরশূন্য "গোচারণের মাঠ"[৮] আমাদিগের ভ্রাতা-ভগিনীকে উপহার দিতে আসিয়াছিলেন। সমস্ত বইখানি নিজে পড়িয়া শুনাইয়া গেলেন। "গোচারণের মাঠ" পড়িয়া আশু তাহার একটা হাস্যকর Parody লেখে—

"গোরথ ধাবন"

"তে-কোণা বাঁশের ঠাঠ চাকার উপর
সিঁদুরে দামড়া জোড়া করে লড়বড়।
সোয়ার তাহাতে পাঁচু হাতে এক লড়ি
নবাবী খেয়ালে আছে গোরথেতে চড়ি।"
(সম্পূর্ণ কবিতাটা হারাইয়া গিয়াছে)

এই কবিতা বন্ধুগণের মধ্যে হাতে হাতে চারিদিকে ফিরিতে লাগিল। অক্ষয় বাবুর নিকট সংবাদ পৌঁছিবামাত্র তিনি চুঁচুড়া হইতে আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া, সম্পূর্ণ কবিতাটী শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়া গেলেন যে, আশুর "গোরথ ধাবন আমার 'গোচারণের মাঠ' অপেক্ষা অনেক ভাল। ইহা পড়িয়া মনে হইতেছে, আশুকে আগে দেখিতে দিলে যোগ্যতর হস্তে তাহা সমর্পণ করা হইত।" কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহিত আশু কৈশোরে একবার বঙ্কিমবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে কাঁঠালপাড়ায় গিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর "মেজদাদা" সঞ্জীববাবু পিতৃদেবের পরম বন্ধু ছিলেন। সেই সূত্রে উভয় পরিবারে বেশ একটা আত্মীয়তা থাকায়, বঙ্কিমবাবু আশুকে অত্যন্ত যত্ন-আদর সহকারে এক রাত্রি নিজের কাছে রাখিয়া বড় আনন্দ বোধ করেন। তিনি গোপনে কবিবর নবীন বাবুকে বলিয়াছিলেন, "ভবিষ্যতে এ ছেলে একটা মানুষের মত মানুষ হবে হে,—দুর্গাদাস বাবুর বংশ কেন, সমস্ত ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত করিবে। শিকারী বেড়ালের গোঁপ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়।"

আশু কলেজের পাঠের জন্য সময়াভাবে সেখানে আর যাইতে পারে নাই। বঙ্কিমবাবু তাহাকে সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত দু'চার বার বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন ; কার্য্যতঃ তাহা পুনর্ব্বার ঘটিয়া উঠে নাই। সুস্থ শরীর ; যৌবনের উদ্যমে হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ। আশু বি-এ, এম-এ, বি-এল এক সঙ্গে অধ্যয়নে অতিশয় যত্নশীল ; এবং কলেজের প্রফেসারদিগের অতিশয় প্রিয় ছাত্র। কৃষ্ণনগর কলেজের রো সাহেব তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। আশুকে তিনি আশৈশব ভালবাসিতেন। যাহাতে আশু বি-এর

সহিত এম-এ দিতে পারে, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। বি-এ পরীক্ষা দিয়াই আশু এম-এ দিবার জন্য সহৃদয় সুপণ্ডিত টনি সাহেবের[২] মত জানিতে গিয়াছিল। অনেক কথাবার্ত্তা হইলে, তাহার কৃতিত্বে অতি পরিতুষ্ট হইয়া তিনি আশুকে এম-এ দিবার আদেশ দেন। আশু বি-এ পাশের পরে এম-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সেই প্রথম বি-এ, এম-এ এক সঙ্গে দেওয়ার অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল।

বি-এল পড়া ছাড়িয়া দিয়া সেই বৎসরই আশু বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। ১৮৮১ সালেই সে বিলাত রওনা হইয়া যায়। সে কেম্ব্রিজের সেন্ট জন কলেজে ভর্ত্তি হইয়া আইন অধ্যয়ন ও সেই সঙ্গে অঙ্কে Tripos দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। দুই পরীক্ষাই সে খুব যশের সহিত পাশ করিয়াছিল।

আশু কেম্ব্রিজেরও বি-এ। কেম্ব্রিজ ছাত্র-সভায় প্রতিযোগিতায় "সাভানারোলা"র উপর কবিতা লিখিয়া সে প্রথম হয়। পরে সে কলেজের "ঈগল" নামক কাগজের সম্পাদকতার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিল। অসংখ্য ইংরাজ যুবকের মধ্যে একজন বাঙ্গালী যুবক "ঈগল" কাগজের সম্পাদকের পদ লাভ করায়, কলেজে তাহার অতিশয় যশঃ লাভ হইয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্রমণ্ডলী সবাই তাহার বন্ধু স্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার সহপাঠীরা কখন তাহাকে কোন প্রকার হিংসা করেন নাই; সকলেই ছুটীর সময় তাহাকে নিজেদের গৃহে লইয়া যাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন; আশুর সহিত ব্যবহারে শ্বেত-কৃষ্ণের তারতম্য পরিলক্ষিত হইত না।

আষাঢ় ১৩৩২

৩

আশুর কেম্ব্রিজে থাকা কালে তাহার পূর্ব্ব-বন্ধু রো সাহেব বিলাতে ছিলেন। তিনি অবকাশ সময়ে আশুকে তাঁহার গৃহে যাইয়া ছুটী অতিবাহিত করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। মিঃ রো বড় আমোদ-প্রিয়, সরল-হৃদয় ব্যক্তি। আশুর নিকট হইতে পত্রের উত্তর পাইয়াই তিনি তাঁহার ভগিনী কুমারী এমী রো'কে আশুর সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে "আমার যুবক বন্ধু আশুতোষ চৌধুরী Indian। রীতিমত Red Indian-এর মত ব্যবহার না হইলেও সেই প্রকারের। তবে আমার সহিত বহুকালের বন্ধুত্ব থাকায়, আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিতেছি। তাহাকে দেখিয়া কোনরূপ লজ্জিত হইবে না। Lady like ব্যবহার করিবে।" মিস রো ভ্রাতার এই বাক্যে অত্যন্ত ভীতা হইয়া গৃহের পরিচারিকাদিগের সহিত গোপনে অনেক পরামর্শ করিতে

লাগিলেন। আশু ইহার কিছুই জানিত না। সে যথাকালে মিঃ রো'র গৃহে উপনীত হইলে, মিঃ রো আনন্দে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ভগিনীকে আশুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। তিনি Red Indian-এর ভয়ে বাহিরে আসিতে চান না। তখন মিঃ রো শয়নকক্ষের পর্দ্দা উঠাইয়া একেবারে আশুকে সেখানে লইয়া গিয়া হাজির করেন। মিস রো ত সৌম্য-মূর্ত্তি ভদ্রবেশী ভারতবর্ষীয় যুবককে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, এবং বাৎসল্য ভাবে তাহার দুই হস্ত ধরিয়া অভিবাদন করিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন; বলিতে লাগিলেন, "আশু তোমা অপেক্ষা সুশ্রী, পোষাক পরিচ্ছদ অতিশয় সভ্য; তোমা অপেক্ষা সম্ভবতঃ সুপণ্ডিত। আজ হইতে আমি তাহাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মনে করিব।" তখন হাস্যরবে গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। পরিচারিকাগণ পর্য্যন্ত আসিয়া, সে আনন্দে যোগদান করিয়া, আশুর সহিত পরিচিত হইয়া, বাক্যালাপ করিতে লাগিল। বিলাত প্রবাসকালে প্রতি বৎসরই বড়দিনের ছুটীর সময় তাঁহাদিগের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়াই আশু অবসর কাল অতিবাহিত করিয়া আসিত। আশুর Cambridge-এর বন্ধু —ব্যঙ্গরসিক গ্রন্থকার Swift-এর পৌত্র একবার তাঁহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করাইবার জন্য আশুকে নিজ গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গৃহের সুব্যবস্থা, পুত্রের প্রতি জননীর (Mrs. Swift-এর) তখনও কড়া ব্যবহার এবং সময়োচিত সকল কাজ-কর্ম্মের সুপ্রণালী দেখিয়া আশুও আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। এক দিন চা পানের টেবিলে Mr. Swift (২২।২৩ বৎসরের যুবা) তাড়াতাড়ি চটিজুতা পরিয়া আসায় তাঁহার মাতা, নিমন্ত্রিত অতিথির প্রতি অসম্মান দেখান হইল মনে করিয়া, তৎক্ষণাৎ পুত্রকে তৎকালে ব্যবহার্য্য জুতা পরিয়া আসিবার জন্য টেবিল হইতে উঠাইয়া দেন। সুশিক্ষিত পুত্র মাতার এই আদেশ হাস্য মুখে পালন করিয়াছিলেন। সেকালে বিলাতের অনেক ভদ্র পরিবারে ও সমাজে আশুরা নিমন্ত্রিত হইয়া যাইত। তাহাদের সহিত সমান ভাবে মেশামেশি করিতে কেহই কিছু আপত্তি করিত না। আজিকার লর্ড সিংহ, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, সুদক্ষ চিকিৎসক উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺লোকেন্দ্রনাথ পালিত[১০] —সকলেরই সহিত সকলের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সার তারকনাথের পত্নী পুত্রবৎ স্নেহে সকলকে যত্ন-আদর করিতেন। দ্বিজু ও তাঁহার ভ্রাতা হরেন্দ্রলাল প্রভৃতি আশুর চিরবন্ধু (D.L.Roy —দ্বিজেন্দ্র) তখন বিলাত যাইয়া অনেক দিন আশুর সঙ্গে বাস করেন। বাল্যবন্ধু দ্বিজু আশুকে বড় ভালবাসিতেন।

বিলাত গমন কালে কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ভ্রাতৃপ্রতিম সত্যপ্রকাশ গাঙ্গুলীর সহিত আশুর জাহাজে আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার পর সেই আলাপ সুখময় কুটুম্বিতায় পরিণত হয়। বিলাত-প্রবাসী বন্ধুদিগের সহিত এ দিনেও আশুর এমন

আত্মীয়তা ছিল যে, আমরণ কোন প্রকারে তাহার একটুও ব্যতিক্রম কিম্বা দূরত্ব ঘটে নাই। সেকালে বিলাতে ভারতীয় ছাত্র-জীবন বড় সুখের ছিল। আর সকলেই সুশিক্ষিত ও কার্য্যক্ষম হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। এখন আর সে দিন নাই— চারি দিকেই নানা অশান্তি। "কালস্য কুটিলা গতিঃ"।

আশু Cambridge-এর B.A, Bar-at-law, LL.B এবং অঙ্ক শাস্ত্রে Tripos পাশ। পূর্ণ পাঁচ বৎসর কাল বিলাত প্রবাসে থাকিয়া আশুতোষ অন্যান্য অনেক বিষয়ে বহু জ্ঞান লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হয়। আশুর গৃহে আসিবার সংবাদ পাইয়া পিতৃদেব ময়মনসিংহ হইতে এক সপ্তাহের ছুটি লইয়া কৃষ্ণনগরে আসিয়াছিলেন এবং হাবড়া হইতে পুত্রকে অতি সমাদরে সঙ্গে করিয়া পরিবারের মধ্যে আনয়ন করেন। বিজ্ঞ লোকেরা মনে করিয়াছিলেন যে, পিতৃদেব আশুকে পৃথক্ রাখিয়া দিয়া গোপনে রাত্রে তাহার সহিত আহারাদি করিয়া জাতি রক্ষা করিবেন। তাহা আর হইয়া উঠিল না,—দেশে আমরা "একঘরে" হইয়া গেলাম। বিলাত-প্রত্যাগতদিগের মধ্যে আশুই সর্ব্ব প্রথম ধুতি-চাদর পরিধান পূর্ব্বক বন্ধু-বান্ধব ও গুরুজনদিগকে পরিতুষ্ট করিয়াছিল।

তাহার এই নূতন ব্যবহারে কৃষ্ণনগরে একটা প্রশংসার স্রোত বহিয়া গেল। দীর্ঘ পাঁচ বৎসর বিলাতে থাকার কোন চিহ্ন-ই তাহাতে না দেখিয়া, সবাই অবাক হইয়া আশুর অতিশয় সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। আশু অনেক গৃহে আহারের নিমন্ত্রণ পাইতে লাগিল।

তৎকালে কৃষ্ণনগরে এক বিলাত-ফেরত ম্যাজিষ্ট্রেট আশুকে রাত্রি-ভোজের নিমন্ত্রণ করেন। আশু ইংরাজের "নৈশ ভোজের" পোষাকের পরিবর্ত্তে স্বদেশী ধুতি চাদর পরিয়া আহারে যায়। সেই সাহেব বাবু তাহা দেখিয়া মনে মনে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু আশুকে বাড়ী হইতে বিদায় করিয়া দেন নাই। অনেক সাহেব মেম সে রাত্রের ভোজে নিমন্ত্রিত থাকায়, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব আশুকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আহারান্তে সকলে চলিয়া গেলে, সাহেব বাবু আশুকে মুখের উপর বলিয়া দিলেন, "তুমি এরূপ সাজে কখন Dinner partyতে যাইবে না। এরূপ স্বদেশী কাপড়ে নিমন্ত্রণে যাওয়া আমি নৈতিক ভীরুতা (moral cowardice) মনে করি।"

তাঁহার এই অযাচিত অপমান, উপদেশ ও বাৎসল্য ভাবে আশুর মনে কোনই অপমান বোধ হয় নাই। পর দিন আশু পিতৃদেবকে সমস্ত বলিলে, তিনি বলিলেন, "তুমি আর কখন ঐ প্রকার সাহেব-গৃহে নিমন্ত্রণে যাইবে না, এবং সাক্ষাৎ হইলে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিবে— তাঁহার বাবা, জ্যেঠা, কাকারা কি কাপড় পড়িয়া থাকেন।" সে দিনের আশুকে যিনি ধুতি চাদরের জন্য অপমানসূচক বাক্য বলিয়াছিলেন, এ দিনের সেই ধুতি-চাদর-পরা আশুর গৃহে তাঁহার নিমন্ত্রণ না হইলে,

মনঃক্ষুণ্ন হইয়া বন্ধুভাবে নিজেই যাচিয়া নিমন্ত্রণ লইতেন এবং ঐ ধুতি-চাদর-পরিহিত আশু ও তাহার ভ্রাতৃগণের মুখের উপরে কত পরিতোষ বাক্য বলিয়া তাহাদিগকে পরিতুষ্ট করিতেন। তখন আর "নৈতিক ভীরুতা"র কথা মুখেও আনিতেন না।

ইংরাজ জাতি যথার্থ স্বদেশভক্ত। রাজকার্য্যের জন্য যাহাই করুন না কেন, তাঁহারা স্বদেশভক্তের সম্মান করিতে জানেন। আশুর ঐ ধুতি-চাদর তাঁহাদিগের নিকট সর্ব্বদাই "অতি শোভন পরিচ্ছদ" বলিয়া আদর পাইয়াছে। পোষাকে তাহার মান ছিল না। তাহার মনুষ্যত্বের সম্মান লাভ করিয়া গিয়াছে। পিতৃঠাকুর ছুটীতে কলিকাতায় আসিয়া আশুর জন্য মট্‌স্ লেনে একটী ছোটখাট বাসা-বাটী স্থির করিয়া Barrister-এর সরঞ্জাম সকল দিয়া যান। আশু ভ্রাতৃগণ সহ সেই বাড়ীতে থাকিয়া নিজ ব্যবসার নিমিত্ত অসাধারণ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। হাইকোর্টে নতুন যুবা Barrister-এর কোন সুবিধা ছিল না। ব্রিফ্‌লেস্ অবস্থা, অর্থের টানাটানি —অথচ সমাজে নাম রাখিয়া চলিতে হয়। এই প্রকার নানা অসুবিধায় পড়িয়া আশু (City) কলেজে ল পড়াইবার কার্য্য গ্রহণ করিয়াছিল। অযোগ্য বেতন, অতি খাটুনি, তবুও কতক সাহায্যের আশায় সে সেখানে কাজ করিতে লাগিল। তাহার উপর ইংরাজির পরীক্ষা পুস্তকের নোট, ট্রিগ্‌নোমেট্রী (Trigonometry) লিখিয়া বাল্য বন্ধু শরৎ লাহিড়ীকে* দিয়া কিছু কিছু পাইতে লাগিল। দিন চলে, অবস্থা অসুবিধাজনক — অতি সাবধানে ব্যয় নির্ব্বাহ না করিলে কষ্টে পড়িতে হইত। ব্যয় সঙ্কোচ (যেটা চৌধুরী বংশের ধাতে নাই) অপরিহার্য্য। কাজে কাজেই ইচ্ছানুরূপ কোন কার্য্যই হইত না। তথাপি, আশু খুব প্রফুল্ল চিত্তে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে কখন ত্রুটি করে নাই।

৪

নানাবিধ আর্থিক অসুবিধার মধ্যে সহসা ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলেন। দিনাজপুরে এক গরীব কেরাণীর তহবিল তসরূপ মোকদ্দমায় আশুকে তাহারা লইয়া গেল। আশু দক্ষতার সঙ্গে সেই মোকদ্দমায় জয়ী হইয়া অত্যন্ত সুখ্যাতি প্রাপ্ত হইল। ক্রমে সেখানে অনেকগুলি মোকদ্দমা পাইলে চারিদিকে সুনাম বাহির হওয়ায়, হাইকোর্টেও ছোটখাট মোকদ্দমা জুটিতে লাগিল। খ্যাতনামা এটর্ণি অপূর্ব্ব গাঙ্গুলী মহাশয় আশুর

---

*শরৎ লাহিড়ী (S.K.Lahiri) সাধু রামতনু লাহিড়ীর মধ্যম পুত্র। কৃষ্ণনগর থাকা কালে আমাদের উভয় পরিবারে বড় ঘনিষ্ঠতা ছিল। সদা সর্ব্বদা আসা যাওয়া, আপদ বিপদে দেখা শুনা চলিত। একবার ম্যালেরিয়া জ্বরে শরৎ অতিশয় কাতর হইয়া প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে না পারায় আশুর মাতৃদেবী তাঁহাকে গৃহে আনিয়া সেবা শুশ্রূষায় আরোগ্য করিয়া পরীক্ষায় পাঠান। শরৎ পাস হইয়াছিলেন এবং আজীবন তাঁহার অনুগত সন্তানবৎ ছিলেন। তিনি আশুকে সহোদর সম মনে করিতেন।

শ্রাবণ ১৩৩২

হাতে প্রথমেই ব্রিফ্ দেন, ও সাহায্য করিতে থাকেন। দিনাজপুর হইতে ফিরিবার পথে আশু চুয়াডাঙ্গা নামিয়া সমস্ত ফি-এর টাকা পিতৃদেবের পায় দিয়া প্রণাম করিলে, তিনি আনন্দাশ্রু বর্ষণে পুত্রকে বক্ষে ধারণ করিয়া, প্রায় সমস্ত টাকা তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন। গরীব চাকর দাসীদিগকে মিষ্টান্ন দিবার নিমিত্ত সামান্য কয়েকটী টাকামাত্র মায়ের হাতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে আশু শনি রবিবারে পিতৃদেবের নিকট চুয়াডাঙ্গা আসিত। তিনি তখন চুয়াডাঙ্গার সাবডিভিসন্ অফিসার।

বিলাত-ফেরত যুবকগণের বিবাহের জন্য দলে-দলে কন্যার পিতা-মাতা, ভ্রাতৃগণ উপযাচক হইয়া থাকেন। ঘটক সমাগমের শেষ করা কঠিন। অথচ বিবাহ-বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের হাত হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। অবস্থা বিবাহের অনুকূল নহে — উমেদার ঢের। সেই বিলাতযাত্রার পথে রবিবাবু ও সত্যবাবুর সহিত যে বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাহাতে ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভার সহিত তাঁহারা আবার বিবাহের প্রস্তাব করিতে লাগিলেন। খুল্লতাতের মুখে সবিশেষ অবগত হইয়া মনোমত পাত্র বিবেচনায় প্রতিভাদেবীও মনে মনে আশুকেই বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কথাটা ভ্রাতার কর্ণগোচর হইল। ক্রমে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। পিতৃদেবের মত না হইলে ত আশু বিবাহে সম্মত হইবে না। অবশেষে তাঁহার নিকট প্রস্তাব করা হইল। তিনি কন্যার রূপ গুণের সুখ্যাতি চারিদিকে শুনিয়া ঐ কন্যার সহিতই পুত্রের বিবাহে মত দিলেন। এ ক্ষেত্রে প্রতীক্ষা করিবার আর সময় পাওয়া গেল না ও বেশী দরদস্তর হইল না। পিতৃদেবের অনুপস্থিতিতে শ্রীমান যোগেশ, কুমুদ, প্রমথ, মনো উপস্থিত থাকিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে "দাদার" বিবাহ দিয়া নববধূ গৃহে আনিল।[১১] পিতৃদেব দিনাজপুরেই রহিয়া গেলেন। স্কট্ লেনের ক্ষুদ্র বাড়ীতে আশুরা তেমনি রহিল।

আজিকার দিনের দেনাপাওনার মত বন্দোবস্ত কিছুই করা হয় নাই। আবার এদিকে "marriage without dowry" (হাল ফ্যাসান) খবরের কাগজেও ঘোষিত হইল না। অমন ছেলের অমনি বিয়ে একটু আশ্চর্য্যের কথা —বৈষয়িক লোকদের অনেকেই মনে করিলেন —সব বাজে —বিশেষতঃ "ঠাকুর বাড়ীতে" যখন বিবাহ। ক্ষুদ্র স্কট্‌স লেনের বাটীতে চারি ভ্রাতা, নববধূ, শ্রীমতী মৃণালিনী ও প্রিয়ম্বদা, থাকিয়া বেথুন স্কুলে যাতায়াত করিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল। সুনিপুণা সুশীলা প্রতিভা দেবীর গৃহিণীপণায় ক্ষুদ্র সংসারটী দিব্য চলিতে লাগিল। অনেক সময়ে অর্থাভাব ঘটিত; তাহাতে কেহই কষ্ট বোধ করিত না। আশু অতিশয় পরিশ্রম সহকারে কাজকর্ম্ম করিত। সেই সময়ে শ্রীমান যোগেশ এম-এ পাশ করিয়া ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে প্রফেসারের পদ গ্রহণ করে।

যোগেশের কাজে কতকটা সাংসারিক সুবিধা হইয়া গেল। পিতৃদেবের আজ্ঞানুসারে

ও স্ব-ইচ্ছায় সে উপার্জ্জনের সমস্তই বধূমাতার হস্তে দিয়া দিত। আমাদিগের পরিবারে টাকা কড়ি ও হিসাবপত্র সব বধূদিগের হস্তেই দিবার নিয়ম। পুরুষদিগের প্রয়োজন মত তাঁহারা বধূগণের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া থাকেন। পূর্ব্বাপর এইরূপই চলিয়া আসিতেছে।

এই সময় আশু কয়েক সপ্তাহের জন্য Indian Association-এর Secretary-পদ প্রাপ্ত হইয়া অতি দক্ষতার সহিত কাজ চালাইয়া ফললাভ করে। তাহার কার্য্যে মেম্বরগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। ৺দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী[১২] মহাশয় সহকারী ছিলেন। সেই হইতেই স্বদেশের উন্নতিকল্পে আশু নানাদিকে চেষ্টা করে। মহানগরী কলিকাতায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, যুবক আশু তাহার একজন প্রধান সভ্য ছিল।

কংগ্রেসের সান্ধ্য সম্মিলনে আশু উৎসাহের সহিত কনিষ্ঠ সহোদর সুহৃদ ও অমিয়কে স্বদেশী পরিচ্ছদে সাজাইয়া সম্মিলনী দেখাইতে লইয়া গিয়াছিল। সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে যে কাজেই অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতেই সে আশাতীত সফলতা লাভ করিয়াছে। তখন হইতেই ব্যারিষ্টারীর আয় অপেক্ষাকৃত কতক বাড়িয়া যাওয়ায় ধর্ম্মতলার আর একটী বড় বাড়ী ভাড়া লইয়া সকলে সেখানে উঠিয়া যায়। সেই হইতেই সভা সমিতিতে যাওয়া আসা, ছোটখাট বক্তৃতা দেওয়া, ছাত্রগণের সহিত মিলা মিশা করিতে সে আলস্য বোধ করিত না। সে তৎকালে ভারতীতে অতি সুন্দর সুন্দর অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া চিন্তাশীলতার পরিচয় দেয়। সে সমস্ত প্রবন্ধ এখনও ভারতীর অঙ্গ শোভা করিতেছে।[১৩] সুলক্ষণা বধূ প্রতিভার সঙ্গীতে অসাধারণ প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়া সমস্ত বন্ধুগণ, ও প্রতিভার আত্মীয়-স্বজনে শনি রবিবারে গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিতেন। তৎকালে শ্রীযুত রবীন্দ্রনাথ ও সত্যবাবু আশুর গৃহে সদাসর্ব্বদা আসিয়া ক্ষুদ্র গৃহটীকে আনন্দ নিকেতন করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন আমরাও তাহার কলিকাতাস্থ ভবনে আসিয়া সুখী হইতাম। মহর্ষিদেব আশুর সহিত পৌত্রীর বিবাহ দিয়া বড় আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আশু আমার একটা অর্জ্জন। অনেক সাধনায় প্রতিভা এমন পাত্রে পরিণীতা হইয়াছে।"

১৮৮৭ সালের ২৫শে আগষ্ট মহর্ষি দেবের গৃহে আশুতোষের প্রথম পুত্র প্রিয়দর্শন শ্রীমান আর্য্যকুমারের জন্ম হইয়াছিল। নাম —ঋষিপ্রতিম সত্যেন্দ্রবাবু দিয়াছিলেন। সুকুমার পুত্রের জন্মে পরিবারস্থ সকলেরই মনে অসীম আনন্দ হয়। যথাকালে শিশু পুত্র লইয়া বধূমাতা আবার নিজ বাসায় আসিয়াছিল। আমাদিগের দেশে মাতুলালয়ে অন্নপ্রাশন হইবার নিয়ম নাই। পিতৃঠাকুর কলিকাতার বাসা বাটীতে আসিয়া অতি সমারোহে পৌত্রের অন্নপ্রাশন দিয়াছিলেন। তাহার পরে ১৮৯২ সালে ২২শে ফেব্রুয়ারী, ধর্ম্মতলার বাসাতে দ্বিতীয় পুত্র ফুটফুটে সুন্দর অশ্বিনীকুমারের জন্ম হইয়াছিল।

পিতৃদেব পেন্সন লইয়া তখন কলিকাতায়। অশ্বিনীকুমারের জন্মের সময় তিনি সেই বাটীতেই উপস্থিত ছিলেন। সদ্যপ্রসূত দিব্য-কান্তি শিশুকে দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া তিনি অসীম আহ্লাদ প্রকাশ করেন। চিরজীবন দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকায় প্রবাসে প্রবাসে ঘুরিয়া কখন নবজাত শিশু দেখেন নাই, —এটা তাঁহার জীবনের একটা নবযুগ। তিনি দিবসের অধিকাংশ সময়েই সূতিকা-গৃহে বসিয়া বসিয়া শিশু পৌত্রকে দেখিতেন ও ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া সুখী হইতেন। মাও সেই জন্ম দিন হইতেই অশ্বিনীকুমারকে পুত্রাধিক অপার স্নেহে লালন পালন করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। শিশু অশ্বিনীও এক মুহূর্ত্ত তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না। "মা মণি" পিতামহী ও দাদাবাবুকে অত্যধিক ভালবাসিয়া তাহাদের সঙ্গ কখন ছাড়িয়া কোনখানেই যাইত না। "অশ্বিনীকুমার"নাম পিতৃদেব নিজেই দিয়া শিশুর অন্নপ্রাশনের অন্ন নিজ হস্তে তাহার মুখে তুলিযা দিয়াছিলেন। তখন পেন্সন লইয়াছিলেন জন্য শিশুর অন্নপ্রাশনে তেমন আর ধূমধাম করেন নাই। এই সময় আশু পিতৃ আজ্ঞায় শ্রীমান মন্মথকে ডাক্তারী পড়িতে বিলাত পাঠাইযা দিয়াছিল ও সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যয় সানন্দচিত্তেই বহন করিত। তাহাতে কোন ত্রুটী কখন করে নাই। রাজ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পর পিতৃঠাকুর একা কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে আর বাস করিতে পারিলেন না। আশুতোষ আমাদিগের সবাইকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিলেন। মন্মথ বিলাত-গমনের পরই ভগিনী মৃণালিনীর বিবাহ স্থির করা হয়। অধুনা সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীমান উমাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত তাহার বিবাহ আশুই দিয়াছে। উমাদাস আশুর পরম বন্ধু। কৈশোরে কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে উভয়ে এক সঙ্গে পড়াশুনা করিতেন। বিলাতেও দুইজন একত্র বাস করাতে সেই বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ ভাবে আরও দৃঢ়তর হইয়াছিল। জীবনের কত সুখ দুঃখের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে অতিশয় ভালবাসিত। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত সেই অকৃত্রিম ভালবাসা সমান ভাবেই রহিয়া যায়। ভগিনীর বিবাহ অন্তে আবার আশু ভাগ্নিয়েয়ী প্রিয়ম্বদার বিবাহ তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের (উমাদাসের জ্যেষ্ঠ সহোদর) সহিত দিয়া সুখী হয়।[১৪] তারাদাস একটা মানুষের মত মানুষ ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত, স্নেহশীল, বদান্য ছিলেন। মিষ্টভাষিতা ও জনপ্রিয়তাগুণে তাঁহার কাহারো সহিত কখনও মনোমালিন্য হয় নাই। সবাইকে তিনি আপনার বলিয়া জানিতেন। দেশানুরাগের এই চরমবাক্য সতত তাঁহার মুখে শুনা যাইত —"দেশের কুকুর পুজি বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া"। তাঁহার অকাল মৃত্যু জনিত শোকে আশু নিতান্তই কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সে সব অসহনীয় শোক দুঃখের কাহিনী আর বিশেষভাবে লেখা সাধ্যাতীত।

ভাদ্র ১৩৩২

৫

আশুর ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় ভার বাড়িয়া গেল। সেই হইতেই আশু প্রকাশ্যে ও গোপনে গরীব ছাত্রগণকে সাহায্য করিতে লাগিল। সমস্ত সংসারই তাহার উপর। যত্র আয় তত্র ব্যয়। তখন হইতে ক্রমে ক্রমে ভ্রাতৃগণ বিলাত যাইতে লাগিল। পিতৃদেব ইন্‌কাম ট্যাক্সে ভাগলপুরে অনেক গরীবকে ছাড়িয়ে দেওয়ায় সরকার বাহাদুর নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হওয়াতে ৮০০ শত টাকার গ্রেডে ৫০০ শত টাকা বেতন। নামে Senior হইয়াও ঐ Junior-এর বেতনের টাকার বেশী পান নাই।

সেই হিসাবে পেন্সন ২৫০ টাকা মঞ্জুর হইয়া যায়। শ্রীমান যোগেশ তখন ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজ হইতে ছুটী লইয়া বিলাত গমন করে ও অক্সফোর্ডে ভর্ত্তি হয়। প্রমথ সেই সময়েই বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতে গিয়াছিল। আশুর পরিশ্রমের একশেষ ও চারিদিকে ভাবনা; এবং নানা প্রকারে উদ্বেগের কারণ থাকিত। দুর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ সেই সময় পিতৃদেব পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া শয্যাগত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসা সেবা কোন দিকেই কোনরূপ ত্রুটী হয় নাই।

আশু হাইকোর্টের পর গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃদেবের নিকটেই বসিয়া প্রত্যহ তাঁহার পদসেবা করিত। বধূমাতা প্রতিভাদেবী শ্বশ্রুদেবের সেবা শুশ্রূষায় নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতেন। পিতৃদেব বধূমাতাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। বধূমাতার সুশীল নম্র ব্যবহারে তাঁহার মনে আনন্দ হইত। তিনি শ্বশ্রুকে প্রতিদিন সায়াহ্নে ব্রহ্ম-সঙ্গীত শুনাইতেন ও সর্ব্বদাই কাছে কাছেই থাকিতেন। অমন কঠিন রোগেও পিতৃদেবের মন কিছুমাত্র দমিয়া যায় নাই, প্রফুল্লচিত্তে তিনি সমস্ত ব্যাধির কষ্ট সহ্য করিতেন। জ্যেষ্ঠতাত ৺রামকৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়ও ঐ পক্ষাঘাত রোগেই এক বৎসর নয় মাস শয্যাগত থাকিয়া লোকান্তরে যান। উভয় ভ্রাতার —পিতৃদেব ও জ্যেঠা মহাশয়ের কিছু মাত্র মৃত্যু-ভয় না থাকায়, তাঁহারা কখনই কোন প্রকারে উদ্বিগ্ন হইতেন না। দেখিতে দেখিতে পিতৃদেবের পীড়া বাড়িয়া যাইতে লাগিল; তিনিও সেই জ্যেঠামহাশয়ের মত এক বৎসর নয় মাসের মধ্যে লোকান্তরে গমন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ৬৪।৬৫ বৎসর। পুরুষের পক্ষে ইহাকে অকাল ও অসময় মনে করা যায়। তিন ভাই বিলাত প্রবাসে, —স্নেহশীল পিতৃবিয়োগে আশু একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেও, কাহারও নিকট সান্ত্বনা পাইবার জন্য প্রয়াস করিত না।

আশু আদি-সমাজের দীক্ষিত ব্রাহ্ম হইয়াও মাতৃ-আজ্ঞায় পিতৃশ্রাদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মানুসারে করিয়াছিল। ইহা পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত পুত্রের উপযুক্ত কাজই হইয়াছিল বলিয়া মহর্ষিদেব মনে করেন।

পিতৃদেবের লোকান্তর গমনে আশু অতিশয় শোকাকুল হইয়া ধর্ম্মতলার বাটী পরিত্যাগ করিয়া আবার লোয়ার সারকুলার রোডে একটী বৃহৎ দোতালা-তিনতালা রকমের বাটীতে উঠিয়া যায়। এই অদ্ভুত বাড়ীতে ভৃত্যগণ অনেক ভূত দেখিত—সব সাহেব মেম। শুনিতে পাওয়া যায়, এই বাড়ীতে নাকি লর্ড ক্লাইব পূর্ব্বে বাস করিয়াছিলেন, তাই ভৃত্যেরা বিদেশী ভূত কল্পনা করিত। সে বাটীটী এক্ষণে "সরকারী" ছাপাখানা।

এখন হইতে আশুর ব্যারিষ্টারী ব্যবসা দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন আশু মফস্বলে যাতায়াত করিত। এই গৃহেই তৃতীয় পুত্র সুদর্শন শিবকুমারের জন্ম হয়। শ্রীমান কুমুদও তাহার পরেই বিলাত যাত্রা করে। ক্রমে চারি ভ্রাতা প্রবাসে চলিয়া যাওয়াতে আশু একা হইয়াই পড়ে।

উদ্‌যোগী পুরুষসিংহ আশুর পরিশ্রমে কোনরূপ বিরাম ছিল না —তাহার উপর সভা সমিতিতে সর্ব্বদাই যোগ দিত। যে যেখানে ডাকিয়াছে, আশু হাস্যমুখে সেখানেই যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানের প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির আসনের শোভা বর্দ্ধন করিয়া অভিভাষণে আশু মুক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিল, "বিজিত জাতির রাজনীতি নাই" ("A subject race has no politics")। এই মহাবাক্য তাহার মুখ হইতে বাহির হইবামাত্র সভায় একটা অভূতপূর্ব্ব জনকোলাহলের তরঙ্গ বহিয়া যায়, —যুবা, বৃদ্ধ, কলেজ-স্কুলের ছাত্রবর্গের করতালিতে সভা মুখরিত হইয়া উঠে। "ভিক্ষানীতির" বিরুদ্ধে এই প্রথম নির্ভীক প্রতিবাদ। এই বাক্যে বঙ্গদেশের গ্রাম, পল্লী, সহর —চারিদিক দাবাগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। এই আন্দোলনে "ইংলিশম্যান" প্রভৃতি সংবাদপত্র নানা প্রকার অপ্রিয় সমালোচনায় "Vile sedeition"বলিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতেও ছাড়িল না। সে সময় স্বদেশী আন্দোলনে মাননীয় সুরেন্দ্রনাথের সহকর্ম্মী ছিল আশু। তিনিও পূর্ণমাত্রায় সকল দিক হইতে আশুর সাহায্য পাইয়াছিলেন।

নানা স্বদেশী কলকারখানার সাহায্য-কল্পে প্রচুর অর্থ দানে আশু কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। প্রধানতঃ তাহারই উদ্‌যোগে প্রথম স্বদেশী কাপড়ের কল "বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্" প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতীয় ভাবে প্রণোদিত হইয়া আশু "National Council of Education" (জাতীয় শিক্ষা পরিষদ)[১৫] প্রতিষ্ঠা করে। অর্থ সামর্থ্য দানে প্রাণপণ চেষ্টায় আশু তাহার উন্নতি করিতে লাগিল। তাহার গৃহে যে সব আত্মীয় ছাত্র থাকিয়া তাহারই অর্থ-সাহায্যে বিদ্যাভ্যাস করিত, আশু তাহাদিগের অনেককেই সেখানে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া সাহায্য করে। আজীবন জাতীয় প্রচেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করিয়া কর্ম্মবীর আশুতোষ নিজ হস্তে এই সেদিন যাদবপুরে বিরাট কর্ম্মশালার ভিত্তি স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে মাতৃপূজার আয়োজন করিয়াছিল। আজ সেই মহাযজ্ঞের হোতা কোথায় ? ভিত্তি স্থাপনের পূর্ব্ব হইতেই শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু দেশ-মাতৃকার একনিষ্ঠ পুত্র ও সেবক আশুতোষকে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে কেহ

বাধা দিতে পারিলেন না। সেই ভগ্ন শরীরে যাদবপুরে যাইয়া আশু অমিত পরিশ্রমে জাতীয় শিক্ষা পরিষদকে উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিল। তাহার আশা ছিল, নিজ হস্তে যে বীজ রোপণ করিল, সেই বীজ হইতে কালে প্রকাণ্ড মহাবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তারপূর্ব্বক ফল পুষ্পে সমস্ত দেশ সুশোভিত করিবে; এবং আশু তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া সার্থক-মনোরথ হইয়া যাইবে। বঙ্গ জননীর দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সে আশা ফলবতী হইতে পারিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ-ভাষা প্রবর্ত্তনের সময় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে চৌধুরী আশুতোষ কায়মনোবাক্যে সাহায্য করে এবং দুই আশু একত্র হইয়া ভ্রাতৃবৎ সখ্যতায় কার্য্য করিয়াছিল।

"Bengal Landholders' Association"[১৬] তাহার জীবনের অন্যতম কীর্ত্তি। পূর্ব্বে অনেক সময়েই সরকারী কর্ম্মচারী দ্বারা বনিয়াদি জমীদারবর্গ লাঞ্ছিত হইতেন ও আত্মমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া তোষামোদে উপরালাদিগের নিকট যুক্ত-করে থাকিতেন। তাঁহাদিগের এই দুর্গতি মোচনার্থ আশুতোষ বাঙ্গালার জমীদারবর্গকে আহ্বান করিয়া স্বাধীনচেতা মহারাজা সূর্য্যকান্তের সাহায্যে "Landholders'Association"-এর সভ্য করিয়া লইলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ানে তাঁহার মান রক্ষা হয় নাই। তখন অতি উৎসাহের সহিত এই কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল। এই সমিতি এমন সুদৃঢ় রূপে গঠিত হয় যে, বড়-ছোট লাট মহোদয়গণ সমিতির কার্য্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৯০৫ সালের আগষ্ট মাসে বঙ্গ-ভঙ্গের আদেশ প্রচারিত হইলে, বঙ্গবাসীগণ ক্ষোভে দুঃখে একেবারে আত্মহারা হইয়া যান। তখন শ্রীযুত (স্যার) আশুতোষ বাঙ্গালার জমীদার-পক্ষ হইতে যে প্রতিবাদ লিখিয়া পাঠান, তাহাতে লর্ড কার্জ্জনের মত Viceroyকেও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, "It was the ablest and strongest produced by the opposition." ১৯০৬ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের প্রতিবাদ করিতে টাউন হলে যে মহতী সভা হয়, তাহাতে শ্রীমান যোগেশ অশ্বারোহণে ছাত্রবর্গ ও আশুতোষের বাড়ীর ছোট ছোট বালক ও আত্মীয়-স্বজনগণকে সঙ্গে করিয়া সভায় যোগদান করিতে যায়। মুহূর্ত্ত মধ্যে চতুর্দ্দিকে এই অলীক সমাচার প্রচারিত হইয়া গেল যে, পুলিসে তাহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবে। এই আদেশ সরকার হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে।

কার্ত্তিক ১৩৩২

৬

আশুতোষ টাউনহল হইতে কোন কোন ছাত্রকে গৃহে পাঠাইয়া গৃহের মহিলাগণকে নির্ভয়ে থাকিতে বলিয়া পাঠায়। আশুতোষের জননী তাহা শুনিয়া ছাত্রদিগকে

বলিয়াছিলেন, স্বদেশের হিত-কল্পে তাঁহার সন্তানবর্গ বন্দী হইয়া কারাগৃহে যাইলেও তিনি কিছুমাত্র ভীত বা দুঃখিত হইবেন না। সন্ধ্যা সমাগমে যুবক ছাত্রবৃন্দে পরিবৃত হইয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে দিগদিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া তাহারা সকলে নিরাপদে গৃহে আসিয়া পৌঁছিল। তখনকার সেই আন্দোলন একটা অপূর্ব্ব ঘটনা। আশুতোষ নির্ভীক ভাবে ন্যায়-পথে দাঁড়াইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে একান্ত ভাবে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিল। ন্যায়-ধর্ম্মে যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা করিতে সে কিছুমাত্র পশ্চাৎপদ হয় নাই। মাননীয় ৺অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রভৃতি যখন নির্ব্বাসন দণ্ড পান, সে সময় না কি আশুতোষেরও নাম তাঁহাদিগের মধ্যে ছিল। আশুতোষ এমন কোন কাজই করে নাই, যাহার জন্য তাহাকে রাজবন্দী করিতে পারে।

যে সময় Universityর নাম হয় "গোলামখানা" এবং অনেক কৃতী ছাত্র সর্ব্বপ্রকার পরীক্ষা দিতে পরাঙ্মুখ হইয়া বসিয়াছিলেন, তৎকালে আশুতোষ তাঁহাদিগের গৃহে গৃহে যাইয়া ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নানা রূপ সুপরামর্শ দানে তাঁহাদিগকে দিয়া পুনর্ব্বার পরীক্ষা দেওয়াইয়াছিল। সে সব স্মরণীয় দিন বঙ্গমাতার স্মৃতি-পটে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আশা করা যায়, সেদিনের সেই সব ছাত্রগণও তাহা বিস্মৃত হন নাই। তৎকালে চতুর্দ্দিকে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, এক রবিবারে ডক্ হইতে ৩০০-৪০০ কুলী "বন্দেমাতরম" গাহিতে গাহিতে আশুর গৃহে আসিয়া সাহায্য ভিক্ষা করে। তাহারা দুই দিন অনাহারে থাকিয়া এই মহানগরীর কাহারো নিকট সহানুভূতি পায় নাই। আশু তৎক্ষণাৎ সেই ক্ষুধাতুর কুলীদিগের আহার্য্য চিঁড়া দই গুড় ইত্যাদি আনাইয়া সবাইকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করায়। তাহার পরিবারের মহিলাগণই এই বুভুক্ষিত শ্রান্ত অতিথিগণকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

বিলাতে শ্রমিকরা strike করিলে তাহাদিগের আহারের জন্য প্রচুর অর্থ থাকায়, কাহারও অন্ন বস্ত্রের কষ্ট হয় না; কিন্তু এই দুর্ভাগা দেশে এমনি অন্ন মিলা ভার। তাহার উপরে strike করিলে কুলী মজুরের ক্ষুধার জ্বালায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান ছাড়া উপায় নাই। শাস্ত্রে অবিচারে ভিক্ষা দানের বিধি আছে। এ মহাবাক্য কেহ প্রতিপালন করে না। কাজেই শ্রমিকেরা strike করিলে, তাহাদের পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতে হয়।

আশু সেই সকল ব্যক্তিকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া ও সাধ্যমত সামান্য কিছু কিছু দিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পাঠাইয়া দেয়। অবস্থার উন্নতির সহিত আবার Circular Road-এর বাসা বাটী ত্যাগ করিয়া আশুতোষ ১৬নং Store Road বালীগঞ্জে উঠিয়া আইসে; এবং নিজের গৃহ নিম্মার্ণের জন্য স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে স্যার তারকনাথ পালিতের বাগান ক্রয় করিয়া লইল। সে গৃহ নির্ম্মাণ করিবার ভিত্তি স্থাপন নিজ হস্তেই করিয়াছিল। সে গৃহের নক্সা তাহার নিজের। তাহার পরম হিতৈষী অকৃত্রিম

বন্ধু ৺শ্রীদামচন্দ্র শীল এই গৃহ নির্ম্মাণের পর্য্যবেক্ষণ কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকিয়া সকল কাজ করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীদামবাবু আশুকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন; আপদ বিপদে অনেক সাহায্যও করিয়াছিলেন। তাঁহার উপকার জীবনে ভুলিবার নহে। আশুও প্রতিদানে সমুচিত প্রত্যুপকার করিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে ত্রুটী করে নাই। বালীগঞ্জে Sunny Park-এর বৃহৎ সুদৃশ্য প্রাসাদ তুল্য বাটী নির্ম্মিত হইলে আশু সপরিবারে স্থায়ী ভাবে সেই বাড়ীতে বাস করিবার জন্য উঠিয়া আসিয়াছিল। ১৬ নম্বর গৃহে তাহার সর্ব্ব কনিষ্ঠ পুত্র দিব্যকান্তি (দেবকুমার) "দেবুর" জন্ম হয়। ঐ গৃহেই মাতৃষ্বসা লোকান্তরে গমন করেন। সুতরাং সে গৃহের সহিত সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত। এই সময় আশুর স্বাস্থ্য উত্তম ছিল; উপার্জ্জন, উৎসাহ ও উদ্যমশীলতা অসাধারণভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। তাহার Sunny Park-এর বাটীর বিচিত্র আস্‌বাব (Furniture)সকল স্বদেশ-জাত। কত দেশ-দেশান্তর হইতে বহু অর্থে সেসব আনাইয়া সে গৃহ সজ্জিত করিয়াছিল। সে গৃহের প্রত্যেক দ্রব্য স্বদেশী। স্বদেশানুরাগে প্রণোদিত হইয়া সে যখন যেখানে গিয়াছে, সেই স্থানের সব সুন্দর সুন্দর দ্রব্যাদি আনিয়া সযত্নে রক্ষা করিয়াছে। তৎকালে জাপানীরা অনেক ভাল ভাল চিত্র তাহার জন্য প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এখন তাহা দুর্লভ ও বহু মূল্যবান।

অগ্রহায়ণ ১৩৩২

৭

ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় ও নানা প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে আশুর জীবন যখন ভরপুর, তখনও তিনি আদালতের পর স্বদেশী কার্য্যে অপরিমিত পরিশ্রম করিতে কখন ক্ষান্ত হন নাই। সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গের অনেক ভদ্রসন্তান স্বদেশী "টহল গান" গাইয়া গাইয়া ভদ্রলোকের বাড়ীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। সেই একদল ভদ্র যুবককে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহার Sunny Park-এর গৃহের পার্শ্বে আর একটী ভিতর-বাড়ী আছে; সেই বাড়ীতে ময়মনসিংহ হইতে সমাগতদিগকে আশ্রয় দিয়া আশু অনেকদিন রাখিয়াছিলেন ও তাহাতে কতকটা অসুবিধায় পড়েন। তাহাদিগের যাহা কিছু প্রয়োজন সবই তিনি নিজ ব্যয়ে নির্ব্বাহ করিতেন। ওই কার্য্যটী অচিরাৎ পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যখন তখন প্রকাশ্যে ও গুপ্তভাবে তাঁহার সেই ছোট বাড়ীতে আসিয়া ছদ্মবেশী পুলিশ উৎপাত করিত। দ্বিপ্রহর নিশীথে তাহাদিগের কার্য্যে গুপ্তভাবে আসা-যাওয়া ভৃত্যবর্গের চক্ষে পড়ায় তাহারা আসিয়া প্রভুপত্নীর নিকট এ কথা বলায় তিনি প্রথমতঃ বিশ্বাস করেন নাই। তাহার পর

একদিন স্বচক্ষে এই ব্যাপার দেখিয়া প্রতিভা দেবী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যান ও স্বামীকে বলিয়া পুলিশ কমিশনার দ্বারা এই উৎপাত দূরীভূত করিয়া দেন। সেই সব ব্যক্তি অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে। ১৮৯৮ সালে অক্টোবর মাসে যে প্লাবন হইয়া কলিকাতা জলমগ্ন হইয়াছিল সেই সময় আশুর তিন বৎসর বয়স্কা একমাত্র কন্যা অশোকা সেই প্রাঙ্গণের জলে অসময়ে খেলা করিয়া হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় আশু তাহার জীবনসংশয় অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। তাহাতেই দুর্ভাবনায় প্রতিভাদেবীর হৃদ্‌রোগের সূত্রপাত হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত কন্যাকে লইয়া ব্যস্ত থাকায আশু অন্য কাজে মন দিতে পারেন নাই। অবশেষে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভের আশায় অশোকার চিকিৎসার্থে সমস্ত পরিবারকে বিলাত পাঠান। বিখ্যাত স্নায়বিক চিকিৎসক ডাক্তার হরনিলিকে দিয়া চিকিৎসা করাইবার জন্য প্রতিভা দেবী পুত্র, কন্যা ও বধূমাতা সহ বিলাত রওনা হইয়া যান, আশু একাই কলিকাতায় থাকিয়া কাজকর্ম্ম করিতে থাকেন। প্রচুর চেষ্টা করিয়াও ডাক্তারের চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় নাই; তবে অনেকটা উপকার হয়। তাহার পূর্ব্বেই ভ্রাতাগণের ও পুত্র আর্য্যকুমারের বিবাহ অতি সমারোহে দিয়া আশু অত্যন্ত আনন্দানুভব করেন। আশু ইহার আগেই আর্য্য ও অশ্বিনীকে পাঠার্থে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ের মধ্যে নানা স্বদেশী ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ৩০শে আশ্বিন "রাখী বন্ধন" দিনে আশুর গৃহে রীতিমত উৎসব চলিত।

রাজনীতি ক্ষেত্রে আশুতোষ একজন চমূপতি ছিলেন। একালের যে কংগ্রেস প্রথম সোপানাবলী গাঁথিয়া জাতীয়তা গঠনের সূত্রপাত করেন, সেই কংগ্রেসের তিনি একজন প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।

আশু স্ত্রী কন্যাকে গৃহে আনিবার জন্য পূজার ছুটীতে আবার বিলাত যান। স্বদেশী আন্দোলন বিষয়ে তখন সেখানে "ইন্ডিয়া আফিসে" কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল তাহা আমরা কেহই অবগত নহি। তবে আশুকে স্বদেশী কার্য্য হইতে দূরে রাখিবার জন্য এখানে প্রধান বিচারপতি সার জন লরেন্স তাঁহাকে হাইকোর্টে বিচারপতি রূপে বরণ করিবার জন্য বিশেষ রূপে ধরিয়া পড়েন। তৎকালে তাঁহার প্রভূত লাভকর ব্যবহারজীবীর ব্যবসায় ত্যাগ করাইয়া তিনি আশুকে ১৯১১ খৃঃ অব্দে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করান। তাহাতে তাঁহার অতিশয় আর্থিক ক্ষতি হইয়া যায়। তখন তাঁহার অজস্র মাসিক আয় ছিল। হাইকোর্টের জজের বেতনে তাঁহার মাস চলা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। এই মহা ত্যাগে তাঁহার চারিদিকে যে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা জীবনে পূর্ণ হয় নাই। দুই পুত্র বিলাত-প্রবাসে। স্বদেশী ভাণ্ডারে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রভৃতিতে যে মুক্ত হস্তে দান করিতেন, তাহাও বাধ্য হইয়া সংক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। দেশহিতকর কার্য্য সমূহের জন্য এই ব্যয় লাঘব করিতে তিনি

মনে মনে যথার্থই পীড়া বোধ করিতেন। দেশের শিল্প, বাণিজ্য, সঙ্গীত ও চিত্রকলা ইত্যাদি দেশীয় ভাবে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য তাঁহার হৃদয়ের চির আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা সব বিচারপতি হইয়া আর অগ্রসর হইল না। ক্রমে পূর্ণ স্বাস্থ্যও ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল। মস্তিষ্কের অত্যধিক পরিচালনায় শারীরিক শ্রম করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

বিচারপতির পদ গ্রহণের পূর্ব্বে আশু মাতৃদেবীর অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে পুত্রবৎসলা মাতা বলিয়াছিলেন, "তুমি ব্রাহ্মণ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা তোমার জাতিগত কর্ম্ম। তবে তোমার জন্মের সহিত চৌধুরী বংশের সকলে এক বাক্যে ভবিষ্যৎ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন যে, তুমি হাইকোর্টের জজ হইবে। তুমি জজ পদ গ্রহণ করিলে তাঁহাদের সেই কথা সফল হইবে। আমার কোন আপত্তি নাই। তবে তোমার সমূহ আর্থিক ক্ষতি হইবে এবং চারিদিকের ব্যয়-ভার সংক্ষেপে করিতে বড় বিব্রত হইয়া পড়িবে, সেইটিই ভাবিবার বিষয়।"

তিনি বিচারপতির আসনে বসিয়া স্বদেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এক একটা কার্য্যে সুবিচারের সম্যক প্রমাণ পাওয়া যাইত। এ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতিভা সকলকে চমকিত করিয়াছিল। তাঁহার পূর্ব্বে কোনও ভারতবাসী আদিম বিভাগে (Original side) বিচার করিবার অধিকার পান নাই। তিনিই প্রথম ভারতবাসী, যিনি ক্রিমিনেল সেসন্সে বিচারের অধিকার প্রাপ্ত হন। হাইকোর্টে কার্য্যের পরে নানা প্রকার দেশহিতকর কার্য্যে আশু সর্ব্বদা যোগদান করিতেন। যে কোন সভা সমিতিতে তাঁহাকে আহ্বান করিত, সেই খানেই হৃষ্ট মনে যাইতেন। এই মহানগরীর অনেক স্থানে সাধ্যাতীত রূপে অর্থ সাহায্যও করিয়াছেন। আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য থাকায়, তাহার স্বাধীনতা রক্ষার্থ আশু সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহিত অকাতরে কার্য্য করেন।

রিপন কলেজের ও পাবনা কলেজের উন্নতি-কল্পে ও দরিদ্র-ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য, টেক্‌নিকেল ইন্‌স্‌টিটিউটে ও ফেডারেশন হল নির্ম্মাণার্থে আশু মুক্ত-হস্তে দান করিয়াছিলেন।

রাজসাহী জেলাতে একটা কথা চিরপ্রচলিত আছে, যে রাণীভবানীর ব্রহ্মোত্তরে বাস করে না সে ব্রাহ্মণ নহে। আজ তেমনি বলিতে পারা যায়—"আশু চৌধুরীর অর্থ যে লয় নাই—সে স্বদেশীর বিষয় সম্যক অবগত নহে।"

তাহার দেশমাতৃকার কৃতী সন্তান, নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক আশুতোষের এই সব বিষয়ের পরিচয় নূতন করিয়া দিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। তাহার সিন্দুক আজ নানাবিধ স্বদেশী কাগজে ভরা। সে সব ন দেবায় ন ধর্ম্মায় বৃথা গিয়াছে। ১৯২১ খৃঃ অব্দে আশু সার উপাধি পাইয়া নাইট্‌ হন। সে সময় আমরা দার্জ্জিলিং-এ ছিলাম। তিনি

নাইট্ হইয়াছেন এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র দার্জ্জিলিং-এর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে একটা আমোদের স্রোত বহিয়া যায়। তাঁহারা আমাদিগকেই Congratulate করেন। তাহার পরে আশুর নিকট হইতে Post card-এ, এইরূপ সমাচার আসিয়াছিল—

"দিদি, তোমাদের কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন। নাম ছিল আশুতোষ চৌধুরী, আজ হইলাম ছার। তুমি যেন ভুলিয়াও কখন সার কিম্বা লেডি চৌধুরী লিখিও না।"

অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও নানা ভাবনা চিন্তায় আশুর স্বাস্থ্য ক্রমে ভগ্ন হইতে আরম্ভ হয় ও ১৯২১ খৃঃ অব্দেই তিনি সামান্য ৭৫০্ পেন্সনে বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহাকে আরো তিন বৎসর কাল ঐ পদে থাকিয়া, মাসিক হাজার টাকা পেন্সনে অবসর লইবার জন্য উপর হইতে অনুরোধ করা হইয়াছিল ; তিনি কিন্তু তাহাতে আর রাজি হন নাই। কার্য্য ত্যাগের পর তাঁহার ব্যারিষ্টারী ব্যবসায় আবার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সেই সব পুরাতন মক্কেলগণ আসিয়া তাঁহাকে অনেক কাজ ও রিটেনার দিতে লাগিলেন। তিনিও নূতন উৎসাহে পূর্ব্ববৎ কাজ করিতে আরম্ভ করিলেন। বিচারপতি থাকিতে কংগ্রেসে কেবলমাত্র দর্শক হইয়া যাইতেন এবং নীরবে বসিয়া থাকিতেন। অবকাশ পরে রাজনীতি ও অন্য প্রকার স্বদেশী কার্য্যে পূর্ণ মাত্রায় যোগদান করেন। এই সময় তিনি জাতীয় দলের নেতা হইয়া নবগঠিত ব্যবস্থাপক সভায় প্রাণপণ শক্তিতে স্বদেশের হিতার্থ তর্কবিতর্ক করিতে ক্ষান্ত ছিলেন না। পাবনা হইতে কাউনসিলের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া তাঁহার আয়ত্ত মধ্যে অনেক কাজই করেন। প্রিন্স অব ওয়েল্সের শুভাগমন উপলক্ষে যে হরতালের গোলযোগ ঘটে, তাহাতে শ্রীমতী বাসন্তীদেবী প্রমুখ মহিলাগণ ধৃত হইলে, আশুই সে সময় গভর্ণরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বাসন্তী দেবীদিগকে মুক্ত করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। সার আশুতোষ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সহযোগে দেশের প্রধান প্রধান নেতৃবর্গ ও গভর্মেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ উভয় পক্ষের লোকের মিলিত যে Round Table Conference হয়, তাহাতে উভয় পক্ষের লোক আহ্বান করিয়া যাহাতে আমাদের স্বরাজ সহজে হইতে পারে তাহার চেষ্টায় ছিলেন। দেশবন্ধু দাশেরও এ বিষয় আপত্তি ছিল না, কেবল মহাত্মা গান্ধি বিমুখ হওয়াতে এই উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে নাই। তাহা না হইলে যুবরাজের শুভাগমন কালে প্রাদেশিক স্বরাজ দিতে সে সময় সরকার বাহাদুর একরূপ প্রস্তুতও ছিলেন।

পৌষ ১৩৩২

৮

আশুর স্বদেশ-সঙ্গীতের প্রতি বড় অনুরাগ ছিল। তাহার উপর পত্নী প্রতিভা দেবী, সঙ্গীতে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া, সঙ্গীত-বিদ্যায় একজন অদ্বিতীয়া প্রতিভাশালিনী বলিয়া গণ্য হওয়ায়, তাঁহার আগ্রহাতিশয্যে আশু একটী সঙ্গীত-বিদ্যালয় নিজ গৃহে স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান ও ব্যয়ভার বহন করিতেন।[১৭] প্রথমে তাহা অবৈতনিক ছিল। শেষে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে একটী বাড়ী ভাড়া করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেইজন্য এই বিদ্যালয়ের সামান্য বেতন নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া যাহা কিছু সামান্য পাওয়া যাইত তাহাই যথালাভ মনে করিতেন।

প্রতিভা দেবী অতি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াও সঙ্গীত-সঙ্ঘের উন্নতি সাধনে কায়মনোবাক্যে যত্নবতী ছিলেন। ভারতবর্ষের যে কোন স্থান হইতে গুণী সঙ্গীতজ্ঞ মহানগরীতে আসিতেন, তিনি প্রথমেই তাঁহাদিগের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া আপন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। সঙ্গীত-সঙ্ঘের উদ্দেশ্য—প্রথমতঃ যে সঙ্গীত-কলা ক্রমশঃ লুপ্তপ্রায় হইয়া যাইতেছিল, তাহার পুনরুদ্ধার করা, এবং দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীতপ্রিয় বাঙ্গালী জাতির পুত্রকন্যাদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ সঙ্গীত শিক্ষা দ্বারা গৃহে গৃহে অসীম আনন্দ দান করা ও বঙ্গীয় যুবকগণ যাহাতে নিজালয়ে ইহার চর্চ্চা করিয়া সুখী হইতে পারেন তাহারই সমূহ চেষ্টা করা। আজ তাঁহারা উভয়েই অসময়ে অকালে লোকান্তরে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যম পুত্র শ্রীমান অশ্বিনীকুমারের প্রাণপণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় সঙ্ঘের যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইলে তাঁহারা কত না অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করিতেন। সঙ্গীত-সঙ্ঘের অবস্থা এক্ষণে আশাতীত উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কৃষ্ণনগরের খ্যাতনামা দেওয়ানজি পরিবারের সহিত চৌধুরীদিগের প্রত্যেকের অতিশয় আত্মীয়তা ছিল। বিশেষতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আশৈশব ভ্রাতাদিগের পরম বন্ধু। নরেন্দ্র (নরু) হরেন্দ্র (হরু) ও দ্বিজেন্দ্র (দ্বিজু) সদা সর্ব্বদাই আশুর সহিত একত্র থাকিতেন ও সাহিত্যালোচনা, মাঝে মাঝে সঙ্গীত-চর্চ্চা হইত। তাহার পর বিলাত-প্রবাসে দ্বিজু আশুর সহিত এক সঙ্গে থাকায়, পূর্ব্ব কৈশোর বন্ধুতা আরো গাঢ়তর হইয়াছিল। দ্বিজু দেশে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহারই গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিজু সেই সময় "একঘরে" নামে নানা প্রবন্ধ লিখিয়া আশুকে শুনাইয়া মতামত জিজ্ঞাসা করিতেন। যেটা তাঁহার ভাল লাগিত সেটা আশু খুসী মনে বলিতেন, ও যেটা তাঁহার মনঃপুত হইত না, তাহার তীব্র সমালোচনাও করিতেন। দ্বিজেন্দ্র তাহাতে কিছুই মনে না করিয়া আশুরই অভিমত সাদরে গ্রহণ করিতেন।

দ্বিজু "Lyrics of Ind"[১৮] লিখিয়া প্রথমে আশুকে দেখাইতে আনিলে, তিনি কবিতার প্রশংসা করিয়াও কিন্তু তাহা ছাপাইতে বারণ করিয়াছিলেন। আশু বলেন, "মাইকেল" আজ স্বজাতির মুকুটমণি শুধু মেঘনাদ প্রভৃতির জন্য। দ্বিজু আশুর অমতেই তাহা মুদ্রিত করিয়া শুধু অর্থনাশ করিয়াছিলেন মাত্র। ইংরাজী কবিতা ছাপাইবার পর দ্বিজু একেবারে সর্ব্ব প্রকারে খাঁটী স্বদেশ-সেবক হইয়া উঠিলেন। তৎপরে তিনি স্বদেশী সঙ্গীত, "হাসির গান" প্রভৃতি রচনায় মনোনিবেশ করিয়া আপনাকে ও দেশকে ধন্য করিয়াছিলেন। এক দিন আশুর গৃহেই "আমার দেশ" গাইতে গাইতে এমন উত্তেজিত হইয়া উঠিযাছিলেন যে, সমস্ত গৃহের লোক—দ্বিজু মূর্চ্ছা যাইবে ভয়ে, তাঁহার গান থামাইয়া তাঁহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিয়াছিলেন। পরিশেষে "হাসির গান" আরম্ভ হইলে, দেশভক্ত বন্ধু লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রভৃতি তাহাতে যোগদান করিয়া সমস্ত গৃহ-পল্লী মুখরিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সে নিশীথে গানের পর গানে সন্ধ্যা-সমিতি ভাঙ্গিতে প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যায়, তথাপি আসর ভাঙ্গে না। শ্রোতৃবর্গের আনন্দ করতালিতে Sunny Park সজীব হইযা উঠিয়াছিল। সে এক নবযুগ। ইহার পর কত সন্ধ্যা, কত রাত্রি দ্বিজু আসিয়া কত গান ও কত আবৃত্তি করিয়াছেন। "হাসির গানের" হাস্য-ধ্বনিতে সকলে যেন নব জীবন প্রাপ্ত হইত। দ্বিজুর অকস্মাৎ অকাল-মৃত্যুতে দেশের দশজনের পরিবারবর্গের এবং বন্ধুবান্ধবদিগের সমূহ ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। তাহা কোন কালেও আর পূর্ণ হইবার নহে। আশু আশৈশব সাহিত্যানুরাগী। বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া অনেকগুলি অতি সুন্দর সুন্দর চিন্তাশীল প্রবন্ধ "ভারতী"তে লিখিয়াছিলেন। ফরাসী ভাষার প্রতি অনুরক্ত থাকায় তাহা অবকাশ সময়ে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি নানাবিধ নূতন নূতন ফরাসী পুস্তক ক্রয় করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বদিকেই আশুর অসাধারণ পাণ্ডিত্য পূর্ণ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের জীবন্ত নিদর্শন "সঙ্গীত-সঞ্চয়।"

১৩২০ সালে দিনাজপুরে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতিরূপে আশু নির্ব্বাচিত হইলে, হাইকোর্টের অবিশ্রান্ত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও সুচিন্তিত অভিভাষণ লিখিয়া সবাইকে শুনাইয়া মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রবন্ধটী সমাপ্ত করিবার পূর্ব্বে হঠাৎ দ্বিজুর অকাল-মৃত্যুর সমাচারে নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া প্রবন্ধটী আশানুরূপ ভাবে সমাপ্ত করিতে পারেন নাই; শোক সমাচার পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ সেখানে যান। সেই দিন দ্বিজুর গৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সমস্ত দিন অনাহারে গত হয় এবং বৈকালে তাঁহার facial paralysis-এর মত হইয়া শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে এবং ভ্রাতা সুহৃদকে ডাকিয়া আনিয়া দেখাইলে সুহৃদ সেই রাত্রেই "দাদাকে" সঙ্গে করিয়া পুরী রওনা হইয়া যান। সে সময় "Good Friday"-এর ছুটী। সপ্তাহকাল পুরীতে থাকিয়া দিব্য আরোগ্য লাভ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আইসেন। শরীর বেশ সুস্থ

সবল হইলেও মনে মনে একটা দুর্ভাবনা থাকিয়া যায়। কলিকাতা হইতে দিনাজপুর রওনা হইয়া যাইবার সময় শ্রীমান প্রমথ ও আর্য্যকে সঙ্গে লইয়া যান। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে সেই সভার লোকারণ্যের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে প্রবন্ধ পাঠ করিতে বিশেষ রূপে নিষেধ করায় শ্রীমান প্রমথর উপর সেই ভার দেওয়া হইয়াছিল। দিনাজপুরে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বসিলে নায়ক সম্পাদক ৺পাঁচকড়ি বাবু[১৯] স্বকীয় ইচ্ছায় প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া শ্রোতৃবর্গের চিত্তরঞ্জন করিয়াছিলেন। ৺পাঁচকড়ি বাবু আশুকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানে বড় ভক্তি করিতেন। দিনাজপুরের অভিভাষণ ধারাবাহিক অভিভাষণের মত নহে; সেটা একটী নূতন হৃদয়গ্রাহী মাতৃভাষার উন্নতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধার নিবেদন। ঐ অভিভাষণ সেই মাসের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল[২০] এবং সকলেই বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। নিতান্ত বাধ্য না হইলে আশু কখন ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিতে চাহিতেন না। যেখানে অধিকাংশ শ্রোতাই বঙ্গভাষা সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত নহেন সেখানেই ইংরাজী বলিতে হইত। বঙ্গমাতার একনিষ্ঠ কৃতী সন্তান বাঙ্গালা ইংরাজী মিশাইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন না এবং সেই খিচুড়ী ভাষা অনুমোদনও করিতেন না। হারমোনিয়াম বাজাইয়া দেশী-গান করার প্রতি তাঁহার কোন অনুরাগ ছিল না। তিনি বহু দিন যাবৎ অতি সুযোগ্যতার সহিত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বিলাত-প্রবাসকালে বিলাত-প্রবাসী ছাত্রবৃন্দকে লইয়া সেখানেও একটী সভা "মজলিস্" স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য মাতৃভাষার উন্নতি ও ভ্রাতৃভাব রক্ষা।

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশীয় ভাষা
পুরে কি আশা ?

এই কবিতা আশুর অন্তরের পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করে। তিনি ফরাসী ইংরাজী যাহাই নিত্য অধ্যয়ন করুন না কেন, মাতৃভাষার "দৈনিক" পত্রিকা প্রভৃতি নিয়ম মতন পড়িতেন; কোন দিন তাহা আমি ফেলিয়া রাখিতে দেখি নাই।

মাঘ ১৩৩২

৯

আশুতোষ কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র, অতুলনীয় প্রেমময় স্বামী, অতিশয় স্নেহশীল পিতা। তাঁহার ভ্রাতৃ-ভগ্নী-স্নেহও অসীম ছিল। তাঁহার দাস-দাসীও তাঁহার দয়া হইতে কখন

বঞ্চিত হয় নাই। বরং আশুতোষ সাধ্যানুসারে অর্থ দিয়া তাহাদিগকে কন্যাদায় প্রভৃতি হইতে মুক্ত করিয়াছেন। তিনি ধর্ম্মভীরু ছিলেন এবং বহুকাল আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি থাকিয়া উক্ত সমাজের উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণের উপনয়ন, ও একমাত্র কন্যা, লক্ষ্মীস্বরূপা অশোকাদেবীর বিবাহ মহর্ষিদেবের ব্রাহ্ম-পদ্ধতি মতে সম্পন্ন হয়। পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই সব কার্য্যে পৌরোহিত্য করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন। আদি সমাজানুসারে তাঁহার গৃহে নব-বর্ষে রীতিমত উপাসনা ও দান ইত্যাদি হইত। তাঁহার প্রকাশ্য দানের কথা সকলেই পরিজ্ঞাত; কিন্তু গোপন দানের কথা গোপন রাখিবার নিমিত্ত তিনি নীরব ছিলেন। তাহা আর এখন প্রকাশ করা নিষ্প্রয়োজন। কত অনাথ ছাত্র, দুঃখিনী বিধবাগণকে তিনি মাসিক অর্থদান করিতেন, তাহার নিদর্শন অদ্যাপি খাতাপত্রে বিদ্যমান। তাঁহারাও অনেকবার আসিযা এক্ষণেও অশ্রু-বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন।

১৯২১ খৃঃ অব্দে বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আশু পুনর্ব্বার Barrister-এর কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার আয় বাড়িয়া যায়। বিচারপতি পদ ত্যাগ করিয়া যে Barrister হন, তাহাতে মক্কেলগণের মধ্যে আরো কার্য্য পাইবার সুবিধা ঘটিযাছিল। এই সময়ের ভিতর তিনি আবাব দুইবার বিলাতে যান। অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর ক্রমে যে দুর্ব্বল হইতেছিল তাহা তেমন লক্ষ্য করিতেন না; পতিব্রতা পত্নীব সেবা-যত্নে কাজকর্ম্ম নিয়ম মতন করিতেন।

একে হাইকোর্টের কাজ, তাহার উপর দেশের কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াও আশু অপরিমিত পরিশ্রম করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। আশু Special Congress-এ সহানুভূতি দেখাইয়া মহাত্মা গান্ধী, লালা লাজপত রায় প্রভৃতিকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রীতিভোজে পরিতুষ্ট ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সুখ-নিকেতনে হিন্দু, মুসলমান, ইংরাজ সপরিবারে কতবার অতিথি হইয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। সার শঙ্কর নায়ার, ৺সার গণেশ চন্দবরকার, Mr. নবীউল্লা এবং Mr. রাফিক মহোদয়গণ তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহাদের নিকট স্বদেশী-বিদেশী সমান আদর পাইয়াছেন। তাঁহার গৃহে জাতি-ভেদ কিম্বা দলাদলি স্থান পাইত না। দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং স্কুল ও কালেজের ছাত্রগণের হিত-চেষ্টায় আশু সতত যত্নবান ছিলেন; অর্থে-সামর্থ্যে যাহা পারিতেন, তাহাতে কখন অবহেলা করেন নাই।

নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও আশুতোষ ঢাকা শিক্ষক-সভার নিমন্ত্রণে সস্ত্রীক সেখানে গিয়াছিলেন এবং সেখানকার অধ্যক্ষের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া উভয়ে সেইখানেই থাকেন। ঢাকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পরে প্রতিভাদেবীর শরীর অসুস্থ হয়। তবে তাহা এমন কিছু ছিল না যে জীবনের আশঙ্কা থাকিতে পারে।

বেলা ৪টা পর্য্যন্ত নিয়মিত কাজকর্ম্ম করিয়া ও দৈনিক পত্রাদি লিখিয়া প্রতিভাদেবী স্বামীর সহিত বাহিরে যাইবার জন্য নিজের শয়ন-ঘরে প্রস্তুত হইতে চলিয়া যান। সেদিন একটা সভা ছিল। আশুতোষ সেই সভায় যাইবার সময় পত্নীকে বলিয়া যান যে, মোটরে করিয়া তিনি সভার স্থানে যাইয়া তাঁহাকে যেন আনয়ন করেন। তৎকালে তিনি কল্পনাতেও কখন ভাবিতে পারেন নাই যে, সেই মুহূর্ত্তে হঠাৎ কোনরূপ বিপদ তাঁহার ভাগ্যে ঘটিবে। শূন্য গাড়ী যখন তাঁহাকে আনিতে যায়, তিনি তখন প্রতিভার অভাবনীয় পীড়ার কথা ও চিকিৎসকগণকে আনা হইয়াছে শুনিয়া, একেবারে ব্যাকুল-ভাবে গৃহে আসিয়া পত্নীর আকস্মিক সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া শোকাকুল হইয়া পড়েন। চিকিৎসকগণ সাধ্যাতীত ভাবে সবই করেন, কিন্তু মৃত্যুর প্রতিরোধ করিতে পারেন না,—তাহা অনিবার্য্য। ৭ই জানুয়ারী শনিবার (১৯২২ সাল) রজনী প্রভাতের পূর্ব্বে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে অকালে অসময়ে হৃদরোগে পতিব্রতা সাধ্বী অমরধামে চলিয়া যান। মৃত্যুর সময় তাঁহাকে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। আত্মীয়-কুটুম্ব-পরিবৃত সুসজ্জিত আলয়ে, পুত্র, কন্যা, জামাতা, পুত্রবধূ, দৌহিত্রদ্বয় ও একমাত্র পৌত্র এবং চিরারাধ্য স্বামীকে রাখিয়া পুণ্যবতী প্রতিভাদেবী স্বর্গলাভ করেন। আশুতোষ এই শোকে মুহ্যমান হইয়াও সবাইকে সান্ত্বনা দেন। ক্রন্দন-ধ্বনিতে গৃহ হাহাকার করিতে থাকে। শেষকার্য্যে অতি শোভনোচিত ভাবে যাহা করিতে হয় তাহার অধিক শতগুণ আয়োজনে তাহা সম্পন্ন করিয়া অনাহারে অনিদ্রায় শূন্য আবাসে ফিরিয়া অসহনীয় শোকে নির্ব্বাক থাকিয়া যান।

এ দেশে স্বামিপুত্র রাখিয়া কাহারও মৃত্যু ঘটিলে, সবাই তাঁহাকে বড় সৌভাগ্যবতী মনে করেন; বিশেষতঃ হিন্দু গৃহিণী-গণ সেই সতীর সীমন্তের সিন্দূর ও পায়ের আল্‌তা লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন। যখন শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহাকে ঘাটে লইয়া যাওয়া হয়, সেই সময় অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা তাহা আনিতে ঘাটে পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন; এবং অনেকে নিজ গৃহের ছাদ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করেন। কত ভদ্রমহিলা তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া আশুতোষকে পত্র লিখিয়া সান্ত্বনা দেন। "বৈধব্য যে তাঁহার সহ্য করিতে হয় নাই, ইহাই তাঁহার নারী জন্মের যথার্থ সৌভাগ্য।" "তিনি যেদিনে যে তিথিতে লোকান্তরে গিয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে যে-কোন নারীর মৃত্যু ঘটিলে সতীস্বর্গে চির অমরতা লাভ করেন", এই একজন সুপণ্ডিত জ্যোতিষীর গণনা, এবং তিনি মান্দ্রাজ হইতে পত্র দ্বারা আশুকে তাহা জানাইয়াছিলেন।

প্রতিভা নিষ্ঠাবতী ব্রাহ্মিকা ছিলেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই দৈনিক উপাসনা, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও গীতা পাঠ ইত্যাদি করিতেন। তাহার পর নিয়মিত গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। আদি সমাজের মতে তাঁহার শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া অতি সমারোহে সম্পন্ন করিয়া, আশুতোষ নিজ হস্তে কাঙ্গালী বিদায় করেন। সেই শোকের

দিনের পূর্ব্বাপর উল্লেখ অপ্রয়োজন,—সে সকল সর্ব্বজনবিদিত। সেই হইতে অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে আশুর শরীর দুর্ব্বল হইয়া ভিতরে ভিতরে খারাপ হইতেছিল; তাহাতে তিনি মনোযোগ করিতেন না। শারদীয় পূজার বন্ধে সেই বৎসরই তিনি দেবকুমারকে সঙ্গে করিয়া বিলাতে St John কালেজে রাখিতে ও মাতৃ-শোকাকুল শ্রীমান শিবকুমারকে দেখিতে গিয়াছিলেন। দুই ভাই একত্র কেমব্রিজে থাকিলে সব দিকেই ভাল হইবে, আশা করিয়াছিলেন; কিন্তু কালেজে স্থানাভাব বশতঃ দেবকুমারকে ছয় মাস কাল অমনি বসিয়া থাকিতে হইবে জানিয়া, তাহাকে জার্ম্মাণীতে লইয়া যান ও সেখানেই ভর্ত্তি করিয়া দেন। নিজের শরীর তখন অসুস্থ থাকায় বড় বড় জার্ম্মাণ চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। সেখানে সবাই তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে উপদেশ দেন। কোন প্রকার গুরুতর পীড়া শরীরে নাই যাহাতে চিন্তার কারণ আছে, এইরূপ সকলে বলিয়াছিলেন। Diabetes-এর জন্য শারীরিক দুর্ব্বলতা; কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া স্বাস্থ্যকর স্থানে বসিয়া থাকিলে Diabetes-এর নিমিত্ত কোন ক্ষতি হইবে না। জার্ম্মানীতে গুণী জ্ঞানী অধ্যাপক ও বহুবিধ পণ্ডিতগণের সহিত পরিচিত হইয়া ও সম্মানিত হইয়া, সেখানকার কলকারখানা ও নানারূপ কালেজ-স্কুলের নূতন শিক্ষা-প্রণালী স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আশু পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের পরে দেশের অবস্থানুসারে দেশবাসীর অসীম দারিদ্র্য দৃঢ়তার সহিত সহ্য করিয়া চলিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। সাধারণ লোকে যাহা আহার করিতেন, ভদ্রলোক, ধনী পণ্ডিতমণ্ডলী এবং তাঁহাদিগের স্ত্রীকন্যাগণও সেই খাদ্য উপাদেয় বোধে আনন্দের সহিত আহার করিয়া অপরিমিত যত্ন চেষ্টায় দেশের উন্নতি কল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আশু এই নিঃস্বার্থ দেশ-ভক্তি অনুকরণীয় মনে করিতেন। তিনি কত আশা কত কল্পনা করিয়াছিলেন—দেশে ফিরিয়া নবপদ্ধতি অনুসারে আস্তে আস্তে স্কুল-কালেজের শিক্ষার উন্নতি করিবার সমূহ চেষ্টা করিবেন। তাঁহার সে সব মানস কল্পনাতেই রহিয়া গেল। কার্য্যে পরিণত করিবার অবসর আর হইল না।

সেই সুদূর দেশে নানাবিধ দর্শনীয় ও শিক্ষনীয় দৃশ্যের মধ্যে থাকিয়াও স্বদেশের জন্য তাঁহার মন ব্যগ্র হইয়া উঠিত; তিনি সপ্তাহে সপ্তাহে আমাকে পত্রে লিখিতেন যে, "এক্ষণে নিরাপদে দেশে পৌঁছিলেই বাঁচিয়া যাই। এ নির্ব্বান্ধব পুরীতে আর বেশি দিন থাকিতে পারি না; গৃহের জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হয়। মাতৃহীন দেবুকে একা ছাড়িয়া যাওয়া অতীব কষ্টকর। ঈশ্বর তাহাকে রক্ষা করিবেন; তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর করিয়াই দেবকুমারকে রাখিয়া যাইব। অবস্থা নিরুপায়।" দেবুকে যে অধ্যাপকের নিকট রাখিয়াছিলেন, শুনিয়াছিলাম—তাঁহারা অতিশয় উদার-প্রকৃতির ব্যক্তি। খুব যত্ন-আদরে তাঁহাকে দেখিতেন।

অনেকটা স্বাস্থ্যলাভ করিয়া হাইকোর্ট খুলিবার কয়েক দিন পূর্ব্বে আশু বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার পত্নী-বিয়োগ-শোক-কাতর হৃদয়ে কোন সান্ত্বনা ছিল না। তাহার উপর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রকে একা সুদূর প্রবাসে রাখিয়া আসায় ভাবনার এক শেষ হয়। তথাপি নিজালয়ে আসিয়া আত্মীয়গণের ভিতর থাকায় কতক শান্তি অনুভব করিতেন। কোর্টে যাওয়া বা আইন সভাসমিতিতে যোগদান, কাউন্সিলে যাওয়া প্রভৃতি নানা প্রকার কার্য্যে দিন কাটিয়া যাইত। কাহারো শোক দুঃখের নিমিত্ত সময় বসিয়া থাকে না—তাহার নিয়মে সে চলিতে থাকে। তোমার আমার নীরব রোদনে তাহার চলা-ফেরার কোন ব্যতিক্রমও হয না। জলপ্লাবনে পাবনার চতুর্দ্দিকে সেবার যখন ভাসিয়া হাহাকার উঠিয়াছিল, সেই সময়ে আশুতোষ হরিপুরে আত্মীয়-স্বজনকে দেখিতে যান। তাঁহার আগমনে পল্লীভবন আনন্দ-উৎসবে মুখরিত হইয়া উঠে; কত আত্মীয় কত প্রজা ও পুরাতন দাস দাসী তাঁহাকে দেখিবার জন্য হরিপুর-ভবনে আসিয়া স্নেহ, আশীর্ব্বাদ দানে পরিতুষ্ট করিয়া মমতার নিদর্শন স্বরূপ ছোটখাট উপহারও দিয়া সম্মানিত করেন। অজাতশত্রু আশুতোষের আপন-পর ছিল না—"বসুধৈব কুটুম্বকম্" থাকায়, শ্রদ্ধায যিনি যাহা দিয়াছিলেন, তাহাই তিনি শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলেন। "স্বদেশী গামছা ধুতি শাড়ী চিড়া গুড" সাদরে গৃহে আনিয়া আমাদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রজাদিগের যাহাতে উন্নতি করিতে পারেন, সে নিমিত্ত যত্নবান হইবেন—আশু এরূপ ভরসাও দিয়া আইসেন। পল্লীগ্রামসমূহ প্রায়ই বর্ষার সময় বাসের অযোগ্য হইয়া থাকে, সেটা স্বচক্ষে দেখিয়া আশু অন্তরে বড় বেদনা ও দুঃখ পাইয়াছিলেন।

আশুর শরীরের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল। যাঁহার সেবায় রোগে শান্তিময় আরাম পাইতেন, তিনি ত আর ছিলেন না। একা জীবনের সে অভাব কিছুতেই পূর্ণ হইবার নহে। আশাহীন নিরানন্দভাবে সব চলিতে লাগিল। অবসর গ্রহণ ভাগ্যে ঘটিল না। সেই সময় জ্যেষ্ঠপুত্রকে লইয়া তিনধারিয়া পাহাড়ের মনোরম গৃহে কিছুদিনের জন্য যাইয়া সুস্থ বোধ করিয়াও ছিলেন। পুত্রসহ প্রত্যহ দিব্য বেড়াইতেন, পাহাড়ের নির্জ্জনতায় ও প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মনও অনেক ভাল ছিল। তাহার পর হঠাৎ একদিন "Facial Paralysis"-এর লক্ষণ দেখিয়া আর্য্য পিতার অজ্ঞাতে (ডাক্তার চৌধুরী) সুহৃদকে তার করিয়া লইয়া যায়। তাঁহার সহিত কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহারই সুচিকিৎসায় আবার সুস্থ হইয়া উঠিয়াছিলেন। শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল হইলে চিকিৎসকগণের মত লইয়া কোর্টে যাওয়া-আসা করিতেন। শূন্য-দ্বিপ্রহরে একাকী বাড়ী থাকিতে মনে অতিশয় ব্যথা অনুভব করিতেন। আদালত বন্ধু-বান্ধবে পরিপূর্ণ— তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় ভাল থাকিতেন।

১০

শারীরিক দুর্ব্বলতা, মানসিক অশান্তি ও শোকের শূন্যতায় আশুতোষকে বড় নিরানন্দ করিয়াছিল। কার্য্য ত্যাগ করিয়া বসিয়া থাকা যে কিরূপ কষ্টকর তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারে না। সাধ্যমত চেষ্টায় কতক কাজ করিতেন, এবং মোকর্দ্দমায় মত কখন কখন গৃহে রহিয়াও দিতেন। আগষ্ট মাসে শিবকুমার বাড়ী ফিরিয়া আইসে ও তাহাকে দেখিয়া আশু অনেকটা সান্ত্বনা পান। ৭ই আগষ্ট রাত্রে হঠাৎ শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। রজনী প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই সমাচার ভ্রাতা ভগিনীর নিকট যায় ও সকলে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে দেখিতে যাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়েন।

মহানগরীর সুদক্ষ চিকিৎসকগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে চিকিৎসা করেন। প্রকাশ্যে আশা-ভরসা খুবই দেন; তবে ভিতরে ভিতরে বুঝিয়াছিলেন যে, এ কঠিন রোগের হস্ত হইতে আর নিষ্কৃতি নাই। সেই সব মহোদয়ের কাছে আমরা চির-কৃতজ্ঞ। সে উপকারের প্রতিদান সাধ্যাতীত।

অত অসুস্থতার মধ্যেও জাপানের ভূমিকম্পের সাহায্যার্থ নিজ গৃহে একটা সভা আহ্বান করিয়া আশু কতক অর্থ দান করিতে চেষ্টা করেন। সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; কিন্তু আশুকে চৌকী করিয়া সভাস্থানে লইয়া যাইতে চিকিৎসকগণ মত দেন নাই। তিনি শয্যাগত থাকিয়াও জাপানের দুর্ঘটনার কথা বিস্মৃত হন নাই। তখনকার অবস্থায় যাহা সাধ্য তাহা করিয়াছেন। স্বাস্থ্যলাভের জন্য আশু শারদীয়া পূজান্তে ডিব্রুগড়ে বেড়াইতে যান। সঙ্গে পাচক ইত্যাদি সবই ছিল; তথাপি জাহাজ-কোম্পানীর বড় সাহেব তাঁহার নিমিত্ত দৈনিক ব্যবস্থা সুচারুরূপে করিয়া দেন। এ জাহাজ কোম্পানীর মোকদ্দমায় আশুতোষ Barrister থাকিয়া কোম্পানীকে নিরাপদ করিয়াছিলেন। তাহারই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ, তাঁহার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, তাঁহারা সতত সর্ব্বপ্রকার সুবিধার জন্য যত্নবান ছিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে প্রত্যহ দেখিবার জন্য জাহাজে উপস্থিত ছিলেন। এ জলবায়ু পরিবর্ত্তনে কোনই উপকার না হওয়াতে, আশু রেল-পথে গৃহে ফিরিয়া আইসেন। এই পরিবর্ত্তনে প্রত্যক্ষ কোন উপকার বুঝিতে না পারিয়া সকলেই নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়েন। অমন অসুস্থ অবস্থার ভিতর আশুতোষ কত শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান ও চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রতি সভা-সমিতির নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইতে প্রয়াস পাইতেন; কিন্তু পরিবারবর্গ প্রতিবন্ধক হইয়া কোন খানে যাইতে দিতেন না। তাহাতে তিনি বড় মনঃক্ষুণ্ণ হইতেন।

অতি দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি বোধ করিতেন বলিয়া চিকিৎসকগণ বাহিরের বন্ধুবান্ধবদের

সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা কহিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি কিন্তু তাহা মানিতেন না। তাঁহার গৃহ সকলের পক্ষেই সর্ব্ব সময়েই অবারিতদ্বার। যখন যিনি আসিতেন, তখনি তাঁহাকে সাদরে শয়নকক্ষে আহ্বান করিয়া আশু কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিতেন। কত গরিব দুঃখী, অনুগত লোক-জন সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখিতে আসিত; তিনি কখনও কাহাকেও বাধা দিতেন না।

তাঁহার জার্ম্মানী-প্রবাসকালে তাঁহারই একজন মোটর-চালক ভদ্র-সন্তান অনেক মূল্যবান কার্পেট ও অন্যান্য সৌখীন দ্রব্য অপহরণ করিয়া রাজসাহীতে পলায়ন করে। কতকদিন পরে পুলিস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া তাঁহার নিকট আনীত হইলে, সে করযোড়ে প্রার্থনা ও রোদন করিতে থাকে; এবং তাহার মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, আসিয়া পা ধরিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করে। তিনি তাহাতে ব্যথিত হইয়া ক্ষমা করিতে চাহেন; কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ দাঁড়াইয়াছিল।

ভ্রাতা মন্মথনাথ স্বয়ং আসিয়া দাদাকে সমুদ্র-তীরে ওয়ালটেয়ারে লইয়া যান ও নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। তাহার উপর দুইজন ভগিনী এবং একজন সেবক অনবরত তাঁহার নিকট থাকিয়া দেখা-শুনা করিতেন। সিন্ধুসৈকতে বাস ও ভ্রাতার যত্নে আশু শরীর অনেক সুস্থ বোধও করেন। ভগিনীগণ অতি সুনিপুণ সেবিকা। তাঁহাদের সেবায় মনও প্রফুল্ল থাকিত। বিলাত যাইয়া চিকিৎসা করাইবার কল্পনা ছিল ও তাহাদের কথায় টিকিট যাহাতে শীঘ্র পাওয়া যায় তাহার চেষ্টা হয়। পরে গৃহে ফিরিলে, এখনকার প্রধান প্রধান ডাক্তারগণ তাহা অনুমোদন করেন নাই। সেই সময় হঠাৎ মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণের 'তার' পাইয়া আশু একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়েন। ১৫ই মার্চ্চ শনিবার প্রভাতে কোনরূপ রোগ ভোগ না করিয়া ৮২ বৎসর বয়সে সকলকে রাখিয়া পুণ্যময়ী জননী মগ্নময়ী দেবী পুণ্যলোকে চলিয়া যান। নবমবর্ষীয়া বালিকা বিবাহিতা হইয়া স্বামী-গৃহে আসিয়াছিলেন; আর ৮২ বৎসর বয়সে বিনা রোগ শোকে চাঁদের হাট বজায় রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি নারী-জীবনের অক্ষয় কীর্ত্তি স্বরূপ সাত পুত্র ও দুই কন্যা, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী এবং স্বজনগণ পরিবেষ্টিত হইয়া দেহরক্ষা করেন। তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনা যেমন অপূর্ব্ব, এ লোকান্তরও তেমনি অলৌকিক। যদিও মাতৃ-বিয়োগের গভীর শোকে তাঁহার পুত্র কন্যা স্বজনবর্গের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে; তথাপি তিনি যে কোন শোক পান নাই ও পূর্ণ সৌভাগ্য ভোগ করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছেন—ইহা সর্ব্বজনের অন্তরের সান্ত্বনা। তাঁহার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বড় শ্রীমানের অনুমতি লইয়া শ্রীমান যোগেশ ও অন্য ভ্রাতাগণ সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। মাতৃ-শোকে আশুর মন বড় উদাস হইয়া যায় এবং ওয়ালটেয়ার হইতে পুরীর বাড়ীতে ফিরিয়া আইসেন। তাঁহার পুরীর গৃহ অতিশয় সুবিধাজনক ও মনোহর স্থানে অবস্থিত। তাহার বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া মহাসিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গ দেখিতে দেখিতে জীবন পরিতৃপ্ত হইয়া যায়।

শয্যায় শয়ন করিয়া নিশীথে আধ-নিদ্রায় তাহার গর্জ্জন শুনিতে পাইয়া সবই স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয় ও সাগর-বায়ু সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া দেয়। সেখান হইতে শ্রীমন্দির অনতিদূরে। পাণ্ডাগণ যখন-তখন আশীর্ব্বাদী ফুল-চরণামৃত ও বলরামের উপাদেয় প্রসাদ দিয়া মনুষ্য-জন্ম সার্থক করিয়া থাকে। জগবন্ধুর রাজ্যে জাতিভেদ নাই। প্রত্যহ বৈকালে অন্নক্ষেত্র দর্শনীয় বস্তু। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল একত্র বসিয়া মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন। সে এক আনন্দধাম। গৃহহীনের গৃহ, নিরন্নের অন্ন-পান মহাপ্রভুর নিত্য দান। তাঁহার মন্দির-দ্বার অবারিত।

পুরী যাইয়াই কয়েক দিনের মধ্যে আশুর শরীর আরো অসুস্থ বোধ হওয়াতে, আশু সুহৃদের সহিত কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তখন সুহৃদ এবং জ্যেষ্ঠপুত্র আর্য্যকুমার সেখানেই ছিলেন। গৃহে ফিরিয়াই সামান্য জ্বরে শয্যাগত হইয়া আশু দিন দিন অতিশয় দুর্ব্বল হন। নানারূপ চিকিৎসা ও সেবায় শরীর আর সুস্থ হইল না; সেই দারুণ জ্বরের হস্ত হইতে কোন ক্রমেই রক্ষা পাইবার উপায় হইল না। সব ব্যর্থ হইয়া গেল; জ্বর অল্প, দুর্ব্বলতা অসীম। তবুও সকলের মনে কত আশা,—পুনর্ব্বার অনেকটা আরোগ্য লাভ করিবেন, কতক সুস্থ হইয়া চিকিৎসার্থে ইয়োরোপ যাইবেন এবং সেখান হইতে সারিয়া আসিবেন। আশা, ইচ্ছা আমরা করি, ভগবান তাহা নিষ্পত্তি করিয়া দেন। যাহা কল্পনাতীত তাহাই ঘটিয়া থাকে। সাধ্বী পত্নী প্রতিভার বিয়োগ-শোক তাঁহার জীবনকে একেবারে অভিভূত করিয়াছিল; তাহার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। সেই প্রথম ও সেই শেষ শোক। পত্নী-স্মৃতি এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার হৃদয়কে আর কিছুতেই সুখ-শান্তি দেয় নাই।

প্রতিভা তাঁহার গৃহিণী, সখীমিথ, প্রিয় শির্ষ্যা, ললিত-কলাবিধৌ ছিলেন। নারীর বৈধব্য সামাজিক নিযমে অনেক কঠোর, কিন্তু এমন পত্নী-প্রেম এবং অপরিসীম একাগ্রতা সচরাচর সংসারে দুর্লভ।

আশুতোষের জীবনী নূতন করিয়া আর কাহাকেও বলিতে হইবে না। তিনি সর্ব্বজন-পরিচিত। কি ছিলেন আর কি ছিলেন না তাহা পুনর্ব্বার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ছয় ভ্রাতা ও দুই ভগ্নী, চারি পুত্র ও একমাত্র কন্যা, দুই দৌহিত্র ও এক পৌত্র অসিতানন্দ এবং পৌত্রী ঋতাবরী (নামটি বেদ হইতে রাখিয়াছিলেন)। পরিবারের অনেকেরই নাম তাঁহার দত্ত।

ঋতাবরী তাঁহার অত্যন্ত স্নেহপাত্রী ও আদরণীয়া থাকায় আদালতের কাজের মধ্যেও তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া "রায়" লিখিতেন। নিরুপমা সুন্দরী বালিকা "সুগোল নিটোল" ছিল; তাই আদর করিয়া ডাক নাম "টুবলী" রাখিয়া সেই নামেই তাহাকে ডাকিতেন। "টুবলী" পিতামহকে অত্যন্ত ভালবাসিত। তাহার অকাল-মৃত্যু-জনিত শোক তাঁহাকে একেবারে কাতর করে; রোগ-শয্যায় তাহার কথা বলিতে বলিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন। টুবলীকে শেষ পর্য্যন্ত বিস্মৃত হন নাই।

পারিবারিক জীবনের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে তিনি প্রধান ও অগ্রগণ্য ছিলেন। কোন কোন ভ্রাতুষ্পুত্রকে উপনয়নে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়া উপবীত দেন। কোন ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আদি সমাজের মতে বিবাহে সম্প্রদান করেন।

ইদানিং অনেক ব্রাহ্ম-পরিবার কন্যার বিবাহ কালীন তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া বেদীতে বসাইয়া পৌরোহিত্য করাইতেন। তিনি অতি সৌষ্ঠবের সহিত তাহা সুসম্পন্ন করিয়া আনন্দানুভব করিতেন। আশুতোষের দৈনিক জীবনের কার্য্যাবলী সম্যকরূপে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে প্রকার নির্ম্মল ও নিষ্কলঙ্ক জীবন অতুলনীয়। যে বংশে এমন কৃতী সুসন্তানের জন্ম হয়, তাহার কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা।

সার আশুতোষের দানের কথা অনেক কাগজপত্রে তৎকালে বাহির হইয়াছে, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। কেবল তাঁহার অতি-যত্ন-রক্ষিত অমূল্য "লাইব্রেরী" কাশীর "হিন্দু ইউনিভারসিটিতে" পিতৃদেবের নামে দান সর্ব্বপ্রধান। যখন সেই সব গ্রন্থাবলী লরী করিয়া কাশী কলেজের জন্য রওনা হইয়া যায়, তখন তাহা দেখিবার নিমিত্ত বালিগঞ্জের রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছিল ; এবং দর্শকগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অভাব স্মরণ করিয়া অশ্রুপাত করেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার নাকি বলিয়াছেন যে "এবার কাশী যাইলে বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া পরে চৌধুরী মহাশয়ের কীর্ত্তি এই দানের গ্রন্থাবলী দেখিয়া আসিব।"

বিশ্বজয়ী প্রেমে তুমি আশুতোষ শিব,
"তোমার তুলনা তুমি" কি আর বলিব ?
মুক্ত-হস্ত সুমহান্
পরহিতে আত্মদান
আশৈশব, ভেদাভেদ নাহি ছিল মনে ;
সমভাবে পালিয়াছ দীন দুঃখী জনে।
তোমার প্রাসাদ-দ্বার
মুক্ত ছিল অনিবার,
আত্মদানে তুষিয়াছ অনাথ আতুরে ;
কত আয়োজন নিত্য ছিল তব পুরে,
শোকে শান্তি, রোগে সেবা
তোমার মতন কেবা
করিয়াছে,—পতি-পত্নী একত্র মিলিয়া
সাধিয়াছ সঙ্গোপনে কিছু না বলিয়া ;
ফিরায়ে দেওনি কারে,
সদাব্রত তব দ্বারে,

অকাতরে অনাথের প্রার্থনা পূরণ
করিয়াছ,—তোমা সম নাহি কোনজন।
অগাধ পাণ্ডিত্য খনি, বুদ্ধি ক্ষুরধার,
কর্ম্মক্ষেত্রে অদ্বিতীয় সর্ব্বমূলাধার,
অকৃত্রিম দেশ-প্রীতি
ঢালিয়া দিয়াছ নিতি
সমভাবে, শ্রম অর্থ অসাধ্য সাধনে
দেশের কল্যাণ লাগি, চেষ্টা কায়-মনে।
সদালাপী মিষ্টভাষী
তাপিতের তাপ নাশি
সান্ত্বনায় ব্যথিতের ব্যথা দূর করি,
ভাই ভগিনীকে স্নেহ আপনা পাসরি,
ভালবাসা পরিজনে,
স্বজন বান্ধবগণে,
পিতৃমাতৃ-পদে ভক্তি অসীম অপার,
সন্তান-বৎসল পিতা, পত্নী-প্রেম সার।
আদর্শ চরিত্র তব
একে একে কত কব ?
এত গুণ একাধারে দেখিতে না পাই,
সার্থক জনম মর্ত্ত্যে তুলনা ত নাই।
চিরদিন তব নাম
ঘোষিবে এ ধরাধাম,
অনন্ত যশের কীর্ত্তি, অমর অক্ষয়,
নিষ্কলঙ্ক জীবনের সব দীপ্তিময়,
এই পরিচিত ধরা
তোমার স্মৃতিতে ভরা,
প্রাণের অধিক ভাই, আজন্মের সাথী
সহসা একেলা কোথা গেলে রাতারাতি।
পথ ঘাট অশ্রু জলে
দেখিতে পাই না বলে,
আজিও রয়েছি বসে বৈতরণী-তীরে,
ডাকিয়া পাই না দেখা খেয়া-পাটনীরে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩

সেকাল ও একাল

প্রসন্নময়ী দেবী

আমাকে যে আজিকার এই স্মৃতি-সভায় সভানেত্রী করা হইয়াছে ইহাতে আমি গৌরব অনুভব করিতেছি, কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনে বিষাদের ছায়াও পড়িতেছে, কেননা যাঁহার উদ্দেশে এই স্মৃতি-সভা তিনি আমার পৌত্রী কিম্বা দৌহিত্রীর বয়স্কা ছিলেন। কালের গতি অনিবার্য্য— তাই আজ আমার এই বার্দ্ধক্যাবস্থায় আমি সেই কচি বয়সের মেয়ের মৃত্যুদিবস স্মরণ করিতে আসিয়াছি।

সরোজনলিনী[২১] শৈশব হইতেই আমাদের বিশেষ স্নেহ-পাত্রী ছিলেন। তাঁহার পিতার সহিত আমাদের পরিবারের বহুকালের পরিচয়। শৈশব হইতে কৈশোর ও যুবতী অবস্থায়, সরোজনলিনীর শিক্ষাদীক্ষা ও তাঁহার ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ আমি ঔৎসুক্যের সহিত লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। কিরূপ ভাবে আমাদের এই দুর্ভাগা দেশেরও একটি মেয়ে নিজেকে ও পারিপার্শ্বিক আরও দশজনকে উপযুক্ত কন্যা, স্ত্রী ও মা হইতে শিক্ষা দিতে পারে, সরোজনলিনীর স্বল্পস্থায়ী জীবন তাহার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। সীতা সাবিত্রী যে শুধু মাত্র পৌরাণিক উপাখ্যানই নয় তাহা সরোজনলিনী তাঁহার জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মত মেয়েরাই এখনও পুরাকালের প্রাতঃস্মরণীয়া সতীনারীর আদর্শ বজায় রাখিতে সাহায্য করেন।

আমি প্রাচীনা, তাই আমার মনে স্বতঃই প্রাচীন আদর্শগুলির উদয় হয়। প্রাচীন আদর্শানুবর্ত্তিতার আর এক নাম আজকাল গোঁড়ামি ও অন্ধ কুসংস্কার—কিন্তু এই ধারণা একেবারে অমূলক। যাঁহারা প্রাচীনপন্থী বলিয়া জাঁক করিয়া এই সব কুসংস্কার আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকেন, তাঁহারাও যেমন ভ্রান্ত, তেমনি যাঁহারা হাল-ফ্যাসানের কেতাদোরস্ত হইয়া আমাদের সত্যকার আদর্শগুলির প্রতি পিঠ ফিরাইয়াছেন তাঁহারাও ভ্রান্ত। বয়স হিসাবে আমি সিপাহী বিদ্রোহের যুগ হইতে আজিকার আধুনিকতম যুগ পর্য্যন্ত নারীপ্রগতির খবর দিতে পারি। মোটের উপর আমার মনে হয় যে আজকাল নারীদের মধ্যে সংঘবদ্ধভাবে নারীজাতির উন্নতির চেষ্টা প্রসারলাভ করিয়াছে। ইহার প্রথম কারণ শিক্ষার সুযোগ ও সুগমতা—আমাদের শৈশবে যাহা একেবারে ছিল না বলিলেই হয়। তবু যে একেবারে ছিল না তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

আমাদের গ্রামের কথা বলিতে পারি। বাল্যকালে দেখিয়াছি আমাদের পিসী, খুড়ী, জ্যেঠি রামায়ণ মহাভারত ত পড়িতে পারিতেনই উপরন্তু বিষয়কার্য্যাদি সংক্রান্ত হিসাব-পত্রও তাঁহারা রাখিতেন। আমাদিগের রাজসাহী অঞ্চলে বড় বড় জমিদারী মেয়েরাই চালাইয়া আসিয়াছেন। রাণী ভবানীর নাম ভারতবিশ্রুত[২২]—তিনিও আমাদেরই রাজসাহী অঞ্চলের নারী। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের সূক্ষ্ম বিষয়বুদ্ধি তাঁহার জননীর নিকট হইতে লব্ধ। এখনও আমাদের দেশে বড় বড় বাড়ীর গৃহিণীরাই সমস্ত কাজে কর্ত্তাদের উপযুক্ত সহায়তা করিয়া থাকেন।

বাল্যকালে আমরা—অর্থাৎ যাহারা বয়সে ছোট তাহারা—বালকের বেশ পরিয়া কাছারী-বাড়ীতে পড়িতে যাইতাম। ছুতার মিস্ত্রী কাষ্ঠফলকে বারো স্বর ও ছত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণ খোদিত করিয়া দিত; তাহার সাহায্যে আমাদের অক্ষরপরিচয় হইয়াছিল। পাঠশালায় আমরা বালিকারা যাইতাম না। গ্রাম্য কালীবাড়ীর পাঠশালায় গৃহের বালকগণ পড়িতে যাইত। আমরা প্রাতে একবার তালপত্রে লেখা শিখিতাম ও দাতাকর্ণ ইত্যাদি জাতীয় উপাখ্যান পড়িতাম। তাহার পর সমস্ত সময় গৃহকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হইত। সর্ব্বাগ্রে শিব গড়ান ও দেবার্চ্চনার আয়োজন সব নির্ভুলভাবে শিখাইতেন। ক্রমে রন্ধন ও পরিবেশন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকার্য্যও শিক্ষা হইত। পাথরে ছাঁচকাটা, শিকা তৈয়ারী, কাঁথা সেলাই, নারিকেলের চিড়ে, জিরে, পদ্মচিনি, ধানের মালা, কঙ্কণ, নানাপ্রকার আলপনা ও শুভকার্য্যে পিঁড়িচিত্র এবং পঞ্চরঙ্গের গালিচা, দুলিচা, প্রভৃতি বিবিধ কার্য্যকরী ও সৌখীন শিল্প শিক্ষা দিতে পরিপক্ক গৃহিণীরাই গুরুগিরি করিতেন। কাশীশ্বরী দিদি বলিয়া একজন রক্তবস্ত্রা বিধবা ছিলেন, তিনি আমাদের অপেক্ষা একটু বেশী বয়সের মেয়েদের লইয়া রামায়ণ মহাভারত, সাবিত্রী দময়ন্তী প্রভৃতির উপাখ্যান শিখাইতেন। এইরূপে সেকালে মেয়েদের শিক্ষা হইত।

তখনকার দিনের তুলনায় এখনকার শিক্ষার ধরণ অনেকটা ব্যাপক এবং মেয়েদিগকে বহির্জগতের সহিত মেলামেশার সুযোগ দিয়াছে। ইহাতে তাহাদিগকে স্বাবলম্বী হইতে যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি এ বিষয়ে বাঙ্গালা দেশে নূতন জীবনের সঞ্চার করিয়াছে। নারীপ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে বর্ত্তমান যুগে জাতীয়-জাগরণের মূল ভিত্তি নারীজাগরণ। কবি গাহিয়াছিলেন "না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না"— একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আজ যে দেশের চারিদিকে একটা নবীন আশার আলোক দেখা যাইতেছে, তাহার বর্ত্তিকা ভারতীয় নারীরাই অগ্রসর হইয়া ধারণ করিয়া চলিয়াছেন। এই সকল বিষয়ে একটা কথা অনেকের মুখেই শোনা যায় যে নারীজাতির এই বহির্গামী ভাব সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে। একটু তলাইয়া দেখিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে এই সম্প্রসারণ নারীজাতির বিশেষ

কেন্দ্রে কোনরূপ ক্ষীণতার সৃষ্টি করে না। পূর্ব্বাপেক্ষা যে পরিবর্ত্তন নারীজগতে দৃষ্টিগোচর হয় তাহা এই যে, নারী আজ আর গৃহের কোণে অন্ধকারে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়াই পড়িয়া নাই—সংসারে তাহার যে অন্যান্য মহৎ কর্ত্তব্য আছে সেগুলি সম্পাদন করিতে বাহির হইয়া পডিয়াছে। ইহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, বরঞ্চ আনন্দ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। একথা মনে করা ভুল যে বর্ত্তমান নারী-আন্দোলন আমাদের ভারতীয় নারীসমাজকে মেমসাহেবী সমাজ করিয়া তুলিবে, কেননা প্রত্যেক বিভিন্ন জাতীয় নারী তাহাদের আপন আপন বৈশিষ্ট্য ফুটাইযা তুলিবে। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি বাঙ্গালার প্রতি পল্লীতে পল্লীতে আজ যে অনুষ্ঠানের সূত্রপাত কবিয়াছে, তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিয়া দেশের ও দশের হিতসাধন করুক ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা এবং সেই কার্য্যেই যাঁহার স্মৃতিসভায় আজ আমরা সমবেত হইযাছি তাঁহার প্রকৃত স্মৃতি রক্ষিত হইবে।*

সবোজনলিনী নাবীমঙ্গল সমিতিব ব'র্ষিক মহিলাসম্মিলনে পঠিত।

বঙ্গলক্ষ্মী, চৈত্র ১৩৩৭

সেকেলে কথা
স্বর্ণকুমারী দেবী

শ্রীযুক্ত মণিলাল গাঙ্গুলির সহিত ভাবতীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকার সম্বন্ধটুকু অম্ল-মধুর। ইনি সম্পর্কে আমার নাতিনীজামাই। যখন অন্নব্যঞ্জন মুখে রোচে না তখন অম্লব্যঞ্জনে অরুচি দূর কবে। ইনি আমাকে ধরিয়া পড়িযাছেন— "আপনি সেকালের কথা লিখুন।" নব সম্পাদকের এই মিষ্ট অনুরোধে লিখিবার তিক্ত পরিশ্রমও আজি সহজসেব্য হইযা উঠিয়াছে, লেখনীর ভারও আজ লঘু বোধ করিতেছি।

লিখিতে হইবে আমাকে সেকালের কথা? তাই ত! ইহার মধ্যেই সেকেলে হইযা পড়িলাম! পুনঃপুনঃ আবৃত্তি না করিলে কিন্তু কথাটা ভুলিয়া যাইতে হয়। এই ত সে সেদিন—যেদিন দিদিমা বেচাবীরা আমাদের একেলে-পনার জ্বালায় অস্থির হইয়া উঠিতেন, আর নব্য নারী আমরা তাঁহাদের সেকেলে-পনার গঞ্জনা অকাতরে সহ্য কবিয়া নায়িকা-দর্প অনুভব করিতাম।

গঞ্জনারূপ সে ব্রহ্মাস্ত্র যদিও প্রথমাধিকারসূত্রে আজি আমাদিগেরই হস্তগত তথাপি বিনা প্রয়োগে তাহা পেটিকাবদ্ধ রাখাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছি।

ইভলিউশনের হাওয়া যেরূপ প্রবলভাবে বহিয়াছে—তাহাতে কেবল ইংলণ্ডে সফরিজিষ্টদল[২৩] নহেন, বিশ্বের মেয়ে-মহল স্বাধিকার লাভ বাসনায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙ্গালীর মেযেও যে আর অবলা নহেন, আধুনিক বঙ্গসাহিত্য তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। এক্ষেত্রে আমার হাতের অস্ত্র কাড়িয়া সহজেই যে তিনি আমাকে নিরস্ত করিবেন এ ভয়টুকু বিলক্ষণ আছে। বেশ জানি তাঁহাকে দোষী করিলেই তিনি বলিবেন—"'একেলে'-কে ত গঠন করিযাছে 'সেকেলে'ই, অতএব তাহার কাজের জন্য দায়ী ত তোমরাই।"

কথাটা সত্য বটে, কিন্তু তবুও উঃ কি আস্পর্দ্ধা! আমাদের কালে কি আমরা এরূপ উত্তর দিতে পারিতাম! বুক ফাটিলেও তখন মুখ ফুটিত না! তবেই দেখ একালের মেয়েদের যে পরিমাণে বলিবার বুঝিবার ক্ষমতা বাড়িয়াছে, সেই পরিমাণে সহিবার বহিবার শক্তিও কমিয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে হইলে ইহাই এযুগের স্থূল এবং মূল লক্ষণ। সুস্থশরীর, শারীরিক পরিশ্রম, সুপ্রসব এসকল যেন এখন সেকেলে-ফ্যাসানের মধ্যেই গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া বলিবার মত নূতন

কথা কিছু ত খুঁজিয়া পাই না। আমাদের কালে যাহা ছিল না, এখন তাহা হয় নাই। তখনকার অঙ্কুর এবং চারাগাছই এখন পত্রপুষ্পে সুশোভিত। বরঞ্চ যে গাছ শুকাইয়াছে, যে ফুল ঝরিয়াছে, তাহার স্থল এখনও পূরে নাই।

স্ত্রীশিক্ষাসম্বন্ধে এই বলিতে পারি যে, এখনকার দিনের মত বি-এ, এম-এ তখন না থাকিলেও বিদুষীর আদর তখনও যথেষ্ট ছিল। অন্ততঃ আমাদের বাড়ীর দৃষ্টান্ত ত এইরূপই দেখি। আর আধুনিক স্ত্রীশিক্ষাপদ্ধতিরও মূল-পত্তন হইয়াছে আমাদের কালেই।

বহু বৎসর পূর্ব্বে অন্তঃপুর-শিক্ষাসম্বন্ধে আমি "প্রদীপ" নামক মাসিক পত্রিকায় যে কথা লিখিয়াছিলাম[২৪]—সম্ভবতঃ তাহা অনেকের পক্ষেই এখন নূতন হইবে। এই আশা বিশ্বাসে এই কথাই এখানে পুনরাবৃত্তি করিয়া আজি এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

যখন আমার মাতৃদেবী পুত্রবধূ হইয়া আমাদের গৃহে আসেন সে প্রায় শতাব্দিকালেরই কথা। তখন আমাদের প্রপিতামহের পরিবারে অন্তঃপুর পরিপূর্ণ। পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীগণ সকলেই তখন সপরিবারে এক বাড়ীতেই বাস করিতেন। শুনিয়াছি এই বহু পরিবারের মধ্যে কোন নারীই তখন মূর্খ ছিলেন না, বরঞ্চ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষ বিদ্যাবতী বলিয়া আদরণীয়া ছিলেন, স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষা তখনো তাঁহারা গৌরবের বিষয় বলিয়াই মনে করিতেন।

এই ত গেল আমার পক্ষেও যাহা সেকাল সেই কালের কথা। আর আমাদের কালেও তাহারি জের চলিয়া আসিয়াছে। আমি দেখিয়াছি আমাদের দূর-সম্পর্কে এক আত্মীয়া ভগিনী, মাতার বয়স্যা,— চমৎকার বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিতেন। সংস্কৃতও তিনি কিছু কিছু শিখিয়াছিলেন। সেই জন্য মেয়েমহলে শুধু নয়, পুরুষমহলেও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। ইঁহাদিগের পৌত্রী দৌহিত্রীদিগের মধ্যে বরঞ্চ লেখাপড়ার এরূপ আদর দেখি নাই, কাহাকে কাহাকেও মূর্খ দেখিয়াছি। বৃদ্ধাগণ প্রৌঢ়াগণ আমাদের বাড়ীতে যেরূপ বিদ্যানুশীলনের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের পরবংশীয়া নবীনাগণ অন্যত্র গিয়া শিক্ষালাভের সম্ভবতঃ সেরূপ সুবিধা পান নাই।

আহার, বিরাম, পূজা-অর্চ্চনার ন্যায় সে কালেও আমাদের অন্তঃপুরে লেখাপড়া মেয়েদের মধ্যে একটি নিত্যনিয়মিত ক্রিয়ানুষ্ঠান ছিল। প্রতি দিন প্রভাতে গয়লানী যেমন দুগ্ধ লইয়া আসিত, মালিনী ফুল যোগাইত, দৈবজ্ঞঠাকুর পাঁজি-পুথি-হস্তে দৈনিক শুভাশুভ বলিতে আসিতেন, তেমনি স্নান-বিশুদ্ধা, শুভ্রবসনা, গৌরী বৈষ্ণবীঠাকুরাণী বিদ্যালোক বিতরণার্থে অন্তঃপুরে আবির্ভূতা হইতেন। ইনি নিতান্ত সামান্য বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন না। সংস্কৃত বিদ্যায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল,

অতএব বাঙ্গালা ভাল জানিতেন ইহা বলা বাহুল্য। উপরন্তু ইঁহার চমৎকার বর্ণনা-শক্তি ছিল, কথকতা ক্ষমতায ইনি সকলকে মোহিত করিতেন। যাঁহাদের বিদ্যালাভের ইচ্ছা নাও বা থাকিত, তাঁহারাও বৈষ্ণবীঠাকুরাণীব দেবদেবীবর্ণনা, প্রভাত-বর্ণনা শুনিতে কুতূহলী হইযা পাঠগৃহে সমাগত হইতেন। আমার ভাগ্যে বৈষ্ণবীঠাকুরাণীর দর্শনলাভ ঘটে নাই, সুতরাং তাঁহার বর্ণনাসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার নাই। কিন্তু কাকিমার নিকট ইঁহার প্রভাত-বর্ণনার অনুকরণ যাহা শুনিয়াছি, নব্যবংশের প্রীতির জন্য তাহা সযত্নে স্মৃতিরুখিত করিযা নিম্নে বিবৃত করিলাম।

"যামিনী চতুর্যামে লগ্না হযে পড়েছেন, কিন্তু বিদায গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ছেন না; প্রভাত পূর্ব্বদিগন্তের নীচে এসে দাঁড়িযে আছেন, তবু প্রকাশ হ'তে পার্‌ছেন না। কেননা শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকা দোঁহে দোঁহার প্রেমবন্ধনে নিদ্রাচেতন হ'য়ে রয়েছেন। আহা, সারানিশি মানভঞ্জনে উভযের গত হয়েছে, নিশিভোরে তাই ঘুমে বিভোর হয়ে পড়েছেন। মরি, মরি! আহা প্রাণস্বরূপ শ্রীহরি, প্রেমস্বরূপিণী শ্রীরাধার এই প্রেমমিলনে দ্যুলোক ভূলোক বিশ্বচরাচর স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। বিহঙ্গবিহঙ্গীর কলরব নাই; নদনদী নিঃস্রোত, জীবজন্তু নরনারী গভীব নিদ্রা-মগ্ন, শুকতারা পূর্ব্বাকাশ হ'তে এখনো অস্ত যেতে পারছেন না, সূর্য্যদেব অরুণ-রথে সমাসীন হয়ে উদয হ'তে ভয পাচ্ছেন। সৃষ্টিতে প্রলয আসে-আসে। সূর্য্যদেব চিন্তাকুল হৃদয়ে রথ ফিরিয়ে ভগবান ব্রহ্মার সদনে উপনীত হলেন, সেখানে গিয়ে তাঁকে এই সমূহ বিপদের কথা অবগত করালেন, ব্রহ্মা মনে মনে প্রমাদ গণনা ক'রে ধ্যানমগ্ন হলেন। ধ্যানভঙ্গে অন্যোপায় না দেখে কৃষ্ণপক্ষীর (রামপক্ষী) স্মরণ কর্‌লেন, পক্ষী আগত হলে বল্লেন, 'হে কৃষ্ণভক্ত বিহঙ্গম, তুমি না রক্ষা কর্‌লে এ বিপদে পরিত্রাণ নাই। হে অগতির গতি, ভক্তচূড়ামণি, তুমি ভিন্ন ভগবান বিষ্ণুদেবের নিদ্রাভঙ্গ করে এমন সাধ্য আর কা'র? অতএব দেবদানব নররাক্ষস সকলের প্রতি কৃপাবান্‌ হয়ে তুমি গিয়ে তাঁকে জাগরিত কর;—নচেৎ সৃষ্টি এখনি লোপ পায়! পক্ষীবর ব্রহ্মার বচনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে নির্ভয় প্রদান ক'রে, বৃন্দাবনের নিকুঞ্জদ্বারে এসে ডাক্‌লেন—কুক্‌কুহুকু অর্থাৎ উঠ হে উঠ—কুক্‌কুহুকু! কুক্‌কুহুকু! ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেব কমললোচন উন্মীলন করে দেখলেন প্রভাত হয়েছে।'

"যতদূর স্মরণ হচ্ছে তাতে লজ্জিত বোধ না করে এই সুখের মিলনভঙ্গ-জনিত অপরাধে তিনি পক্ষীবরকে যে অভিশাপ প্রদান কর্‌লেন সেই শাপেই তখনকার পূজ্য পবিত্র কুক্কুটপক্ষী এখন হিন্দুর অস্পৃশ্য ও ম্লেচ্ছের খাদ্য।"

আমি যে গল্পটি হুবহু আমার খুল্লতাতপত্নীর ভাষায় আবৃত্তি করিলাম এমন নহে; ভাষার রূপান্তর হইয়াছে সন্দেই নাই। সে এত ছেলেবেলার কথা যখন কাকিমার মুখ হইতে পীড়াপীড়ি করিয়া এই বর্ণনা শুনিতাম। সমস্ত কৌতূহল সমস্ত প্রাণ

তখন কুক্‌কুহু কথাটির উপর পড়িয়া থাকিত। কখন্ পাখী ডাকিয়া উঠিবে সেই আগ্রহে প্রথমাংশের প্রতি তেমন মনোযোগই হইত না। তবে এতবার এই গল্পটি শুনিয়াছি, তাই এখন মনে করিয়া ভাষা রচনা করিতে পারিলাম।

বৈষ্ণবী আসিতেন অন্তঃপুরের চতুঃসীমাবদ্ধ মহিলাগণের জন্য; বালিকা নববধূ ও বিবাহিতা বালিকা কন্যাগণ ইঁহার কাছেই শিক্ষা লাভ করিতেন। কিন্তু বাড়ীর অবিবাহিতা কন্যাগণ বালকদিগের সহিত একত্রে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় গমন করিত। ইহাতে আর কিছু না হউক, বালকবালিকার শিক্ষার ভিত্তি সমভাবেই গঠিত হইত।

তখন বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় হয় নাই। বৈষ্ণবীঠাকুরাণী যে পুস্তক হইতে বর্ণবোধ করাইতেন, তাহার নাম শিশুবোধক। পুস্তকখানি আমি বড় হইয়া দেখিয়াছি। অক্ষরমালা, বানান, দেবদেবী-বন্দনা, যামবর্ণনা, লিপিলিখন-প্রণালী—এ সমস্তই এই একখানি পুস্তকের মধ্যে স্তূপীকৃত। বন্দনা ও বর্ণনার ভাষা এত কঠিন দুর্ব্বোধ্য যে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া পড়িলেই বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা এক রকম শেষ হইয়া যায়। তাঁহারা লেখা অভ্যাস করিতেন প্রথমে তালপাতে, তাহার পর কলাপাতে। বালির কাগজে কঞ্চী কলমের মক্‌স সর্ব্বশেষ।

আমি শৈশবে অন্তঃপুরে সকলেরই লেখাপড়ার প্রতি একটা অনুরাগ দেখিয়াছি। মাতাঠাকুরাণী ত কাজকর্ম্মের অবসরে সারাদিনই একখানি বই হাতে লইয়া থাকিতেন। চাণক্যশ্লোক তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাঠ ছিল, প্রায়ই বইখানি লইয়া শ্লোকগুলি আওড়াইতেন। তাঁহাকে সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া শুনাইবার জন্য প্রায়ই কোন না কোন দাদার ডাক পড়িত। দিদিমা—মায়ের খুড়ীমা, তিনি ত পুস্তকের কীট ছিলেন। কাব্য উপন্যাসাদির ত কথাই নাই; তন্ত্রপুরাণ, সাংখ্য আর দর্শনাদির যত কঠিন অনুবাদই হউক না কেন তাহাতে দন্তস্ফুট করিবার চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। আর কোন বই না পাইলে শেষে অভিধানখানাই খুলিয়া পড়িতে বসিতেন। বড়দাদা মহাশয়ের 'তত্ত্ববিদ্যা'র[২৫] সমজদার তাঁহার মত আর কেহ ছিল না। মামীমা, দিদি, বধূঠাকুরাণীগণ প্রভৃতি নবীনার দল অবশ্য কাব্য উপন্যাসেরই অনুরাগিণী ছিলেন। পড়িতে শিখিয়া অবধি আমাদের মাতুলানীকে রামায়ণ, মহাভারত, হাতেমতাই প্রভৃতি পড়িয়া শুনান আমার একটা বিশেষ কার্য্য ছিল। মনে আছে, বাড়ীতে মালিনী বই বিক্রী করিতে আসিলে মেয়েমহল সেদিন কি রকম সরগরম হইয়া উঠিত। সে বটতলার যত কিছু নূতন বই, কাব্য উপন্যাস, আষাঢ়ে গল্প—অন্তঃপুরে আনিয়া দিদিদের লাইব্রেরীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া যাইত। ঘরে ঘরে সকলের যেমন আলমারীভরা পুতুল, খেলানা, বস্ত্রাদি থাকিত, তেমনি সিন্ধুকবন্দী পুস্তকরাশিও থাকিত। বড় হইয়া সে-কালের বইগুলি যথেষ্ট নাড়াচাড়া করিয়াছি;

—মানভঞ্জন, প্রভাসমিলন, দূতীসংবাদ, কোকিলদূত, রুক্মিণীহরণ, পারিজাতহরণ, গীতগোবিন্দ, প্রহ্লাদচরিত্র, রতিবিলাপ, বস্ত্রহরণ, অন্নদামঙ্গল, আরব্যোপন্যাস, পারস্যোপন্যাস, চাহারদরবেশ, হাতেমতাই, গোলেবকায়লী, লায়লামজনু, বাসবদত্তা, কামিনীকুমার ইত্যাদি। পাঠক দেখিতেছেন এতগুলির মধ্যে একখানি কেবল নামকরণে সামাজিক; কামিনীকুমার কাব্যে লিখিত উপন্যাস। তখন পর্য্যন্ত গদ্যে উপন্যাস লিখিত হয় নাই। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে আমাদের শৈশবে রামনারায়ণ তর্করত্ন গদ্যে সংস্কৃত নাটকাদি অনুবাদের পর, 'কুলীনকুলসর্ব্বস্ব' 'বহুবিবাহ নাটক' প্রভৃতি সামাজিক নাটক রচনা করেন। কালী সিংহের হুতোমপ্যাচার নক্সা, প্যারীচাঁদ মিত্রের উপন্যাসাবলী ইহারও পবে রচিত। অথচ সাহিত্যনামাবলীতে কামিনীকুমারের নাম কেন দেখিতে পাই না? 'কামিনীকুমার' পদ্যে লিখিত উপন্যাস, কিন্তু ইহাব বিশেষত্ব এই, বিদ্যাসুন্দরের ঠিক অনুকরণ নহে, পূর্ব্বে কাব্য লিখিতে হইলেই ভাবতচন্দ্র রায তাহার আদর্শ হইত। শুনিযাছি মদনমোহন তর্কালঙ্কার "বাসবদত্তা"[২৬] লিখিবাব সময পণ করিযা লিখিতে বসেন, যে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুকরণে কাব্য লিখিযা ভারতচন্দ্রকেও হারাইবেন। কিন্তু পুস্তক বাহির হইলে, তখনকার সমজদারদের বিচারে তাঁহাকে ভগ্নচেতা হইতে হয, ক্ষোভে সাধের বাসবদত্তা তিনি অগ্নিসমর্পণ করেন। দুই-চারিখানি পুস্তক ইতিপূর্ব্বেই যাহা বাহিরে প্রচার হইয়াছিল, তাহাতেই মাত্র মদনমোহনের মহিমা আবদ্ধ থাকে।

কবিত্বে বা ঔপন্যাসিক রহস্যে কামিনীকুমারের মূল্য অধিক, এরূপ বলিতে পারি না—তথাপি সাহিত্যসমাজে ইহার নাম রক্ষা হওয়া উচিত। চলিত বঙ্গসমাজের স্ত্রীপুরুষ লইযা নাযকনাযিকা রচনার ইহা সর্ব্বাদি পুস্তক। যতদূর মনে পড়িতেছে, কামিনীকুমাবের গল্পটি এইরূপ—প্রথমে নায়ক-নায়িকার জন্মবিবরণ, রূপবর্ণনা, পরে বযঃপ্রাপ্তে উভয়ের দর্শন, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ, মিলন-আশায় উভয়ের দেশভ্রমণে নির্গমন; স্থান বর্ণনা, কোন কোন স্থানে উভয়ের সন্দর্শনলাভ; কামিনী ছদ্মবেশী পুরুষ, অতএব কুমারের নিকট অপরিচিত, কিন্তু কুমারকে কামিনী চিনিয়া তাহার সহিত রহস্যালাপে রত, অবশেষে উভয়ের গৃহে প্রত্যাগমন, মিলন ও বিবাহ। ইহার রচয়িতা শ্রীযুক্ত গিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—আমার মধ্যম খুল্লতাত।

পিতৃদেবকে ধর্ম্মাত্মা ও ধর্ম্মসংস্কারক বলিয়াই সকলে জানেন। এবং যেহেতু আমাদের দেশের ধর্ম্ম ও সামাজিক আচার পৃথক বস্তু নহে, পরস্পরসংলিপ্ত, সেই হেতু ধর্ম্মসংস্কারের সহিত যে-পরিমাণ সমাজ সংস্কার অবশ্যম্ভাবী, সেই-পরিমাণে গৌণভাবে তিনি সমাজসংস্কারক বলিয়াও পরিচিত। কিন্তু গৌণভাবে নহে, ধর্ম্মসংস্কারের ন্যায় সমাজসংস্কারেও যে ইনি মুখ্যভাবে ব্রতী ছিলেন, ইঁহার দ্বারাই যে সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোকের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন হইয়াছে, ইনিই যে বাল্য-বিবাহের

প্রথম সংস্কার করেন, এমন কি মহিলাদিগের সুসভ্য পরিচ্ছদ প্রবর্ত্তন সংকল্পেও যে কতদূর মনোযোগ দিয়াছেন, তাহা আমরাই বলিতে পারি। ধর্ম্মসংস্কারে রামমোহন রায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে, কিন্তু সমাজসংস্কারে যে পিতৃদেব বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম পথপ্রদর্শক, ইহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

বেথুনস্কুল স্থাপিত হইবামাত্র সমাজনিন্দা অগ্রাহ্য করিয়া যে দুই-একটী মহোদয় সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের শিশু কন্যাগণকে স্কুলে প্রেরণ করেন, পিতৃদেব তাঁহাদের মধ্যে একজন।

পিতৃদেব পাহাড়ে চলিয়া গেলে আমাদের অন্তঃপুরের শিক্ষাসংস্কার একেবারে বন্ধ হইয়া যায়। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিবার পর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের উন্নতি আরম্ভ। তখন হইতে ধর্ম্মসংস্কার ও শিক্ষাসংস্কার একই সঙ্গে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে।

তিনি আসিয়াই প্রথমে শালগ্রামশিলা বিসর্জ্জন দিলেন, বাড়ীর সকলকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। প্রতিদিন উপাসনার সময় সত্যধর্ম্ম সম্বন্ধীয় উপদেশ, এবং ভিন্ন সময়ে নানারূপ সরল সহজ বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতায় তাঁহার পরিবারের, বিশেষ অন্তঃপুরিকাগণের বুদ্ধি, জ্ঞান, ও ধর্ম্মবৃত্তি সমভাবে সম্মার্জ্জিত করিতে লাগিলেন। পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান উঠাইয়াই ক্ষান্ত না হইয়া সমস্ত ভারতব্যাপী বহুকাল প্রচলিত হীন স্ত্রী-আচার দুই একটি করিয়া নিজ অন্তঃপুর হইতে একেবারে উঠাইয়া দিলেন; আজিকালিকার মত বয়স্ক বিবাহ না হউক, বালিকাদিগের বিবাহের একটি বিশেষ বয়ঃক্রম নির্দ্ধারিত করিলেন ও বিবাহের একটি নব পদ্ধতি গঠিত হইল। আমাদের মধ্যমা ভগিনীর বিবাহ হইতে এ পর্য্যন্ত বাড়ীতে সেই পদ্ধতি অনুসারেই বিবাহ-কার্য্য সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে; তাঁহার শিশুকন্যাগণ শিক্ষার বয়স প্রাপ্ত হইলে পুরাতন প্রথার পরিবর্ত্তে উচ্চ উন্নত প্রণালীতে তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইল। আমাদের জন্য পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। দ্বিতীয়ভাগ শেষ করিয়া বাঙ্গালার সহিত সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিলাম। অন্তঃপুরে মেম আসিতে লাগিলেন।

আমাদের বাড়ীর এই নবোন্নতিকালে কেশববাবু পিতামহাশয়ের শিষ্য হইলেন। অসূর্য্যম্পশ্য অন্তঃপুরে বাহিরের নিঃসম্পর্কীয় লোক এই প্রথম, অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের ন্যায় স্বাগত হইয়া প্রবেশলাভ করিলেন। অনেকে এই ঘটনাটিতে অসমসাহসিকতা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হন। কিন্তু মহর্ষি পিতৃদেব, যিনি ধর্ম্মের জন্য আত্মীয় বান্ধব, সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য অবাধে জলাঞ্জলি দিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি যে সত্যধর্ম্ম গ্রহণাপরাধে গৃহতাড়িত, শিষ্যরূপে সমাগত, শরণাগত সস্ত্রীক কেশববাবুকে দেশাচার তুচ্ছ করিয়া পুত্রস্নেহে গৃহে গ্রহণ করিবেন, ইহা কি বড়ই আশ্চর্য্যের কথা?

যদি আশ্চর্য্য হইতে হয়—তবে ইহার পরবর্ত্তী আর একটি কার্য্যে। এতক্ষণ যাহা

বলিলাম, এ সকলই মেজদাদামহাশয় বিলাত যাইবার পূর্ব্বেকার কথা। তাঁহার বিলাত গমনের দুই-তিন বৎসর পরে একজন অনাত্মীয় পুরুষ অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিলেন। মেয়ের শিক্ষা আশানুরূপ ফলপ্রদ বলিয়া পিতৃদেবের মনে হইল না। আদি-ব্রাহ্মসমাজের নবীন আচার্য্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী[২৭] অন্তঃপুরে শিক্ষকতাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌঠাকুরাণী তিনজন, মাতুলানী, দিদি ও আমরা ছোট তিন বোন সকলেই তাঁহার কাছে অন্তঃপুরে পড়িতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুস্তকই আমাদের পাঠ্য ছিল।

বঙ্গমহিলার সাধারণ-প্রচলিত একখানি মাত্র সাড়ী পরিধানে অনাত্মীয় পুরুষের নিকট বাহির হওয়া যায় না, এই উপলক্ষে অন্তঃপুরিকাগণের বেশও সংস্কৃত হইল। দিদি, আমাদের মাতুলানী এবং বৌঠাকুরাণীগণ একরূপ সুশোভন পেসোয়াজ এবং উড়ানী পরিয়া পাঠাগারে আসিতেন। বাঙ্গালী মেয়ের বেশের প্রতি আজীবন পিতামহাশয়ের বিতৃষ্ণা, এবং তাহার সংস্করণে একান্ত অভিলাষ ছিল। মাঝে মাঝে মাত্র দিদিদের, কিন্তু অবিশ্রান্ত তাঁহার শিশুকন্যাদের উপর পরীক্ষা করিয়া, এই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টারও তিনি ক্রটি করেন নাই। আমাদের বাড়ীতে সেকালে খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমান বালক-বালিকার ন্যায় বেশ পরিধান করিত। আমরা একটু বড় হইয়া অবধি তাহার পরিবর্ত্তে নিত্য নূতন পোষাকে সাজিয়াছি। পিতামহাশয় ছবি দেখিয়াছেন, আর আমাদের কাপড় ফরমাস করিয়াছেন; দরজি প্রতিদিনই তাঁহার কাছে হাজির, আর আমরাও। কিন্তু এত পরীক্ষাতেও তিনি আমাদের জন্য বেশ একটি পছন্দসই বেশ ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মেজ-বধূঠাকুরাণী বোম্বাই হইতে গুর্জ্জর মহিলার অনুকরণে সুশোভন সুদর্শন পরিচ্ছদে আবৃতা হইয়া যখন দেশে প্রত্যাগমন করিলেন তখনই তাঁহার ক্ষোভ মিটিল। দেশীয়তা, শোভনতা ও শীলতার সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলনে, এ পরিচ্ছদ তিনি যেমনটি চাহিয়াছিলেন, ঠিক সেই রকম মনের মতনটি হইয়া, বঙ্গবালাদিগের ঐকান্তিক একটি অভাব-মোচনে তাঁহার অনেক দিনের বাসনা পূর্ণ করিল।

বিলাত হইতে ফিরিবার পর হইতে স্ত্রীজাতির উন্নতি-সংকল্পে প্রকৃত প্রস্তাবে কার্য্য আরম্ভ করিলেন আমার পূজনীয় মেজদাদা—শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এতদিন যে তিনি এ সম্বন্ধে নীরব, নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়াছিলেন এমন নহে, তবে এতদিন পিতার নেতৃত্বে পুত্র তাঁহার সহায়তা করিতেছিলেন, এখন স্বাধীন ও উপযুক্ত হইয়া পিতার বিশ্রামাবসরে নিজে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন। আশৈশব ইনি মহিলা-বন্ধু; স্ত্রীশিক্ষা স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। বিলাত যাইবার পূর্ব্বেই উক্ত বিষয়ের ঔচিত্য সম্বন্ধে সারগর্ভ সতেজ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ইনি একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন।[২৮] পিতৃদেব

অন্তঃপুরের মঙ্গলের জন্য যে-সকল আচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, অধিকাংশই ইঁহার পরামর্শে, ইঁহার প্ররোচনায় সম্পাদিত। ইনি এ সকল কার্য্যে পিতার দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। অন্তঃপুরের অবস্থা সংশোধনের জন্য মাতাকেও ইনি ক্রমাগত ভজাইতেন। আজন্ম যে উদ্দেশ্য ব্রতরূপে হৃদয়ে ধারণ পোষণ করিয়া আসিয়াছেন, নিজে সকর্ম্মা স্বাধীন হইয়া অদম্য অটল উৎসাহে তাহার উদ্‌যাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। এখন হইতে আমাদের বাড়ীতে—কেবল তাহাই নহে, সমগ্র বঙ্গসমাজে তাঁহার যুগ আরম্ভ। পিতা মহিলাদিগের উচ্চশিক্ষার মূলপত্তন করিয়াছিলেন, পুত্র তদুপরি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন; পিতা তাঁহার অন্তঃপুরে যে বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, পুত্র তাহা সযত্নে ফলবন্ত করিয়া সে ফল সমাজে বিতরণ করিলেন; পিতা ঘরের সংস্কারে বঙ্গের নেতা, পুত্র ঘরের দৃষ্টান্ত পরকে সমর্পণে ধন্য। একজন স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষার জনয়িতা, একজন স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রবর্ত্তক।

মেজদাদামহাশয় ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করেন ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের শেষে এবং তাঁহার সার্ভিস আরম্ভ হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে।[২৯] তখন অন্তঃপুরে অবরোধপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। তখন মেয়েদের একই প্রাঙ্গণের এ-বাড়ী হইতে ও-বাড়ী যাইতে হইলে ঘেরাটোপ-মোড়া পাল্‌কীর সঙ্গে প্রহরী ছোটে, তখন নিতান্ত অনুনয় বিনয়ে মা গঙ্গাস্নানে যাইবার অনুমতি পাইলে বেহারারা পাল্‌কী সুদ্ধ তাঁহাকে জলে চুবাইয়া আনে। স্ত্রীকে মেজদাদা লইয়া যাইতেছেন বোম্বাই—সমুদ্রপথে, কিন্তু তখনো অন্তঃপুর হইতে তাঁহাকে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত হাঁটাইয়া গাড়ী চড়াইতে পারিলেন না। কুলবধূর পক্ষে ইহা এতই নূতন এতই লজ্জাজনক যে বাড়ীসুদ্ধ সকলেই ইহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করিলেন। অগত্যা পাল্‌কী করিয়া তাঁহাকে জাহাজে উঠিতে হইল। একজন ফ্রেঞ্চ মহিলা তাঁহার বহির্গমনের উপযোগী নূতন বেশ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু অদম্য ইচ্ছার স্রোতে দৈব পর্য্যন্ত গা ঢালিয়া দেয়—মানুষের কি কথা! দুই বৎসর পরে মেজদাদা যখন সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিলেন, তখন আর কেহ বধূকে পাল্‌কী করিয়া গৃহে আসিতে বলিতে পারিলেন না। কিন্তু ঘরের বৌকে মেমের মত গাড়ী হইতে সদরে নামিতে দেখিয়া সেদিন বাড়ীতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল, তাহা বর্ণনার অতীত।

বাড়ীতেও এই সময় ইঁহারা একরূপ একঘরে হইয়া রহিলেন। বাড়ীর অন্যান্য মেয়েরা বধূঠাকুরাণীর সহিত অসঙ্কোচে খাওয়া-দাওয়া করিতে বা মিশিতে ভয় পাইতেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে দ্বিতীয়বার যখন মেজদাদা বোম্বাই হইতে বাড়ী আসিলেন তখন বাঁধাবাধি অনেকটা শিথিল হইল। তখন সবে মাত্র আমার বিবাহ হইয়াছে। স্বামী স্ত্রীশিক্ষানুরাগী, উন্নতিপ্রবর্ত্তক, বিশ্বাসানুসারে কার্য্য করিয়া তাঁহাকেও

জীবনে অনেক সহ্য করিতে হইয়াছে। তিনি মেজদাদার সঙ্গে পূর্ণপ্রাণে মিশিয়া তাঁহার দলপুষ্ট করিলেন, এবং বাড়ীর আর-সকলেরও মতামত অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রমের সময় শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে স্বামী আমাকে বোম্বাই রাখিয়া আসিলেন। তখনও আমি ইংরাজী জানি না বলিলেই হয়, অতি সামান্যই শিখিয়াছি। শিশুকন্যা হিরণ্ময়ীকে লইয়া আমি এক বৎসর সেখানে ছিলাম। বৎসরান্তে সকলে একত্রে ফিরিলাম।

ভাঙ্গনধরা তীর অনেক দূর পর্য্যন্ত খসিল। কলিকাতায় ফিরিয়া মেজদাদা আর নিজের ঘরে একঘরে নহেন, দলে পুষ্ট। দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যে বাড়ীর আবহাওয়া সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল।

এইখানে বলা আবশ্যক, স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচারক না হইলেও, বাড়ীর ছেলেমেয়েদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে সেজদাদা পরলোকগত হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও চিরকাল উৎসাহ এবং অধ্যবসায়ের সীমা ছিল না। তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বে অনেক সময় আমাদের নিজে শিক্ষাদান করিতেন। বিবাহের পরে তাঁহার শিক্ষাদানের কেন্দ্রস্বরূপ হইলেন তাঁহার পত্নী।[৩০] সেজদাদাই প্রথমে দেশাচার কুলাচার ভাঙ্গিয়া তাঁহার পত্নীকে আমাদের বাড়ীর গায়ক বিষ্ণুর[৩১] নিকট গান শিখাইতে আরম্ভ করেন। মহর্ষিদেব ইহাতেও আপত্তি করেন নাই। শ্রীমতী প্রতিভা দেবী যিনি সঙ্গীত বিদ্যায় বঙ্গমহিলাগণের অধুনা নেত্রীস্বরূপ, তিনি হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই কন্যা।

বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর সহিত স্বতন্ত্র আবাসে বাসকালীন তিনিও আমার সেতার শিক্ষার জন্য ওস্তাদ নিযুক্ত করেন। এই সময় হইতে ক্রমশঃ আমাদের বাড়ীতে শিক্ষার স্রোত বেগে বহিতে থাকে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা গান বাজনা, লেখাপড়া সর্ব্ব রকমে বেশ ভাল করিয়া শিক্ষা পাইতে লাগিল। দিদিরা পর্য্যন্ত ঘরে কাঁচিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। গাড়ী করিয়া যাতায়াত ত আর লজ্জার বিষয়ই নহে, পাল্‌কীর চলন একরকম উঠিয়াই গেল। আজ প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল মেজদাদামহাশয় ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়াছেন, ইহার মধ্যে তাঁহার দৃষ্টান্তে, তাঁহার যত্নে আমাদের অন্তঃপুরে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কেবল আমাদের গৃহে কেন ? তাঁহার দৃষ্টান্ত সমস্ত বঙ্গে আজ পরিব্যাপ্ত। এ দেশের কোন সম্ভ্রান্ত মহিলার পক্ষেই এখন বাহিরে যাওয়া সেরূপ নূতন নহে, সেরূপ লজ্জাজনক নহে। বাহিরে যাইতে হইলে সুসভ্য পরিচ্ছদেরও আর ভাবনা নাই। এখন স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা বহুবিস্তৃত। যে কন্টকাকীর্ণ পথ বহুযত্নে বহু পরিশ্রমে তিনি মুক্ত, প্রসারিত করিয়াছেন, বঙ্গবালা-মাত্রেরই নিকট তাহা এখন সহজ, সুগম। উন্নতিশীলা মহিলাদিগের কথা ছাড়িয়া, —অন্তঃপুরিকাগণের মধ্যেও উন্নতির এই স্রোত প্রবাহিত। এখন কন্যাকে

দেখিতে আসিয়া বরপক্ষীয়গণ প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেন কন্যার লেখাপড়া কিরূপ। রীতিমত বিদ্যাচর্চ্চা, শ্বশুর শাশুড়ীর নিকটও কন্যাভাব, গাড়ী চড়িয়া যাতায়াত, বোম্বাই ফ্যাসানে পরিচ্ছদ পরিধান—এ সকল এখন হিন্দু-সমাজনীতির অঙ্গীভূত। আর এ সকলের যিনি প্রবর্ত্তক, ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহাকে শত বাধা একাকী এক হস্তে উৎপাটন করিতে করিতে অগ্রগামী হইতে হইয়াছে। নিজের বাড়ীর লোকে পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত যোগ দিতে ভয় পাইয়াছে। কিন্তু স্ত্রীজাতির উন্নতিতে ইনি এমনই অটলসংকল্প ছিলেন, মহিলাদিগের মঙ্গল-কল্পনায় ইনি এমনি আনন্দলাভ করিতেন যে, এ সাধনার জন্য তিনি কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করেন নাই; কোন অপমানেই তাঁহাকে নত করিতে পারে নাই। আজকাল যাঁহারা সমাজে স্ত্রীকে লইয়া বহির্গত হন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই বহু পুরুষের মাঝে দু-একটী মহিলাকে লইয়া গিয়া অন্যের অঙ্গুলিনির্দ্দিষ্ট হইতে লজ্জা-বোধ করিবেন, কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা ইঁহাদের দলভুক্ত নহেন, অর্থাৎ যাঁহারা স্ত্রীকে লইয়া বাহিরে যান না, তাঁহাদের সঙ্গে স্ত্রীকে পরিচিত করিতেও আপত্তি করিবেন। কিন্তু মেজদাদার সেন্টিমেন্ট, মেজদাদার যুক্তি এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত, তাঁহার নিকট এ কথা পাড়িলে তিনি রাগিয়া বলিবেন, একরাশ পুরুষের সভায় কেন দু-একটি মেয়ে লইয়া যাইব না? যাঁহারা স্ত্রীকে লইয়া বাহিরে যান না, তাঁহাদের নিকট স্ত্রীকে বাহির না করিলে তাঁহাদের শিক্ষা হইবে কিসে? অভ্যাস পরিবর্ত্তন হইবে কেমন করিয়া? কেবল কথায় নহে, কার্য্যতঃ চিরদিন তিনি এইরূপ করিয়া আসিয়াছেন। বিদেশে সভা-সমিতিতে বা 'পান সুপারী'-তে তাঁহাকে একা নিমন্ত্রণ করিবার যো ছিল না। বাড়ীর মেয়েরা পর্য্যন্ত নিমন্ত্রিত না হইলে তিনি কোথাও যাইবেন না, সকলেই জানিয়াছিল। মেজদাদার স্বভাবে স্ত্রী-সম্মান এতই ওতঃপ্রোতভাবে বর্ত্তমান যে, কোন ভদ্র পুরুষে স্ত্রীজাতির প্রতি অসম্মান দৃষ্টিতে চাহিতে পারে, ইহা তিনি অন্তরে ধারণা করিতেও অক্ষম।

মেজদাদার কাছে যদি বল,—বুদ্ধিতে পুরুষ স্ত্রীলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যদি বল—পুরুষের ন্যায় তাহাদের উচ্চশিক্ষা অনাবশ্যক, কার্য্যক্ষেত্রে তাহারা পুরুষের অসমকক্ষ, অমনি তিনি গরম হইয়া উঠিবেন, মেয়েদের পক্ষ হইয়া তর্কপরায়ণ হইবেন। বাড়ীর মেয়েরা মিউজিয়াম বা পশুশালা বা কোন বক্তৃতা শুনিতে যাইতে চাহে—সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার পুরুষ মিলিতেছে না; মেজদাদা জানিতে পারিলেই অমনি শত অনিচ্ছা শত অসুবিধা সত্ত্বেও তাহাকে সঙ্গে করিয়া যথাস্থানে লইয়া যাইবেন। কর্ত্তার নিকট মেয়েদের যদি কোন আবেদন থাকিত ত, মেজদাদাই তাহাদের মুরুব্বি; বাড়ীর মেয়েরা সকলেই জানিত মেজদাদার মত সহায়, বন্ধু তাহাদের আর কেহ নাই, তাঁহার উপর সকলেরি বিশ্বাস ছিল অসীম। বাস্তবিক পক্ষে মহিলাদিগের

সর্ব্বতোভাবে এমন মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ও নেতার উপযুক্ত, এমন উদার মহদন্তঃকরণব্যক্তি সংসারে কম দেখিতে পাওয়া যায়। আমার ভ্রাতা মনে করিলে এ কথা আমি সর্ব্বজনসমক্ষে এরূপ মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারিতাম না, কিন্তু এখন আমি তাঁহার কার্য্য সমালোচনায় বিচারাসীন বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তিরূপে সম্মুখে রাখিয়া অপক্ষপাতীরূপে তাঁহার প্রাপ্য তাঁহাকে দান করিতেছি মাত্র।

সুখের বিষয়, তাঁহার প্রাণপণ উদ্যম এখন সার্থক, আশৈশব জীবনের উদ্দেশ্য সফল, সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে মহিলোন্নতিতে বঙ্গদেশ আজ সর্ব্বপ্রধান।

এইখানে একটি কথা না বলিলে সত্যের অবমাননা ঘটে। যদি স্বামী মেজদাদার সহায়তা না করিতেন, তাহা হইলে এত শীঘ্র স্ত্রীজাতির এতদূর উন্নতি হইত কি না সন্দেহ। অন্ততঃ তিনি যে অনেক পরিমাণে এ উন্নতি অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতী চৈত্র ১৩২২

মিলন-কথা

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

আজ "ভারতী" চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিযাছে। সেই "ভারতী", —যাহার সংশ্রবে আমার জীবনের একটী অধ্যায় ওতঃপ্রোতভাবে বিজড়িত। তাহার কথা আজি বড় মনে পড়িতেছে, তাই সে পুরানো কাহিনী আজি কিছু বলিব। "ভারতী" উপলক্ষে কিরূপে আমাদের দুইটী হৃদয এক হইযা যায; কিরূপে একটী চির-রক্ষণশীল একান্নবর্ত্তী হিন্দু পরিবারের অভেদ্য দুর্গ-প্রাকারে আমাদের মিলন-মঙ্গল-পতাকা উড্ডীন হয়; তাহা আজ ভারতীর চল্লিশ বৎসর উপলক্ষে ভারতীর নবীন সম্পাদকদ্বয়ের ন্যায্য প্রাপ্যবোধে উপহার দিতেছি।

সেকালের কথার অবতারণা করিতে হইলে, ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন ধূলার হাত এড়ানো যায় না, তেমনি নিজকে বাদ দেওয়া যায না; সে প্রসঙ্গ আগেই আসিয়া পড়ে। সেকালের সাহিত্যের ইতিহাস এবং কোন্ সময় হইতে ও কত বয়সে ভারতীর সহিত আমার পরিচয় হয় তাহা বলা কর্ত্তব্য। মনে পড়ে, সন ১২৭৯ সালে আমার প্রথম গ্রন্থ— "কবিতা- হার" বাহির হয়; ১২৮০ জ্যৈষ্ঠের "বঙ্গদর্শনে" উহার সমালোচনা বাহির হয়[৩২]; তখন আমার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর। তখন "বঙ্গদর্শনের" কাল, পরে পরে "আর্য্যদর্শন" "হিন্দুদর্শন" "জ্ঞানাঙ্কুর" "মধ্যস্থ" প্রভৃতি কতই প্রচার হয়; সে সকল কিছুদিন সাহিত্য-গগনে জ্যোতিঃ বিস্তার করিয়া, একে একে সকলেই অদৃশ্য হইয়াছে। কিন্তু "ভারতী"র সম্পাদকদ্বয় ঠিক বলিয়াছেন, ভারতী কখনও পিছনকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকে নাই, কাজেই "ভারতী" চির-নবীন। তৎকালে প্রচলিত পত্রিকাবলীর মধ্যে ভারতীর বিশেষত্বই তাই। ভারতীর অগ্রজ-অগ্রজা অবশ্য অনেকেই ছিল— "কত এল গেল চলে সে।" তন্মধ্যে বামাবোধিনী দীর্ঘজীবিনী। তত্ত্ববোধিনী এক বাড়ীর ও "ভারতী"র দিদি হইলেও একেবারেই স্বতন্ত্র; ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পত্রিকা; তাহা সকলেই জানেন। সচিত্র "বিবিধার্থ সংগ্রহ" তখনকার সাহিত্যিকগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। এইখানে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন, ভারতীর ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য সম্পাদিকার কোমল করে বলয়ের মিষ্ট-মধুর আহ্বান-ধ্বনিই চির মুখরিত হইত, কখনও সে হস্ত সমালোচনার কঠোর আঘাতে নবীন লেখকের উদ্যম ভঙ্গ করে নাই। বলিতে

কি, এখনকার অনেক প্রথিতযশা লেখকদের তিনিই গঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। তাই মনে হয় আজি তাঁহার বিশ্রাম-বাসরে তাঁহাদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার প্রসূনাঞ্জলি তাঁহার অবশ্য-প্রাপ্য। মনে আছে, ভারতী প্রকাশিত হইলে সে সময়ে ভারতীর ভাষাকে অনেকে ' ঠাকুরি' ভাষা বলিয়া উল্লেখ করেন। রুচি-বৈচিত্র্য যেমন চিরদিন বিদ্যমান থাকিবে, তাহা দোষের নহে; সৃষ্টি-বৈচিত্র্যও তেমনি; তাহাও উপেক্ষার নয়। সত্য বলিতে কি আমার 'গদগদনদেগোদাবরী বারয়োঃ' যেমন ভাল লাগে, আবার ঠাকুরমার মুখে শ্রুত 'টুপুর টাপুর বৃষ্টি পড়ে নদী এলো বান' ইহাও তেমনি ভাল লাগে; আবার চাষা বৌয়ের মুখে "ঝরোকায় গলা বেড়িয়ে ডেঁড়িয়ে ছ্যালো" এও তেমনি মিষ্ট লাগে। মূল কথা, যেখানে যেমন, সেখানে তেমনটি হইলেই শোভন, সুন্দর হয়।

এইবার ভারতী-সংশ্রবে কিরূপে আমাদের মিলন সংঘটিত হয়, তাহাই বলিব। প্রথম যেদিন স্বামী আসিয়া বলিলেন, "আজ একটী নূতন খবর দিব। তোমাদেরই স্বজাতীযা একজন, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী মাসিক পত্রিকার সম্পাদিকা হইলেন। তুমি ত পারিলে না।" (ইহা বলিবার অর্থ, তিনি আমাকে সংবাদ-প্রভাকর, অমৃতবাজার প্রভৃতি পত্রে ধারাবাহিকরূপে লিখিতে অনুরোধ করেন।) সেই দিন আনন্দ-কৌতূহলের মধ্য দিয়া নবীনা সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রবল হয়। তার পর ঘটনাসূত্রে যেদিন তাঁহার সহিত ইপ্সিত মিলন ঘটিল, হায়! সেদিন তিনি, যিনি আনন্দের সহিত স্ত্রী-সম্পাদিকার সংবাদ দিয়াছিলেন, তিনি আর ইহজগতে ছিলেন না। আমাদের বাটী চিররক্ষণশীল হইলেও স্বামী স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি প্রায়ই মিস্ তরু দত্ত ও অরু দত্তের উল্লেখ করিয়া আমাকে ইংরাজী শিক্ষা দিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহেই তখন 'কবিতা-হার' 'ভারত-কুসুম'[৩৩] রচিত হইয়াছিল। আমার পিতৃদেবও স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর 'পৃথিবী' ও 'দীপনির্ব্বাণ' পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক এমন সুন্দর লিখিতে পারিয়াছেন ইহা বিশেষ গৌরবের কথা। তিনি মেয়েদের বিজ্ঞান-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, এবং স্বয়ং আমাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি পুস্তক পড়াইয়াছিলেন। আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রেরও চর্চ্চা করিতাম। মনে পড়ে, আমার সংস্কৃত অধ্যাপকের জ্যোতিষের পুঁথি কাড়িয়া রাখিতাম। এ বিষয়ে আমার আগ্রহ দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "তারাই আবার (অর্থাৎ খনা প্রভৃতি) ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে।" কিন্তু মেয়েদের জ্যোতিষ-শিক্ষাসম্বন্ধে তাঁহার মত ছিল না। তাঁহার ধারণা ছিল, জ্যোতিষী নির্ব্বংশ হয়; এবং আশ্চর্য্যের কথা, তিনি বহুপুত্রক হইয়াও পরে নিঃসন্তান হইয়াছিলেন।

তারপর বহুদিন পরে, সিমুলিয়ায় আমার পিতৃভবনে সেই "পৃথিবী" ও

"দীপনির্ব্বাণ" রচয়িত্রীর সহিত যেদিন আমার প্রথম চাক্ষুষ মিলন হয়, সেদিন আমার স্নেহময় পিতৃদেবও পরলোকে। অদৃষ্টের পরিহাস এমনি নিষ্ঠুর!

আমাদের মহিলা-সমাজে নূতন সৃষ্টি এই "সখি-সমিতির" প্রস্তাব ভারতীতে বাহির হয়। সেই আহ্বান-সূত্রে আমাদের প্রথম পরিচয়। আমি উক্ত প্রস্তাব পাঠ করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখি। লিপি-দূতীর সে কি আনাগোনা! তখনকার লিখিত পত্রের একখানি পত্রের কয়েক ছত্র এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :— "আপনি লিখিয়াছেন 'আমাদের শিক্ষা পুরুষদের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তাঁহাদের ইচ্ছা-ব্যতিরেকে আমাদের কিছুই করিবার যো নাই।' ইহা সত্য। তবে তাঁহারা কখনো আমাদের সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষার আবশ্যক বুঝিবেন কি না তাহা জানি না। পুরুষেরা আমাদের যতটুকু শিক্ষা আবশ্যক বিবেচনা করেন, তাহা আমরা পাইয়াছি, অর্থাৎ ধোবার বাড়ীর ফর্দ্দ মিলানো, আর কায়-ক্লেশে একখানা পত্র লিখিতে পারা। আমার মনে হইতেছে, একজন লেখক তাঁহার প্রবন্ধে শিক্ষা-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, 'বাহিরে কোম্‌টী, মিল্‌, স্পেন্‌সর লইয়া জ্বালাতন, আবার ঘরেও তাই।' ইহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন, অধিক বলিবার আবশ্যক কি ?"

এখন যে সখি-সমিতি উপলক্ষে আমাদের মিলন হয়, তাহার কথা কিছু বলা আবশ্যক। এই সখি-সমিতি তিনি কিরূপ উৎসাহ পরিশ্রম ও যত্নে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা মহিলামাত্রেই অবগত আছেন। সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার প্রচার-কল্পেই এই মিলন-সমিতির সৃষ্টি। অসূর্য্যম্পশ্যা অবরুদ্ধা হিন্দু মহিলাদের মধ্যে ইহা এক বিশুদ্ধ 'নরোজা'র দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিল। এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ তাঁহারা আর কখনো ইতিপূর্ব্বে উপভোগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না! "রমণীতে বেচে রমণীতে কেনে লেগেছে রমণী রূপের হাট।"

আমার মনে আছে, বেথুনে প্রথম উদ্‌ঘাটিত শিল্প-মেলায় যেদিন মহিলাগণ কর্ত্তৃক মায়ার খেলার অভিনয় হয় এবং মেয়েরা পুরুষদের মত সম্মুখে গ্যালারিতে বসিয়া সে অভিনয় দর্শন করেন, সে কি এক নূতন আমোদ সকলে অনুভব করিয়াছিলেন! মনে আছে, আমারই পার্শ্বোপবিষ্টা একটী মেয়ে বলিয়াছিলেন, "এঁরা যদি সকলে চরিত্রবতী হন, তাহা হইলে এরূপ সুচারু অভিনয়-ক্ষমতা বিশেষ প্রশংসা ও বাহাদুরির বিষয়!" হায়, হায়, যে দেশে মহিলাদের মধ্যে চিত্রকলা, সঙ্গীত ও নৃত্য স্ত্রীশিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ ছিল, যে দেশের সতী বেহুলা ইন্দ্রসভায় নৃত্যগীত করিয়া মৃত পতির জীবন ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন, এখন কোন নারীকে কলা-কুশলা দেখিলে, সেই দেশের মহিলাদেরই এইরূপ মনে হয়! মনে আছে, সখি-সমিতির এই প্রথম সম্পাদিকার প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া আমরা কয় মায়ে-ঝীয়ে স্বহস্ত-নির্ম্মিত নানাবিধ বিচিত্র শিল্প-সম্ভার শিল্পমেলার প্রদর্শনীতে পাঠাইতাম। আজ

সে দিনও নাই, সে উৎসাহও নাই!

তারপর যখন পত্র-ব্যবহাবের মধ্য হইতে 'আপনি' 'আপনার' প্রভৃতি উঠিয়া গেল, যখন

রচয়তি শয়নং
সচকিত নয়নং

পশ্যতি তবপন্থানং-এর অবস্থা, তখন গলির ভিতব পাল্কীর শব্দ হইলেই মনে হইত:

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে!

পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া কতদিন নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে উভয়ে উভয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদের প্রেমের অভিধানে 'আদব-কায়দা' বলিযা কোন কথা ছিল না। আমাদের এই প্রণয়াভিসারকে শ্রীমতীর অভিসাব হইতে কিছুতেই ছোট বলিতে পাবি না। কতদিন আষাঢ়ের সেই ঘনঘোর, সেই মেঘ-আঁধিয়ার, সেই মৃদু বর্ষণ, সেই কনক নিকষ বিদ্যুৎ দীপ্তি আমাদের এই অভিসারকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে! বাস্তবিক টিপি টিপি মেঘান্ধকারে স্নিগ্ধ দিবস দেখিলেই উভযের হৃদয যে উভয়কে চাহিত, তাহা একদিনকার একটী ঘটনায প্রমাণিত হইয়া গিয়াছিল। সেদিন মেঘ-মেদুর দিবসে উভয়েই উভয়ের সন্ধানে বাহির হইযাছি, শেষে পথে পথে সাক্ষাৎ।

দুঁহু লাগি দুঁহু জনে বাহিরায় পন্থ।
জনু চাঁদ লাগি ফিরে রাহু, রাহু লাগি চন্দ॥

আমরা সেকালের; সুতরাং 'পাতান' রোগের হাত এড়াইতে পারি নাই। এই মিলন-সূত্রে আমরা "মিলন" পাতাইযাছিলাম।

তারপর আর একদিনকার কথা। তিনি তখন তাঁর পিতৃদেবের শুশ্রূষার্থে পিতৃগৃহে বাস করিতেছিলেন। সেই সময় আমি একদিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি 'টডের' রাজস্থান পড়িতেছেন। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বইখানি মুড়িয়া ফেলিলেন। সেদিনের কথা ভুলিবার নয়। সে কি দামিনীচমক, কি হাওয়ার দমক, কি ভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন, কি মুষলধারে বৃষ্টি! আমরা দুই জনেও দারুণ গল্পে নিমগ্না হইয়া গিয়াছিলাম। কখন্ যে আমার স্খলিত-কবরী লোহার কাঁটাদুটী তাঁহার শয্যায় পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা কিছুই টের পাই নাই। পরদিন কাঁটাদুটী সমেত এই মধুময়ী পত্রিকাখানি পাই,

অধরে মোহন হাসি নয়নে অমৃত ভাসে,
বিরহ জাগাতে শুধু মিলন পরাণে আসে!
কইরে মিলন কোথা, সে কি হেথা আছে আর?

রাখিয়া গিয়াছে শুধু গরল-পরশ তার!
ফুলটি সে দিয়ে গেছে প্রভাতের আলো নিয়ে;
হাসি যত নিয়ে গেছে, অশ্রুজল গেছে দিয়ে।
সন্ধ্যা করে দিয়ে গেছে, নিয়ে গেছে সন্ধ্যা তারা;
আঁধার পড়িয়া আছে সুষমা হইয়া হারা।
ফুলটী সে নিয়ে গেছে, ফেলে গেছে কাঁটাদুটি,
বিরহ কাঁদিয়া সারা নয়ন মেলিয়ে উঠি।

মনে পড়ে, উত্তরে লিখিয়াছিলাম—

দূর হতে কাছে আনা স্বভাব আমার।
ফুরাইয়া যায় কাজ মিশে গেলে দুটি।
জগৎ রয়েছে দূরে হইতে আমার—
আনিতে পরাণে তায় করি ছুটাছুটি।
প্রেমের জগতে আমি মধ্য-আকর্ষণ;
বিরহ রূপেতে আমি সম্পূর্ণ মিলন।

১৩০৩ সালে মৎ প্রণীত 'শিখা' প্রকাশিত হয়। সে গ্রন্থ আমি 'মিলন'-কেই উপহার দিই।[৩৪] তাহাতে আমাদের সুমধুর সম্বন্ধের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আজ আবার যুগান্ত পরে নূতন করিয়া ভারতীর পত্রে উপহার দিলাম।

সখি,

বদ্ধ মুকুলের মাঝে সুরভির মত
অবরুদ্ধ প্রেমরাশি হৃদে করে বাস;—
কি অভিশম্পাতে কার জানিনাক তাহা,
বাহিরে ফোটে না কভু ক্ষুদ্র এক শ্বাস।
বিরহের কারাগারে বটে বাস করে,
নিশিদিন চেয়ে তবু মিলনের পানে—
কে করে বন্ধন মুক্তি, কে ফুটাবে তারে—
নির্দ্দয় মিলন সেত শত ব্যবধানে।

কিবা দেখ যদি ফেলে সূত্র তল নাহি পাবে কুত্র
এ হৃদয়ে অকুল সলিলে ;

বিরহের পাশাপাশি, মগ্ন হেথা প্রেমরাশি
তন্দ্রামগ্ন গভীর অতলে ;

অর্ণব মন্থন করে পার যদি নিও তারে
পূত সেই একবিন্দু সুধা ;

কিন্তু, বিরহ গরল আছে তাই ভয় হয় পাছে
যদি তোর নাহি মিটে ক্ষুধা !

ওয়ালটেয়ারে সুদীর্ঘ প্রবাস যাপনের সময় যতদিন না তেলেগু ভাষার সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম, ততদিন সেখানকার লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে বিশেষ কষ্ট হইত। সেই সময়ে আমি যে পত্রখানি তাঁহাকে লিখিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। আশা করি, ইহাতে সহৃদয় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না।

ভাবিতাম ভাষার দুয়ারে হয় সদা চিত্ত-বিনিময়,
ঐ দূতী হয়ে অগ্রসর মাঝে থেকে করে পরিচয় !
শুভক্ষণে কোন সুপ্রভাতে
ঘটেছে যা, তোমায় আমায় ;—
মনে পড়ে সে দিনের কথা
দুই যুগ পূর্ণ হলো প্রায় !
লিপি দূতী করে আনাগোনা
দুটি হৃদি করিল বন্ধন,
দেখিবার আগেই দোঁহার
ঘটাইল অপূর্ব্ব মিলন।
কুসুমের পরাগ যেমন
সমীরণে হইয়া বাহিত,
ঘটায়ে ফুলের পরিণয়
দূরে হতে করে সম্মিলিত।

বসে এই সুদূর প্রবাসে
স্মরি সেই ভাষার প্রভাব,
মূক যেথা সুনিপুণ দূতী
নিত্য সেথা প্রেমের অভাব।

এমন রাশি রাশি ছিল। মধুর যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও আজ—কাল সাগরে অন্তর্হিত হইয়াছে। ভারতীতে আমার 'গ্রাম্য ছবি' নামে কবিতা পাঠাইয়া ভাবিয়াছিলাম, ভারতী-সম্পাদিকা কখনই সেটি মনোনীত করিবেন না। কিন্তু খুব আদরের সহিতই তাহা ভারতীতে গৃহীত হইয়াছিল।[৩৫] শ্রদ্ধাস্পদ রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছিলেন, "ভারতীতে প্রকাশিত 'গ্রাম্য ছবি' পাঠ করিয়াই আমি তপোবন লিখিয়াছি।" এ-সকল কথা আমি সম্পাদিকার পত্রেই অবগত হই। কতরকমে তিনি যে আমায় উৎসাহ দিয়াছেন, তাহা বলিবার নয়। আমাদের ভারতীর মাসিক সমালোচনা পত্রমধ্যেই হইত। সে সব লিপির বহর-ই বা কত! আমি স্বামীকে যে-সকল চিঠি লিখিতাম, তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া তাঁহার এক বন্ধু কতকগুলি পত্র 'জনৈক হিন্দুমহিলার পত্রাবলী'[৩৬] নামে ছাপাইয়া দেন। তারপর মৎপ্রণীত 'কবিতাহার', 'ভারতকুসুম'ও জনৈক হিন্দুমহিলা প্রণীত বলিয়া প্রকাশিত হয়। ইংরাজী সাময়িকপত্রে "কবিতা-হারে"র সমালোচনা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী মেরী কার্পেন্টার[৩৭] এই "জনৈক"-এর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছিলেন। আমার এই সাহিত্যিক রহস্য-অবগুণ্ঠন দুষ্টা ভারতী-সম্পাদিকাই উন্মুক্ত করিয়া দেন।

আমার এই ভারতীর স্মৃতিতে "বালক"-সম্পাদিকার প্রসঙ্গ অনিবার্য্য। শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনীর মত সরল, অমায়িক, আন্তরিকতাপূর্ণ উদার-হৃদয়, মধুর-প্রকৃতি রমণী আমি অল্পই দেখিয়াছি। মনের মত লোক পাইলে, এক মুহূর্ত্তের আলাপে একেবারে আপনার করিয়া লইতে তাঁহার জোড়া কেহ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমাদের বর্ত্তমান কৃত্রিম সভ্যতার ঢাক্-ঢাক্ গুড়্-গুড়্ ব্যবহার ইঁহার নিকট মোটেই আমল পায় না। ইঁহার সুমধুর অথচ সপ্রতিভ তৎপরতায় সঙ্কোচ সহজেই দূর হয়। ইঁহার ব্যবহারের গুণে এতই মুগ্ধ হইয়া পড়িতে হয় যে ইঁহাকে অদেয় বা অস্বীকার করিবার কিছুই থাকে না। এই সম্পর্কে বোধ হয় দু-একটি ঘটনার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মিলনের কাসিয়াবাগানের বাটীতে প্রায় মাসে মাসেই মিলন-সমিতির বা সখি-সমিতির অধিবেশন হইত। ভদ্রমহিলাগণের সম্মিলন ও কথাবার্ত্তার মধ্যে গল্পচ্ছলে সাহিত্য-চর্চ্চা সামাজিক প্রসঙ্গ প্রভৃতি ও সেই সঙ্গে গীত-বাদ্য এবং জলযোগের আয়োজন থাকিত। আমি সেদিন কাসিয়াবাগানে সখি-সমিতিতে

গিয়াছিলাম। কখনো পরিচ্ছদে আমি 'সেফ্‌টী' ব্যবহার করিতাম না। একখানি থান ও তদুপরি একখানি মোটা চাদর ব্যবহার করিতাম। মনে পড়ে, সেদিন মাথায় কাপড় টানিতে চুল খসিয়া গিয়াছিল ; চুল বাঁধিতে চাদর খসিয়া যাইতেছিল ; আমি তাহাতে একটু সন্ত্রস্তা হইয়া পড়িতেছি দেখিয়া মাননীয়া শ্রীমতী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তাড়াতাড়ি আসিয়া নিজের কবরী হইতে কাঁটা খুলিয়া আমার চুলগুলি আঁটিয়া ও চাদর কাপড় প্রভৃতি যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়া কিরূপে আমার লজ্জারক্ষা করিয়াছিলেন ! এই মেজবধূ ঠাকুরাণীর সরলতা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

আর একদিনের কথা। সেদিন অপরাহ্নে আমি তাঁহার পার্কষ্ট্রীটের বাটীতে গিয়াছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার ফটো আছে কিং না ?" আমি 'না' বলাতে তিনি বলিলেন, "আপনার একখানা ফটো থাকা খুব দরকার।" বলিতে বলিতে বলিলেন, "একটু বেড়াতে যাবেন ? দেখি হয় কি না, পাঁচটাও বাজে।" আমি ভালরূপে কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিতে না করিতেই আমাকে লইয়া একেবারে ফটোগ্রাফের দোকানে উপস্থিত হইলেন, এবং আমার ফটো তোলাইলেন। আমার আপত্তি করিবার অবসর অবধি মিলিল না। তারপর সাহেব বোধ হয় যখন বলিলেন, আমি বড় গম্ভীর হইয়া আছি, তখন তিনি সহসা আমার সম্মুখে আসিয়া এমনভাবে 'একটু হাসুন না' বলিলেন যে, আমি না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই। আমার পরিণত বয়সের যে ছবি মাসিকপত্রিকাদিতে বাহির হইয়াছে, তাহা এই ফটোরই প্রতিলিপি।

আমার সেকালের বালিকার শিক্ষাকে সম্পূর্ণতর করিবার দিকে তাঁহার যে আগ্রহ দেখিয়াছি তাহাতে তাঁহার নিকট আমি ঋণী ও তাঁহার জ্ঞানদা নামের সার্থকতারও পরিচয় পাইয়াছি। আমার চিত্রকলানুরাগ বৃদ্ধির মূলেও তিনি। অপরাধের মধ্যে পড়ার উপর সেক্সপীয়রের একখানি ও রবির একখানি ছবি বুনিয়া যথাক্রমে তাঁহাকে ও রবির স্ত্রীকে উপহার দি। পশমে তোলার হিসাবে উক্ত চিত্রিত ব্যক্তিদের সৌসাদৃশ্য না কি একটু বিশিষ্টভাবেই ধরা দিয়াছিল ; এই উপলক্ষে মেজবধূ ঠাকুরাণীর উৎসাহ আবার নূতন করিয়া তাঁহাকে পাইয়া বসিল এবং সে উৎসাহ সংক্রামক হইয়া আমাকেও আক্রমণ করে। মেজবধূ ঠাকুরাণী রহস্যেও অতুলনীয়া। আমাকে গান শুনাইবার জন্য আজিকার স্যর রবীন্দ্রনাথকে তিনি যে একদিন একটী পয়সা পেলা দিয়াছিলেন, তাহাও এই মধুর স্মৃতির হিসাবে টোকা আছে।

আমার তখনকার সঙ্কোচপূর্ণ ও অবরোধশাসিত সঙ্কীর্ণ ব্যবহারে হয়ত কতদিন তাঁহার মনে অন্যায় ব্যথা দিয়াছি, কিন্তু তিনি বয়োজ্যেষ্ঠা, স্নেহময়ী ভগ্নীর মত তাহা সহ্য করিয়াছেন। ইঁহার প্রসঙ্গে লিখিত আমার কবিতাও আছে।

আমার পুত্র শ্রীমান প্রকাশচন্দ্রের বাঙ্গালা সাহিত্যে হাতে-খড়িও তাঁহার "মিলন-

মা''র প্রদত্ত এবং ভারতীর পত্রেই তিনি প্রথম মক্স করিতে শিখেন। এখন ইংরাজি বাঙ্গালা পত্রিকাদি সম্পাদন-কার্য্যে প্রকাশ সিদ্ধহস্ত; কিন্তু সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যের গুরুত্ব ও দায়িত্বে 'মিলনই' তাঁকে প্রথম দীক্ষিত করেন। পাহাড়ে যাইবার সময় একবার ভারতীর সমস্ত ভার, আমার বারণ সত্ত্বেও, তিনি উঁহার হাতে দিয়া যান। প্রকাশের বয়স তখন বিংশতি বর্ষ মাত্র। ভারতী-সম্পাদিকার গড়িয়া তুলিবার ক্ষমতা আশ্চর্য্য এবং এ বিষয়ে তাঁহার ভরসা ও আত্মবিশ্বাস দুঃসাহসিক রকমের হইলেও তাঁহাকে কখনও নৈরাশ্য ভোগ করিতে দেখি নাই।

ইংরাজীতে না কি প্রবচন আছে, "ঘনিষ্ঠতা ঘৃণার প্রসূতি", কিন্তু আমাদের উভয়ের এ ঘনিষ্ঠতায় এ যাবৎ কেবল শ্রদ্ধা, সম্মান ও সহানুভূতিই দেখিয়া আসিয়াছি, ইংরাজী ১৮৮২ সালে আমার স্বামীর যত্নে ও উদ্যোগে 'রেইস এণ্ড রায়েৎ' পত্রিকা আমাদের হাতে আসে ও স্বনাম-ধন্য পূজ্যপাদ ৺শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় তাহা প্রকাশিত হইতে থাকে।[৩৮] মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের সহিত আমাদের পরিবারের নিবিড় আত্মীয়তা ছিল। তিনি আমাদের বৈঠক-খানা বাড়ীতেই থাকিতেন এবং ত্রিপুরার মন্ত্রিত্বপদ ত্যাগের পর হইতে তাঁহার দেহান্ত পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকা-পরিচালনে নিযুক্ত ছিলেন। সুশিক্ষা এবং স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী থাকিলেও তিনি বিশেষ রক্ষণশীল এবং তৎকালীন হঠ-প্রকৃতির সংস্কারের প্রতিকূল ছিলেন; এবং ঠাকুর-পরিবারে তখন যে সকল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাদের সকলগুলির তিনি অনুমোদন করিতে পারেন নাই।

সেও আজ অনেকদিনের কথা। আমার স্বামী তখন স্বর্গীয়। আমার মনে আছে, কি এক প্রসঙ্গে "বঙ্গবাসী" পত্রিকা 'ভারতী' সম্পাদিকাকে কুৎসিত ভাষায় গালি দেন। উক্ত লেখার প্রতি আমি মুখোপাধ্যায়-মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে "বঙ্গবাসী"কে পুনঃপুনঃ সেই অসাধারণ প্রতিভাশালী পুরুষের সুনিপুণ লেখনীর তাড়না ভোগ করিতে হইয়াছিল। সে লেখার মধ্যে ভারতী সম্পাদিকার প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধার যে নিদর্শন বিদ্যমান তাহা ভুল করিবার নহে। মুখোপাধ্যায়-মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলে রেইসের সম্পাদকীয় ভার আমার ভাসুর পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের হাতে পড়ে। "মিলনে"র "ভারতী"-ত্যাগ উপলক্ষে 'রেইসে' (১৫ই মে ১৯১৫) যে প্রবন্ধ বাহির হয়, বাহুল্য-ভয় সত্ত্বেও তাহা উদ্ধৃত করিলাম। প্রবন্ধের মধ্যে বাঙ্গালা কবিতাও একটি ছিল।

A Journalistic Retirement.

The retirement of Mrs. Ghosal, better known by her maiden name of Srimati Swarna Kumari Devi, from the editorship of BHARATI is a distinct

loss to vernacular journalism. With the traditions of a cultured family, and of varied culture and accomplishment herself, she was eminently fitted by her training, temper and acquirements to hold the post she has hitherto so nobly filled. Besides editing the journal which was started in her father's family with her eldest brother as the first editor, she has contributed largely to Bengali literature; and those contributions, of no mean order, have considerably helped to enrich the language. And she has made the BHARATI what it is on this its fortieth year. How far she has succeeded in gaining one of her objects, namely, the moulding of men of letters it is, as she herself observes, for posterity to say. In the domain of letters many owe her allegiance, and those that do, know that it is a pleasure to do so, and are proud of it. Her encouragement, though lost on many, has been cosmic generally and has made many young men talk to literature as a profession and some of them successfully. The present editor of the BHARATI to whom she makes over charge may be cited as an instance. The editor shares with a friend the burden of responsibility. Of considerable go and regular business habits, she possesses in abundance all the womanly virtues which distinguished her class in the happy by-gone days and are now treasured up in the museum of memories. She is, to use a pleasant line of Locksley Hall Sixty Years After, 'Feminine to her inmost heart and feminine to her tender feet.' That is the impression, one who has known her intimately, carries of her. Her manners have a dignity of simplicity, peculiarly striking and her conversation a charm peculiarly free from pedantry. Her kindliness is as genuine as motherliness and her hospitality, homely joys. The words of adieu with which she takes leave of her readers and colleagues are as touching as they are true.

"When I took up the sacred task of editing, I did not persuade myself to do so with a view to results; nor did I calculate its profit and loss. It was the pleasure of work which encouraged and inspired me to action. Those days of inspiration and encouragement are now ended and I feel lonely and helpless. My done-up body and mind now earnestly seek cessation."

Here is an appreciation of her by a young graduate admirer which has come to our hands and which we publish with pleasuse. The verses are the maiden attempt of the young writer and are therefore the more deserving of encouragement.

পূজনীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রতি

কেন ভাব সাঙ্গ দেবী, জীবনের কাজ ?
কেন বৃথা ত্বরা এত ? রয়েছে ত বেলা।
এখনো রয়েছে বহু যাত্রী হতে পার ;—
কিসে হবে বিনা তব ভারতীর ভেলা ?
এখনো নীবার পড়ে যজ্ঞভূমি পরে ;
এখনো জ্বলিছে হের বহ্নি সুমঙ্গল,
কে বল তোমার মত হোত্রী মাতঃ আর
রাখিতে সে পুণ্য-বহ্নি চির-সমুজ্জ্বল ?
ভারতী-পূজার কল্পে নানা উপচারে
সাজালে যতনে যেই নৈবেদ্যের থালা ;
সে নির্ম্মাল্য কেবা লবে পাতিয়া অঞ্জলি ;
কাহারে শোভিবে সেই নিবেদিত মালা।
পারিবে কি তোমা-সম যুগল দায়াদ
অক্ষুণ্ণ রাখিতে কীর্ত্তি প্রাচীন মন্দিরে ?
হারায় না যেন কভু বিবেক মহিমা ;
বরিষ আশীষ-ধারা তাহাদের শিরে।
বিদায়ের কালে দেবি, নমি শতবার।
মাঝে মাঝে দিবে দেখা সেই আশা চিতে।
নাশিয়া তমসা-জাল বঙ্গের অঙ্গনে
করিও প্রদীপ্ত ভূমি মেঘান্তর হতে।

কবিতাটি সুবিখ্যাত সাহিত্যিক ৺কাশীপ্রসাদ ঘোষের বংশীয় ও আমার আত্মীয় শ্রীমান সুশীলকুমারের লেখা।

সুবিখ্যাত সাবিত্রী লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক এবং "আলোচনা"র অন্যতম সম্পাদক আমার দেবর শ্রীমান গোবিন্দলাল দত্তের সহিত ঠাকুর-পরিবারের অনেকের আলাপ ছিল[৩৯] এবং শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের সহিতও সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সাবিত্রী লাইব্রেরীর বিভিন্ন বাৎসরিক অধিবেশনে, মনে পড়ে, পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রবাবুর

"সামাজিক রোগের কবিরাজী চিকিৎসা" ও রবীন্দ্রের "অকালকুষ্মাণ্ড" প্রভৃতি রচনা পঠিত হইয়াছিল।[৪৩] কিন্তু তখন জোড়াসাঁকোর মেয়ে-পরিবারের সহিত আমাদের মেযে-পরিবারেব পরিচয় ছিল না। গোবিন্দলাল অবরোধের মধ্যে শাস্ত্র-সম্মত স্ত্রী-শিক্ষাব পাণ্ডা ছিলেন, এবং সাবিত্রী লাইব্রেরীকে উপলক্ষ করিয়া, নারী-রচনা পুরস্কৃত করিযা উৎসাহিত করিযাছেন। কঠোর রক্ষণশীল দলের "সেনানায়ক" উপাধি ও তদুপযোগী শিরোপা আমি তাঁহাকে অনেকদিন পূর্ব্বেই প্রদান করিয়াছিলাম এবং কোন দিন ভাবি নাই অবরোধের বাহিরে তিনি গুণের আদর্শ দেখিতে পাইবেন। কিন্তু সত্যের খাতিরে বলিতে হইতেছে যে আমার সহিত ভারতী-সম্পাদিকার আলাপের সঙ্গে সঙ্গে গোবিন্দলাল ক্রমে তাঁহার গুণ-মুগ্ধ ভক্ত হইয়া উঠেন এবং আমাদের এই মিলন-যজ্ঞের অন্যতম উত্তবসাধক ছিলেন।

ভারতী সম্পাদিকার প্রতি আমাদের বৃহৎ পরিবাবের পারিপার্শ্বিক সাহিত্য-অনুরাগী বন্ধুবৃন্দের এই যে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, বলা বাহুল্য, তাহা তাঁহার সহিত আমার এই ঘনিষ্ঠ পরিচযেরই ফল। তাই বলিতেছিলাম, আমরা নিতান্ত বাঙ্গালী, আমাদেব এই ঘনিষ্ঠতা সম্বন্ধে ইংরাজি প্রবচন সার্থক হয নাই। চল্লিশ বৎসরের সিকির সিকি কাল মাত্র "জাহ্নবীর" সম্পাদকতা[৪১] করিয়া বুঝিযাছি, কত ধানে কত চাল! তাই আজ ভারতী সম্পাদিকার অসাধারণ ও অক্লান্ত অধ্যবসায়কে অভিবাদন করিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

একে সেকালের কথা, তায় বুড়ার লেখা; সুতরাং লিখিবার আছে অনেক। একালের নাতি-নাতিনীরা যে আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতে চাহেন, এইটুকুই বৃদ্ধের গৌরব, সান্ত্বনা ও আনন্দ।

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

ভারতী ও ভারতী-সম্পাদিকা

নিস্তারিণী দেবী

সে আজ বহুদিনের কথা—প্রায় ত্রিশ বৎসর—যেদিন গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল পবিত্র প্রয়াগধামে আমাদের দুই বন্ধুর সম্মিলন হয়। তখনকার দিনে সাহিত্যক্ষেত্রে এখনকার মত এত বঙ্গরমণীর আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং সে সময়ে একজন বঙ্গরমণী মাসিক-পত্রের সম্পাদক—এই সংবাদেই মন আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল। শুধু আনন্দ নয়,—বিস্ময়ও ছিল;—কোন্‌টা বেশী তাহা বলা শক্ত। ভারতীর ভূতপূর্ব্ব-সম্পাদিকা মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বামী তখন এলাহাবাদে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করিতেন, তদুপলক্ষে তিনিও কিছুদিন প্রবাসের সুখ উপভোগ করিতে আসিয়াছিলেন।

এই বিদুষী মহিলাটিকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বহুদিন হইতে মনে জাগিতেছিল কিন্তু সাক্ষাৎ হয় নাই। হঠাৎ একদিন দৈবযোগে, ৺পূজনীয় পিতৃদেবের বন্ধুভবনে আমরা উভয়েই নিমন্ত্রিত হইলাম। ইঁহার বহুপূর্ব্ব হইতেই আমার পিতা ও ভ্রাতার সহিত ইঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত জানকীনাথ ঘোষাল মহাশয়ের[৪২] যথেষ্ট আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল, কিন্তু আমার ভাগ্যে দেবী-দর্শন ঘটে নাই। জানি না সে কোন্ শুভলগ্ন ছিল, পরস্পরকে দেখিবামাত্র অচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে গ্রথিত হইলাম। সেই প্রথম-দর্শনে মনে যে কি আনন্দ হইয়াছিল এবং নিজেকে যে কত ধন্য মানিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সাক্ষাতে সে মনোভাব বিন্দুমাত্র প্রকাশ করিতে পারি নাই;—মনের কথা মনেই থাকিয়া গিয়াছিল। যেমন বিদ্যার প্রভা, তেমনি রূপেরও প্রভা;—রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—একেবারে মূর্ত্তিমতী। এমন রূপ, এমন গুণ দেখিলে কে না মুগ্ধ হয়? আমি ভক্তিনম্র হৃদয়ে তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর পদে বরণ করিয়া লইলাম। এই মিলনের প্রধান দূতী হইল আমাদের সাহিত্যালোচনা; তদ্দ্বারা আমরা ক্রমশ নিকটতর হইতে নিকটতম হইয়া গেলাম। ভারতীর পত্রে ইতিপূর্ব্বেই ইঁহার রচনার রস-মাধুর্য্য উপভোগ করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলাম; এখন হইতে ভারতীরও ভক্ত হইয়া পড়িলাম।

সেকালে ভারতীর মত পত্রিকা বড় বেশি ছিল না; এবং ভারতীর স্থান মাসিক সাহিত্য-জগতে প্রধান ছিল। মহিলাদ্বারা সাহিত্য-রচনা দূরে থাক, তখন মহিলা-পাঠিকার সংখ্যা বিরল ছিল বলিলেও চলে। এমনি সময়ে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী

দেবী ভারতীব সম্পাদকীয আসন গ্রহণ করিলেন। বাঙ্গালা মাসিক-পত্রের সম্পাদক একজন বাঙ্গালী-মহিলা হইতে পারেন—এ কথা তখন বোধ হয কেহ কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না। সেই সময আমার মনে হইত, একদিকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজ্যশাসনদণ্ড হাতে লইয়া যেমন জগতে রমণীর গৌরববর্দ্ধন করিতেছেন, আর-একদিকে আমাদের ক্ষুদ্র বাংলা দেশের সাহিত্য-শাসন-দণ্ড হাতে লইয়া স্বর্ণকুমারী আমাদের বঙ্গবমণীর মুখ উজ্জ্বল করিতেছেন।

তখনকাব সেই শিশু-সাহিত্য স্বর্ণকুমারীর মত একটি স্নেহমযীর স্নেহ ও যত্নের অপেক্ষায় ছিল। তখন আমাদের দেশের যাঁহারা সাহিত্যগুরু ছিলেন তাঁহারাও ত অনেক মাসিকপত্র চালাইযাছেন কিন্তু বাঁচাইয়া রাখিতে পারেন নাই। ভারতী যে আজ এত-বডটি হইযাছে তাহার কারণ, সে যে অনেকদিন ধরিয়া মাতৃস্নেহ পাইযাছে। এত বাধা-বিপদের মধ্যেও যে ভারতী দীর্ঘজীবি হইয়াছে সে ত শ্রীমতী স্বর্ণকুমারীর অপরিসীম যত্ন ও তাঁহার পরিপাটীরূপে পবিচালন-ক্ষমতার ফলে। যখনই ভারতী যায়-যায় হইয়াছে, তখনই তিনি তাহাকে কোলে লইযা তার শুশ্রূষা করিয়াছেন।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিযাছেন। সে প্রতিভা যে অন্তঃপুরের অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায় নাই ইহা আমাদের সৌভাগ্য। কথায বলে আগুন কখনো ছাই চাপা থাকে না। আব কিছু না করিয়া তিনি যদি কেবলই ভারতীর সম্পাদকতা করিতেন তাহা হইলেও তাঁহাব কৃতিত্ব বড় কম হইত না। শুধু এদেশে কেন, দেশ-দেশান্তরেও তাঁহার মত মহিলা-সম্পাদিকা কয়জন আছেন? তিনি যখন সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন তখন বিদেশেও নাম-করা কোন মহিলা-সম্পাদিকার কথা ত শুনি নাই। এ কথা যাক্। বঙ্গসাহিত্যকে যে তিনি বহুমূল্য রত্নরাজি দান করিযাছেন, তাহাই বা কে অস্বীকার করিবে? কবিতা বল, গল্প বল, উপন্যাস বল—এমন কি বিজ্ঞান-আলোচনা, কোনটা তিনি বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে দান করেন নাই? এবং গুণে কোনটাই বা কম? সেকালে ত দেখিয়াছি ঘরে ঘরে তাঁহার উপন্যাস সানন্দে পঠিত হইতেছে। সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁহার সফলতাই তাঁহার পরবর্ত্তী লেখিকাদের উৎসাহিত করিয়াছে—ইহা ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি যে শুধু সাহিত্য-রচনার যশ-গৌরবেরই অধিকারিণী তাহা নহে—তিনি বঙ্গরমণীর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ-পথ উন্মুক্ত করিয়া দিযাছেন। তিনি সাহস করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে না নামিলে আর কোনো রমণী এ পথে আসিতেন কি না আমার সন্দেহ হয়! সেই জন্য বলি তিনি বাংলা দেশে রমণীজাতির আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সমস্ত বঙ্গনারীর পক্ষ হইতে আজ আমি তাই তাঁহাকে অভিনন্দন করিতেছি।

তাঁহার গ্রন্থাবলী সমালোচনা করিবার স্থান ইহা নয়। তবে এইটুকু বলিতেই হইবে যে তাঁহার রচনা যেমন সরস, তেমনি জীবন্ত—এ যেন পুরাতন হইতে চাহে না। ভাষায় এমন-একটি মাধুর্য্য আছে যে কালের দীর্ঘতাতেও তাহার নবীনতা ম্লান হয়

না। এরূপ ভাষার গুণ খুব কম লেখকেরই আছে— বিশেষত সেই যুগের লেখকদের, যখন স্বর্ণকুমারী লেখা আরম্ভ করেন। চরিত্র-চিত্রণে স্বর্ণকুমারীর আশ্চর্য্য ক্ষমতা; কিন্তু একটি বিশেষত্ব আছে তাঁর নারী-চরিত্র-রচনায়। তাঁহার রচিত নারীগুলি এক মহিমাময়ী দীপ্তিতে উজ্জ্বল। তাহারা রমণী বলিয়া যে ধূলি-অবনত, তাহা নহে; তাহাদের মধ্যে আত্মসম্মানের তেজ, নারীত্বের গর্ব্ব এবং অন্তরের একটি শক্তি আছে। তাহারা অন্ধবিশ্বাসের পথে চোখ বাঁধিয়া চলে না এবং বিপদের মুখে কেবলই হাহাকার করিয়া মরে না। তাঁহার অন্তরে নারীজাতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান আছে তাহারই প্রেরণায় তিনি আমাদের দেশের নারীজাতিকে একটি প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছেন। ইহা শক্তিমানের কাজ, স্বর্ণকুমারী সেই মহাশক্তির অধিকারিণী।

সম্প্রতি স্বর্ণকুমারীর যশ বঙ্গ ছাড়াইয়া সমুদ্র-পারে গিয়া পৌঁছিয়াছে—ইহাতে আমরা সকলেই আনন্দিত। তাঁহার কয়েকখানি উপন্যাসের অনুবাদ বিলাতে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছে। ইহাতে দেশে বিদেশে আমাদের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে।

আমরা শুনি, মেয়েরা লেখাপড়া শিখিলে উগ্র হইয়া উঠে—তাঁহাদের নারীত্বের কোমলতা মরিয়া যায়। স্বর্ণকুমারী এই উক্তির মূলে কুঠারাঘাত করিযাছেন। যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সেই জানে বিদ্যার প্রভায়, জ্ঞানের দীপ্তিতে তাঁহার নারীত্বটি আরো কেমন সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। শিক্ষাভিমানের লেশমাত্র তাঁহাতে নাই।

শিক্ষার মর্য্যাদা বুঝিয়াছেন বলিয়া স্বর্ণকুমারী চিরদিনই স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে পক্ষপাতিনী। কিসে স্ত্রী-সমাজ সর্ব্বপ্রকারে উন্নতিলাভ করিবে ইহাই তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা। এই উদ্দেশ্যে তিনি সখীসমিতি ও মহিলা-শিল্পমেলার প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উৎসবে যাঁহারা যোগদান করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন রমণীদের চিন্তা উন্নত করিবার, রুচি মার্জ্জিত করিবার ও বিমল আনন্দ দিবার আয়োজন তাহাতে কত ছিল। তিনি ধনী-কন্যা হইয়াও সকলশ্রেণীর রমণীর সহিত এমন সহাস্যমুখে মিশিতেন যে দেখিবামাত্র সকলে তাঁহার আপনার হইয়া যাইত। সেই সখীসমিতি ও মহিলা শিল্পমেলার উজ্জ্বল স্মৃতি এখনো অনেকের মনে জাজ্জ্বল্যমান আছে, সন্দেহ নাই!

স্বর্ণকুমারীর অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনা এখনো অব্যাহত। মনে হয় তাঁহার জীবনের একমাত্র আনন্দ এই সাহিত্যচর্চ্চা। এমন করিয়া সাহিত্যে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতে পারেন কয়জন? বাংলাভাষা অল্পদিনের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া আমরা অবাক হই, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি, এর মূলে ইঁহার মত কয়েকজন ভক্তের তপস্যা নিহিত আছে বলিয়াই এমনটি হইতে পারিয়াছে। বঙ্গভাষার ইতিহাসে স্বর্ণকুমারীর নাম স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত থাকিবে।

ভারতী চল্লিশ বৎসরে পড়িল—ইহা আমার কাছে বড়ই আনন্দের দিন। বিশেষ করিয়া এই জন্য আনন্দ যে, ইহা স্বর্ণকুমারীরই জয়-গান আজ বিঘোষিত করিতেছে। চিরদিন করুক ইহাই প্রার্থনা করি।

ভারতী, বৈশাখ ১৩২৩

স্বর্গীয়া বামাসুন্দরী দেবী

কামিনী রায়

সূচনা

বাঙ্গালা সাহিত্যেব উপন্যাস, নাটক, কাব্য প্রভৃতি বিভাগে আধুনিক যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে, কিন্তু জীবনচবিত বিভাগে তাদৃশ উন্নতি পরিলক্ষিত হয না। আজিকালি দুই-চারিজন কর্ম্মবীরের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই সকল গ্রন্থের সংখ্যা অতি অল্প। বিশেষতঃ এদেশের পুণ্যচরিতা নারীগণের জীবন-কথা প্রকাশিত হইতে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহাদের চরিত্রের প্রভাবে স্বামী বা পুত্র সমাজে বরেণ্য হইয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ ও অক্লান্ত সেবাপরায়ণতার কাহিনী লোকসমাজে অপরিজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। তাঁহাদেব জীবন-কথার উপাদান দূরের কথা, তাঁহাদের একখানি প্রতিকৃতি পাওয়াও অনেকস্থলে অসম্ভব হইযাছে। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীর ও সাহিত্যসেবকগণের জননীর ও সহধর্ম্মিণীব প্রতিকৃতি ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। অধুনাবিলুপ্ত 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' নামক মাসিকপত্রে কতকগুলি চিত্র প্রকাশিত হয়।

"নন্দকুমারের ফাঁসী", "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ", "অযোধ্যার বেগম" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া একদিন যিনি দেশে যুগান্তর আনিয়াছিলেন, সাহিত্যের সেই অকৃত্রিম অনুরাগী সেবক চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী সাধ্বী বামাসুন্দরী দেবীব একখানি প্রতিকৃতি সংগ্রহের মানসে যখন তাঁহার কন্যা 'আলো ও ছায়া'র বঙ্গবিশ্রুত কবি মাননীয়া শ্রীযুক্তা কামিনী বায়ের সহিত সাক্ষাৎ করি, তখন কথোপকথন প্রসঙ্গে অবগত হই যে তিনি আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশযের আদেশ অনুসারে তাঁহার জননীর শ্রাদ্ধবাসরে পড়িবার জন্য তাঁহার একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা লিখিয়াছেন। প্রবন্ধটি মুদ্রিত হয় নাই। তাহার কারণ এই, মাতৃবিয়োগের পরে সপ্তাহমধ্যে যখন উহা রচিত হয তখন রচয়িত্রীর মানসিক অবস্থা ভাল ছিল না,—তিনি তখন কেবল মাতৃবিয়োগে কাতর ছিলেন না, তাঁহার প্রাণাধিকা এক দুহিতা তখন সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় আক্রান্তা। সুতরাং তাঁহার মানসিক উদ্বেগের সীমা ছিল না। আচার্য্য শিবনাথের আদেশ কোনও মতে পালন করিবার জন্যই তিনি যথাসম্ভব দ্রুতভাবে এই রচনাটি শেষ করিয়াছিলেন। আমি প্রবন্ধটির পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া 'বিচিত্রা'য় উহা প্রকাশিত করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করি, কারণ উহাতে গতযুগের সমাজের রীতি-নীতির ও নারীজীবনের একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়—যাহা সচরাচর আমরা দেখিতে পাই না। আমার মনে হয়, দ্রুত রচনারও একটি গুণ আছে; বোধ হয় উহাতে ভাব ও ভাষার কৃত্রিমতা আসিতে পারে না, লেখকের আন্তরিকতা যেন বেশী ফুটিয়া উঠে। আমার এই ধারণা কতদূর সত্য পাঠকগণ শ্রদ্ধেয়া লেখিকার প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া স্বয়ং তাহার বিচার করিবেন।

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

আমি মনে করিতেছিলাম মাতৃদেবীর জীবনে ঘটনাবৈচিত্র্য নাই, অতি সংক্ষেপে তাঁহার আড়ম্বরহীন নীরব জীবনের কথা বিবৃত করিব। শ্রাদ্ধবাসরে স্বর্গগত আত্মার

গুণ স্মরণপূর্ব্বক তাঁহাকে শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে হয়, সে শ্রদ্ধা নীরবেও অর্পণ করা যায়। কিন্তু ভক্তিভাজন শাস্ত্রীমহাশয় বলিয়া পাঠাইলেন, যেন আমার মাতৃদেবীর জীবনের কথা একটু বিস্তারিত করিয়া লেখা হয়। বুঝিলাম এই জীবনখানা তাঁহার নিকট একটু বিচিত্র বোধ হইয়াছে বলিয়াই ঐরূপ অনুরোধ করিয়াছেন। পুরাতন হইতে নূতনে, কুসংস্কারের অন্ধকার হইতে নূতন জ্ঞানালোকে যাহাদিকে পথ খুঁজিয়া উঠিয়া পড়িয়া ব্যথা সহিয়া আসিতে হইয়াছে, তাহাদের জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলির মধ্যেও একটু বিচিত্রতা থাকে। সময়াভাবে রোগশোকের মধ্যে সব কথা বলা হইবে না; তবু শৈশব হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা স্মরণ হইল লিখিয়া জানাইলাম।

রবিবার—পূর্ব্বাহ্ন
২২শে আগষ্ট, ১৯১৫

বঙ্গাব্দ ১২৫৪ সনের চৈত্রমাসে, বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাসণ্ডা গ্রামে মাতৃদেবীর জন্ম হয়। আমাদের মাতামহ স্বর্গীয় চন্দ্রমোহন মুশ্রীব মহাশয় গ্রামের একজন মাতব্বর লোক ছিলেন। ধনী-দরিদ্র সকলে বিপদে-আপদে তাঁহার সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করিত। তিনি অতি স্নেহশীল ও সৌখীনপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার পত্নী শিবসুন্দরী দেবী অতিমাত্রায় আচারপরায়ণা এবং মৃতবৎসা ছিলেন। কয়েকটি সন্তান হারাইবার পর আমার মাতা বামাসুন্দরীর এবং পরে শ্যামা ও উমার জন্ম হয়। সে জন্য এই কন্যারা পিতামাতার অতিশয় যত্ন ও আদরে লালিত হইয়াছিলেন। (বাসণ্ডা গ্রামেই শৈশবে কন্যার অনাদরের কারণসূচক একটি ছড়া আমি শুনিয়া মুখস্থ করিয়াছিলাম; সেটি এই—মেয়ের নাম 'ফেলি'; পরে নিলেও গেলি যমে নিলেও গেলি।) বিশেষ, জ্যেষ্ঠা বামা। ইনি অতি সুদর্শনা ছিলেন; সেই জন্য অনেকেই ইঁহাকে পুত্রবধূ করিতে ইচ্ছুক হইতেন। আমার পিতামহদেব তাঁহার অশান্ত দুর্নমিত পুত্রটির জন্য এই কন্যাটি পাইতে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেকালে সে গ্রামে অর্থ লইয়া পুত্রের বিবাহ দিবার রীতি বোধ হয় ছিল না, কিন্তু কন্যাবিক্রয়ের প্রথা একটু ছিল। আবার অষ্টমবর্ষে কন্যাদান করিয়া পৃথিবীদানের পুণ্যফল লাভ হয়, নবমবর্ষে গৌরীদান হয়, এ সংস্কারও ছিল। অষ্টমবর্ষে পদার্পণ করিতে না করিতে মাতামহদেব কন্যাদান করিয়া পুণ্যার্জ্জন করিয়াছিলেন। আধুনিক হিসাবে আমার মাতার যখন সাত এবং পিতার দশ বৎসর বয়স, তখন তাঁহারা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

বালক স্বামী বালিকা বধূকে জননীর স্নেহভাগিনী মনে করিয়া যথেষ্ট ঈর্ষা করিতেন এবং সুযোগ পাইলে প্রহার করিতেও ছাড়িতেন না। পিত্রালয় শ্বশুরালয় একগ্রামে হইলেও শ্বশুরালয়েই বালিকার অধিকাংশ কাল কাটিয়াছে। কেবল পূজা-পর্ব্বাদি উপলক্ষে মাঝে-মাঝে পিতৃগৃহে গিয়া থাকিতে পাইতেন। শাশুড়ী তাঁহাকে

সন্তাননির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। কিন্তু এই স্নেহলাভ বেশীদিন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। তাঁহার সার্দ্ধ দশবৎসর বয়সে আমাদের পিতামহী দেবী সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করিলেন। সাড়ে-দশ বৎসরের বালিকার পক্ষে এক গৃহের গৃহিণী হওয়া অসম্ভব মনে করিয়া পিতামহদেব তাঁহার খুড়তাত ভ্রাতার সহিত একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকিতে লাগিলেন। উঁহার পরিবারে উঁহার পত্নী ও পুত্রকন্যা ব্যতীত আরও এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি উঁহার অগ্রজের বিধবা। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইলে পিতামহদেব তাঁহার পূর্ব্বোক্ত খুড়তাত ভাই ও তাঁহার অগ্রজকে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই ইঁহাদের অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও ইঁহার পুত্রকন্যাদিগকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। স্বাধীনচিন্তা, সত্যবাদিনী ও তেজস্বিনী পিতামহীদেবী নানাকারণে ইঁহাদিগের সহিত একত্র থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করিতেন না; মৃত্যুকালেও ইঙ্গিতে স্বামীকে ও পুত্রবধূকে তাহা জানাইয়া গিয়াছিলেন। পিতামহদেব যদি পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া পৃথক সংসারে থাকিতেন তাহা হইলে উত্তরকালে আমাদের জননীকে যে দুঃখদারিদ্র্য ও নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে তাহা হইতে তিনি রক্ষা পাইতেন।

বালিকা বধূ গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা ছিলেন। একবার শাশুড়ী পাড়া বেড়াইতে গিয়াছেন, ইতিমধ্যে তাঁহার জন্য রাঁধিয়া-বাড়িয়া আসন পাতিয়া তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। শাশুড়ী ফিরিয়া আসিয়া বিস্ময়ে ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া প্রতিবেশী সকলকে ডাকিয়া বধূর গুণপণা দেখাইতে লাগিলেন।

সাধারণ ঘরকন্না ছাড়া সেকালের যাহা শিল্পবিদ্যা তাহাও বালিকা বধূ শিখিয়াছিলেন। যেমন আলপনা দেওয়া, বিবাহের পীঁড়ি চিত্র-করা, শিকা তৈয়ার করা, ঝাঁপি বোনা, মাটির উনান সরা হাঁড়ী তৈয়ার করা, ক্ষীরের ও আমস্বত্ত্বের ছাঁচ খোদাই করা, পিঠা পরমান্নাদি রন্ধন করা।

শৈশবে বা বাল্যে কেহ তাঁহাকে লিখিতে-পড়িতে শিখায় নাই। সাধারণ গৃহস্থদের পরিবারে স্ত্রীলোকের লিখন-পঠন শিক্ষা নিষিদ্ধই ছিল। কৈশোরে অথবা আরও পরে মাতৃদেবী নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় একটু লিখিতে-পড়িতে আরম্ভ করেন। বাড়ীর প্রাচীনাদের ভয়ে ইহা তাঁহাকে লুকাইয়া করিতে হইয়াছিল। রন্ধনগৃহের যে স্থানটি হেঁসেল বা হাঁড়ীশাল বলিয়া পরিচিত তাহা কাঁচা মাটির দেয়ালে ঘেরা ছিল। তাহারি গায়ে কাষ্ঠশলাকা দিয়া তিনি অক্ষর লিখিতে অভ্যাস করিতেন, ও প্রত্যহ রন্ধন-শেষে গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকার লেপ দিয়া তাহা ঢাকিয়া দিতেন। তখন গ্রামের লোকদের ধারণা ছিল যে স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া শিখাইলে দুর্নীতির পথ উন্মুক্ত হইবে; স্ত্রীলোকেরা সকলের সহিত গোপনে পত্রালাপ করিবে। ঐ জন্যই মধ্যবিত্ত পরিবারে লেখাপড়ার চর্চ্চা কেহ প্রশ্রয় দিত না। ধনাঢ্য পরিবারে কন্যার আত্মীয়গণের নিকট কেহ কেহ বা সহোদরদিগের সহিত গুরুমশায়ের নিকট লেখা অভ্যাস করিতেন।

আমার জন্মের কিছুদিন পূর্ব্বে পিতামহাশয় আমার মাতাঠাকুরাণীকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে সন্তানের প্রতি মাতার কর্ত্তব্য, মাতৃত্বের দায়িত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কিছু উপদেশ ছিল। পত্রখানি ডাকঘর হইতে আমাদের বাড়ীতে না আসিয়া গ্রামের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির বাড়ীতে গেল; সে বাড়ীর লোকেরা উহা খুলিয়া পড়িয়া আমার পিতামহদেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। পুত্র বধূকে পত্র লিখিযাছে দেখিয়া তিনি লজ্জায় ম্রিয়মান হইলেন এবং পত্রখানি লইযা তাঁহার বৈবাহিক, আমার মাতামহদেবের নিকট গেলেন। তিনিও জামাতার এই নির্লজ্জতার পরিচয় পাইয়া বড় অপ্রতিভ হইলেন। চিঠিখানা পাইয়া বাড়ীতে একটা হুলুস্থূল ব্যাপার। যাঁহার নিকট আসিয়াছিল তাঁহাকে সেখানি দিবার আবশ্যকতা কেহ দেখিলেন না। বহুদিন পরে তিনি গোপনে চিঠিখানি খুঁজিয়া লইয়া পড়িযা আবার পূর্ব্বস্থানে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

আমাদের শৈশবে মাতৃদেবীর নিকটেই প্রত্যেকের অক্ষরপরিচয় হইয়াছে। ছেলেবেলা তাঁহাকে ও অন্য দুই-একটি আত্মীয়াকে বাঙ্গলা রামায়ণ মহাভারত ও কালীবিষয়ক একখানি বই পড়িতে শুনিতাম।

মাতৃদেবীর শ্রমশীলতা, সেবাপরায়ণতা, সদ্বিবেচনা ও অল্পভাষিতা তাঁহাকে গ্রামে ও শ্বশুরালয়ে অনেকেরই প্রিয় করিয়াছিল, কিন্তু অপরের প্রশংসা পাইয়াছিলেন বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক তাঁহার খুড-শাশুড়ী তাঁহার প্রতি ক্রমেই বিমুখ হইতে লাগিলেন। সার্দ্ধ ষোড়শবর্ষ বয়সে তাঁহার প্রথম-সন্তানের জন্মের পর এই বিমুখতা অত্যাচারে পরিণত হইল। তিনি দাসীর ন্যায় সকলের পরিচর্য্যায় রত থাকিতেন, কাহাকেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না। দিবাভাগে সন্তানকে ক্রোড়ে করিবার অবসরও তাঁহার সকল দিন ঘটিত না। সন্তানের সৌভাগ্যবশতঃ পিতামহ যখন গৃহে থাকিতেন শিশু তাঁহার বুকে স্থান পাইত। শুনিয়াছি একদিন শীতকালে সকালবেলা মাতামহ আসিয়া দেখিলেন আমাকে ঠাণ্ডা মাটিতে বসাইয়া রাখিয়া মাতা গৃহকর্ম্ম করিতেছেন; দেখিয়াই তিনি তাঁহাকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া আমাকে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন। অতঃপর বহুদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রভাতে আসিয়া তিনি আমাকে লইয়া যাইতেন, সন্ধ্যাবেলা ঘুম পাড়াইয়া ফিরাইয়া আনিতেন। মাতা সারাদিন সন্তানকে দুগ্ধপান করাইতে পারেন নাই বলিয়া রাত্রে শয্যায় গিয়া অশ্রুপাত করিতেন।

পিতামহদেবের স্বাস্থ্য যত ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল আমার মাতার প্রতি কর্ত্রীর দুর্ব্ব্যবহারের মাত্রা তত বাড়িয়া চলিল।

জীবনের প্রথম প্রায় সাত বৎসর আমি গ্রামের বাটীতে বাস করিয়াছি। তখন মাতার কাজকর্ম্ম যাহা দেখিয়াছি এখনও মনে আছে। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি ঘরগুলি ঝাঁট দিতেন, তারপর গোবর ও মাটি গুলিয়া ঘর নিকাইতেন, ইহার পর

রাত্রের ব্যবহৃত স্তূপীকৃত কাঁসার ও পাথরের থালা-বাটী সব বহিয়া লইয়া অন্দরের পুকুরের ঘাটে মাজিতে বসিতেন। বাসন মাজা শেষ হইলে স্নান ও পূজা সারিয়া রাঁধিতে যাইতেন। যখন শাশুড়ীরা সদয় থাকিতেন দুইমুঠা পান্তাভাত খাইতেন। পিতামহদেবের পীড়ার সময় কখন দেখিয়াছি দুইটি ভিজা চাউল মুখে দিয়া খাইতেন।

আমার বয়স যখন ৪ কি ৫ বৎসর তখন মাতামহদেবের হঠাৎ মৃত্যু হয়। ইহার কিছুকাল পরেই পিতামহদেব পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। শ্বশুর পীড়িত, স্বামী বিদেশে, বধূর তখন বড়ই দুরবস্থা। শ্বশুরের সেবায় অনেক সময় ব্যয হইত, তথাপি গৃহের অন্যান্য কর্ম্ম হইতে তাঁহার ছুটি ছিল না। সারাদিন খাটিয়াও কটুভাষিণী গৃহকর্ত্রী বিধবা খুড়-শাশুড়ীর নিকট অনেক গঞ্জনা সহিতে হইত। সেই হৃদয়হীনা কখন কখন বলিতেন, "যা, বুড়াকে লইয়া আলাদা হইয়া যা।"— "আমার শ্বশুরেরও এই বাড়ীতে তালুকদারীতে সমান ভাগ আছে, এ বাড়ী আপনারও যেমন আমারও তেমন"— এইরকম দুই-চার কথা বলিয়া বধূ বেশ ঝগড়া বাধাইতে পারিতেন। জ্ঞাতি প্রতিবেশিনীরা সেইরূপ কথা শিখাইয়া দিতেন কিন্তু বধূ মুখ খুলিতেন না, খুড়শাশুড়ী ঝগড়া জমাইতে না পারিয়া নীরব হইতেন।

প্রতিদিন শ্বশুরের ময়লা বিছানা কাচিয়া ধুইয়া, বাড়ীর সকলের জন্য রন্ধন করিয়া দিয়া তিনি তাঁহার শ্বশুরমহাশয়কে খাওয়াইতে যাইতেন। প্রত্যেকটি ভাতের গ্রাস তাঁহার মুখে তুলিয়া দিতে হইত। তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ অবশ হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাকে পাশ ফিরাইতে হইলে সম্পর্কিত দেবর ভাগিনেয় প্রভৃতিকে ডাকিয়া আনিতে হইত। তাঁহার নিজের দিবসের আহার বেলা ২টা ৩টার পূর্ব্বে কোন দিন হইত না। রাত্রেও আমার জন্য তত্ত্বাবধান তাঁহাকেই করিতে হইত।

এইরূপে দেড়বৎসর অনিয়মিত পরিশ্রম, অল্পাহার, অনিদ্রায় মাতৃদেবীর স্বাস্থ্য চিরকালের মত নষ্ট হইল। তিনি সেই সময় হইতে জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত শিরঃপীড়ায় দারুণ কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন।

আমার তিন পিসীমা ছিলেন। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ার বাসণ্ডা গ্রামেই বিবাহ হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠার শ্বশুরালয় গ্রামান্তরে হইলেও বেশী দূর ছিল না। ইঁহাদের দ্বারা পিতামহদেবের কোন সেবা হয় নাই। উত্তরকালে আমার পিতৃদেব আমাকে বলিয়াছেন— "তোমার মাতা আমার রুগ্ন পিতার সেবা করিয়া আমাকে নরকভোগ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।"

ইতিপূর্ব্বে পিতৃদেব ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আত্মীয়গণের বিরাগভাজন ও ভীতির কারণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা বলাবলি করিতেন, বৃদ্ধের একমাত্র পুত্র বিধর্ম্মী, শ্রাদ্ধ করিবে কে? পিতামহদেব স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তির ন্যায় বলিতেন, "শ্রাদ্ধ করিবেন আমার বউমা।" সকলেই জানিত তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত!

পিতামহদেবের ব্যাধি দুরারোগ্য এবং মৃত্যু সন্নিকট জানিয়া পিতামহাশয় ১৮৭১

সনের পূজার ছুটিতে বাটী আসিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে নিকটে উপস্থিত থাকিলে পাছে কোন পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে লিপ্ত হইতে হয় এই ভয়ে শীঘ্রই বরিশাল ফিরিয়া গেলেন। ১৮৭১ সনের ১৫ই জানুয়ারী পিতামহদেবের মৃত্যু হয়। মাঘমাসের দারুণ শীতে নদীতে স্নান করিয়া আর্দ্রকেশে আর্দ্রবস্ত্রে কম্পিতদেহেই আশু-সন্তানবতী আমাদের মাতা তাঁহার মুখাগ্নি করিলেন। তৎপরে একমাস কাল একবেলা হবিষ্যান্ন খাইয়া তিনিই পুত্রস্থানীয় হইয়া শ্বশুরের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলেন। পিতৃদেব বরিশালে ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে পরলোকগত পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন।

পিতামহদেবের মৃত্যুর পর ক্রমাগত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও পরামর্শ চলিতে লাগিল। সহস্রবার মাতাঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করা হইত, "তুমি এখন কি করিবে? তোমার স্বামীর তো জাতি গিয়াছে, তুমি কোথায় থাকিবে—কোথায় যাইবে? তুমিও কি জাতি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিবে? তোমার স্বামীর বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে; তুমি তাহার কাছে যাইও না, সে হয়তো তোমাকে কিছুদিন পরে বেচিয়া ফেলিবে। বরং এখানে থাক, সে তোমার জন্য ফিরিয়া আসিতে পারে।" সকলেই একবাক্যে বলিলেন, "তুমি দেশের বাড়ীতে থাক।"

সকলেই আশা করিয়াছিলেন, এবার তাঁহার একটি পুত্র হইবে। যখন সে আশা চূর্ণ করিয়া বাঙ্গলা ১২৭৮ সনের ৬ই আষাঢ় যামিনী ভূমিষ্ঠ হইলেন সকলেরই মুখ বিষণ্ণ। মেজো পিসীমা অনেক আশা করিয়া সূতিকাগারে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কন্যা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং অবিলম্বে স্নান করিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। কন্যার জন্ম সেকালে এতই দুঃখের ব্যাপার ছিল।

সেইদিন হইতে মাতাঠাকুরাণীর জীবন সকলে অসহনীয় করিয়া তুলেন। ছোট ঠাকুরদাদা মহাশয় বলিলেন, "বউমা যদি বলেন তাঁকে পৃথক আটচালা তুলে দিব, আমার কনিষ্ঠপুত্রকে তাঁর পোষ্যপুত্ররূপে দান করব, তিনি পুত্রকন্যা নিয়ে সকল অভাব ভুলে থাকুন।" পিসিমারা বলিলেন—"তোমার মেয়েটিকে বিবাহ দিয়া ঘর-জামাই রাখ।" এবার মাতাঠাকুরাণী উত্তর দিলেন, বলিলেন,—"ঘর-জামাই না ঘর-জ্বালা! আমি ঘর জ্বালাইব না।" আজ সেই সময়ের কথা চিন্তা করিয়া মাতাঠাকুরাণীকে কিরূপে কৃতজ্ঞতা জানাইব জানি না। আমার শিক্ষাদীক্ষা সুখসৌভাগ্য যাহা কিছু পাইয়াছি, যাহা কিছু আমার মনুষ্যত্ব, যাহা কিছু এই ক্ষুদ্র জীবনের সফলতা, সে সমুদয়ের মূলে আমার মাতৃদেবী—তাঁহার সেইদিনের দৃঢ়তা। পিসীমারা আমার সম্বন্ধ আনিয়াছিলেন, সেইদিন মাতার একটু হাঁ-কি-না'র উপর সাড়ে ছয় বৎসরের বালিকার সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছিল।

মাঘমাসে পিতামহদেব স্বর্গারোহণ করিলেন। পরবর্ত্তী আষাঢ় মাসে ভগিনী যামিনীর জন্ম হইল ও ভাদ্র মাসের মধ্যভাগে পিতামহাশয় আমাদিগকে নিজের কাছে আনিবার

জন্য বাসণ্ডা গেলেন। গ্রামের লোকেরা সকলে মিলিয়া বলিলেন—"আমরা বিধর্ম্মীর নৌকা ঘাটে লাগাইতে দিব না। স্ত্রীর সহিত একবার দেখা না করিয়া ফিরিয়া যান ভাল, নচেৎ নৌকা ডুবাইয়া দিব।" পিতৃদেব বলিলেন, "আমার স্ত্রীর সহিত একবার দেখা না করিয়া যাইতে পারি না। তিনি এখানে আসিয়া নিজের মুখে আমাকে ফিরিযা যাইতে বলুন, আমি চলিয়া যাইতেছি।"

ঘাটে লোকারণ্য, আমাদের বাড়ীতে লোকের ক্রমাগত যাতায়াত, আত্মীয়রা আমাকে বুকে চাপিযা ধরিয়া কাঁদিতেছেন—যেন কি আকস্মিক বিপদ উপস্থিত। দূর-সম্পর্কিত এক ভাগিনেয় ও একটি দেবরকে সঙ্গে লইয়া অবগুণ্ঠাবৃতা মাতাঠাকুরাণী নৌকার কাছে গেলেন। কিছুক্ষণ পতিপত্নীতে কথা হইল। তখন উপদেশ বা যুক্তিতর্কের সময নয়। পতি বলিলেন—"আমি একলা বড়ই কষ্টে আছি, তুমি এস।" পত্নীর হৃদয় গলিযা গেল। তবু বলিলেন—"যদি আমার ধর্ম্মের উপর হাত না দেও আমি যাইতে পারি।" উত্তর পাইলেন, "তোমার ধর্ম্মের উপর হাত দিব না, তুমি তোমার ধর্ম্মবিশ্বাস মত চলিবে।" এই বলিয়া পিতৃদেব মাতৃদেবীকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন, সমবেত লোকদিগকে বলিলেন, "আমার স্ত্রী আমার সহিত আসিতে প্রস্তুত; কন্যাদুটিকে পাঠাইয়া দিন।" একটা ক্রোধ ও নিরাশার ভাব লইয়া লোকেরা দাঁড়াইয়া রহিল, বাড়ীর লোকেরা কাঁদিতে কাঁদিতে আমাদের দুই বোনকে নৌকায় তুলিয়া দিল। মাতাঠাকুরাণী বলিলেন, "আমি একবার আমার মা'র সঙ্গে দেখা করিয়া যাইব।" পিতামহাশয় মাঝিদিগকে আমার মামা-বাড়ীর ঘাটে নৌকা লইয়া যাইতে হুকুম দিলেন। গ্রামের লোকেরা বলিলেন, "না, সেখানে না, তোমার স্ত্রীকে তাহার মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে দিব না।"

মাতাঠাকুরাণী বরিশালে আসিলেন। সেখানে নিয়মিত সন্ধ্যাআহ্নিক করিতেন, মাটির শিব গড়াইয়া পূজা করিতেন, ব্রতনিয়মাদিও পূর্ব্বের মত রক্ষা করিতেন। পিতামহাশয় বাধা দিতেন না, কিন্তু হাসিতেন। মাতাঠাকুরাণী সদ্‌ব্রাহ্মণ ও সদ্‌বৈদ্য ছাড়া কাহারও ছোঁয়া খাইতেন না। যাহার জল-চল, এমন চাকর না পাইলে পানাহার বন্ধ থাকিত। জল আনিবার লোক না থাকিলে কখন কখনও কেবল ডাবের জল খাইয়া থাকিতেন।

পিতামহাশয় দুইবেলা আমাদিগকে কাছে বসাইয়া উপাসনা করিতেন। তিনি আমাদের জন্য একটি শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। অন্তঃপুর-স্ত্রীশিক্ষা-বিধায়িনী সভা হইতে যে পরীক্ষা গৃহীত হইত, তাহার সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর পাঠ্য আমি পড়িতাম। মা আমার ঠিক উপরের শ্রেণীতে পড়িতেন—তাঁহার পাঠ্য ছিল বোধোদয়, সরল ব্যাকরণ, ভূগোলসূত্র এবং অঙ্কের যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ। আমার পাঠ্য ছিল—বর্ণপরিচয় প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ এবং ১৯০ পর্য্যন্ত গণনা। পরীক্ষা দিয়া উভয়ে প্রায় একমূল্যের

একপ্রকার পুরস্কারই পাইলাম। মা শিরঃপীড়া বশতঃ আর বেশীদিন পড়া- শুনা করিতে পারেন নাই। গৃহকর্ম্ম ও সন্তান-পালনে তাঁহার এত সময় যাইত যে পড়িবার অবকাশও পাইতেন না।

পিতামহাশয় তাঁহার শ্রদ্ধেয় বন্ধু গিরীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে সপরিবারে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন। ইঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া মাতাঠাকুরাণীর ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণা দূর হইল। কিন্তু জাতিভেদ ত্যাগ করিতে তাঁহার অনেকদিন লাগিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত তিনি অস্পৃশ্য হিন্দু কিম্বা মুসলমানের ছোঁয়া আহার বা পানীয় গ্রহণ করিতে পারিতেন না। বলিতেন—"রুচি হয় না, কি করি?"

এদিকে কিন্তু সকল-জাতীয় অতিথি-অভ্যাগতকে রাঁধিয়া খাওয়াইতে প্রীতি বোধ করিতেন। এই সময় একটি কায়স্থবংশীয়া বালবিধবা হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিযা আমাদের গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মা তাঁহার ছোঁয়া খাইতেন না, কিন্তু অন্যথা তাঁহাকে আপনার মত করিয়া রাখিতেন।

বাবা পিরোজপুরের মুন্সেফ হইযা আসিলে পর তাঁহার বৈঠকখানায় প্রতি রবিবার ব্রাহ্মসমাজ বসিত। স্থানীয় ভদ্রলোকদের লইয়া রবিবার দুই-বেলা উপাসনা হইত। আমি ও মা ভিতবের দিক হইতে বেড়ার ফাঁক দিয়া উঁকি দিতাম ও সঙ্গীত প্রার্থনাদি শুনিতাম। মাতাঠাকুরাণী সংকীর্ত্তনের কথা ও সুরগুলি শিখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেন। "প্রভু দয়াল, ঐ সাধুমুখে আমি শুনেছি" এই গানটি সম্পূর্ণ আকারে পাইবার জন্য তাঁহার ব্যগ্রতা দেখিয়া একখানি শ্লেট ও একটি পেন্সিল লইয়া উপর্য্যুপরি কয়েক রবিবার আমি বেড়ার পিছে বসিয়া গানটি লিখিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—বোধ হয় কৃতকার্য্যও হইয়াছিলাম। কেন যে মাতাঠাকুরাণী আমার পিতামহাশয়ের নিকট ব্রহ্মসঙ্গীতখানি চাহিয়া লয়েন নাই জানি না। হয়তো জানিতেন না গানটি পুস্তকে আছে কি না, নয়তো লজ্জাবশতঃ সঙ্গীতের অনুরাগ গোপন করিয়াছেন। আমার মনেও চাহিবার কথা উদয় হয় নাই। আমি পিতামহাশয়কে অত্যন্ত ভয় করিতাম। এ সময় আমার বয়স আট উত্তীর্ণ হইয়া নয় চলিতেছে। বোধ হয় এই সময়েই মাতৃদেবীর ব্রহ্মোপাসনার প্রতি অনুরাগ জম্মে। মুন্সেফের স্ত্রী হইয়াও তাঁহাকে স্বহস্তে সকলের জন্য রাঁধিতে হইত, তবু উপাসনার সময় সব কাজ ফেলিয়া সেই মেটেঘরের পিছনে ভিজা-মাটির উপরে আসিয়া বসিতেন।

পিরোজপুরে আমার তৃতীয় সহোদর প্রেমকুসুমের জন্ম হয়। এখান হইতে অবসর পাইয়া পিতামহাশয় আবার কিছুদিন আমাদের লইয়া বরিশালে আসিলেন এবং মাস-দুই পরেই সকলে কলিকাতা রওনা হইলাম।

কলিকাতা আসিয়া মাতাঠাকুরাণী ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে প্রথম সামাজিক উপাসনা দেখিলেন। বরিশালে থাকিতে আত্মীয়স্বজনের মনঃপীড়ার ভয়ে সেখানকার সমাজে

যান নাই। কিছুদিন কলিকাতা থাকিবার পর পিতামহাশয়[৪৩] অস্থায়ীরূপে ঠাকুরগাঁয়ের মুন্সেফ নিযুক্ত হইলেন এবং আমাদিগকে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে রাখিয়া গেলেন। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তথায় সপরিবারে ছিলেন। তাঁহার পরিবারের সহিত মাতৃদেবীকে পরিচিত করিয়া দিবার পর অপরিচিত স্থানে অনেক অপরিচিতের মধ্যে বাস করিতে তাঁহার আপত্তি রহিল না।

এখানে দুইবেলা নিয়মিত উপাসনায় যোগ দিতে হইত, সকলের সহিত একপংক্তিতে বসিয়া আহার করিতে হইত এবং দিনে একঘন্টা করিয়া ভক্তিভাজন উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়ের[৪৪] নিকট পড়িতে হইত। দ্বিপ্রহরে শিশু-কন্যাদ্বয়কে ঘুম পাড়াইয়া একখানি 'সীতার বনবাস' ও বাঙ্গলা ব্যাকরণ হাতে লইয়া পড়িতে যাইতেন দেখিতাম।

শৈশবে আমার পিতামহদেব আমাকে অথবা তাঁহার জ্ঞাতিপুত্রগণকে যে সকল ছড়া মুখস্থ করাইতেন, আমার মাতাঠাকুরাণী রন্ধনশালায় বসিয়া তাহা শুনিয়া শুনিয়া শিখিয়া লইতেন। প্রথম বয়সে শ্রুত এই সকল ছড়া এবং পঠিত রামায়ণ-মহাভারতের বিশেষ বিশেষ অংশ তাঁহার বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত স্মরণ ছিল, প্রসঙ্গক্রমে সে-সকল আবৃত্তি করিতেন। কথায় কথায় এমন পদ্য-প্রবচন আবৃত্তি করিতে আজকাল কাহাকেও শুনি না। শিরঃপীড়াদিবশতঃ পরবর্ত্তীকালে তাঁহার স্মৃতিশক্তি তেমন প্রখর ছিল না। পঠিত বিষয় ভুলিয়া যাইতেন। পিতামহাশয় তাঁহাকে যেরূপ শিক্ষিতা দেখিতে চাহিতেন, সেরূপ হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এজন্য পিতামহাশয়ের কথাবার্ত্তায় মাতৃদেবী সম্বন্ধে নৈরাশ্য ও কিঞ্চিৎ অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ পাইত। আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে আমি বুঝিতেছিলাম যে, ইহাতে মাতৃদেবীর মর্ম্মে মর্ম্মে আঘাত লাগিত, কিন্তু মুখে কোনদিন বিশেষ কিছু বলেন নাই এবং স্বামীর বন্ধুবর্গের নিকট, এমন কি নিজের সন্তানগণের নিকটও সম্মান বা শ্রদ্ধার কোন দাবী রাখেন না এমন ভাব দেখাইয়াছেন।

তিনি কৈশোরে ও যৌবনে সুন্দরী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তাঁহার সুশীলতা, নম্রতা, সেবাপরায়ণতা ও সৌজন্যাদির জন্যও সকলে তাঁহাকে সুখ্যাতি না করিয়া পারিত না। অথচ তিনি আপনাকে মূর্খ মনে করিয়া নিজকে সর্ব্বদা সকলের পশ্চাতে রাখিতেন। নিজের মূর্খতা তাঁহাকে স্বামীর সর্ব্বথা যোগ্যা ও আদরণীয়া করে নাই; সকল ভাব, চিন্তা ও কার্য্যে স্বামীর সহানুভূতি দিতে হয়তো পারেন না, এই কথা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণের একান্ত আকাঙ্ক্ষা এই হইল যে কন্যাদিগকে এমন সুশিক্ষা দিবেন যেন তাহাদিগকে কেহ অজ্ঞ বলিয়া অবজ্ঞা বা উপহাস করিতে না পারে। চরিত্রের মহত্ত্ব, স্বাভাবিক সুবুদ্ধি যে পুঁথিগত বিদ্যা হইতে কত অধিক মূল্যবান একথা জীবনের আরম্ভে ও মধ্যভাগে না হউক, প্রবীণবয়সে পিতৃদেব ভূয়োভূয়ঃ স্বীকার করিয়াছেন

এবং আমাদের জননীদেবীকে যে একসময়ে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন তাহা মনে করিয়া দুঃখিত, লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছেন। তিনি বুঝিয়া গিয়াছিলেন যে, মাতৃদেবীর সেবাপরায়ণতা বিবিধ ভাষা শিক্ষা করিয়া বা হাজারখানা পুস্তক পাঠ করিয়া শেখা যায় না। অনেক পড়িয়া, অনেক দিকে অনেক চিন্তা লইয়া নাড়া-চাড়া করিয়া আমরা একরকম মানসিক বিলাসিতা ও দৈহিক অলসতার মধ্যেই ডুবিয়া যাইতেছি। উচ্চ চিন্তা উচ্চ মতই যে উচ্চ জীবন নহে আমরাও তাহা দেখিতেছি এবং একান্তচিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, যেন মাতৃদেবীর সরল নীতিজ্ঞান, সহজ ধর্ম্মবিশ্বাস, ধৈর্য্য ও ত্যাগশীলতা জীবনে লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারি।

পিতৃদেব ভাগ্যবান ছিলেন যে, তাঁহার কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষার বা কোন সৎকার্য্যের পথে তাঁহার পত্নী প্রতিবন্ধক উপস্থিত করেন নাই; প্রত্যুত তাঁহার প্রকৃত সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইয়াছিলেন। এখন স্ত্রীশিক্ষা ও বয়স্থা কন্যার বিবাহ হিন্দুসমাজের মধ্যেও প্রচলিত হইতেছে, কিন্তু তখন হিন্দুসমাজে কেন, ব্রাহ্ম-সমাজ-ভুক্তা অনেক নারীও কন্যাদের উচ্চশিক্ষার পক্ষপাতিনী ছিলেন না, এবং বাল্যদশা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই তাহাদের বিবাহের জন্য নিজ নিজ স্বামীকে অস্থির করিয়া তুলিতেন। সেই সময়ে আমাদের জননী স্বয়ং শিক্ষিতা না হইয়াও আর কোন কথা না ভাবিয়া কেবল আমাদের কথাই ভাবিতেন। একটি দিনের জন্যও তাঁহার মুখে কন্যার বিবাহের প্রস্তাব কেহ শোনে নাই। আমি যে দশবৎসর বয়সে মিস এক্রয়েড-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু মহিলা-বিদ্যালয়ের[৪৫] বোর্ডাররূপে প্রেরিত হইয়াছিলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির জন্য পড়িতে পারিয়াছিলাম তাহার জন্য কেবল পিতৃদেব নহেন, মাতৃদেবীও আমার কৃতজ্ঞতাভাজন। যামিনীকে চিকিৎসাবিদ্যা শিখিতে দিতে পিতৃদেবের আপত্তি ছিল, মাতৃদেবীর তাহাও ছিল না। তিনি ব্যবহারেরও পুত্রকন্যার মধ্যে কোন পার্থক্য করিতেন না। সাধারণ নারীদের মত বস্ত্রালঙ্কারে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ থাকিলে তিনি আমাদের শিক্ষার জন্য এত অর্থব্যয় স্বীকার করিতেন না, পিতৃদেবকেও স্থানে-অস্থানে দান ও পুস্তকক্রয় দ্বারা নিঃস্ব হইতে দিতেন না।

সকল মাতাই স্নেহময়ী, কিন্তু আমাদের মাতার স্নেহ একটু যেন এদেশের মাতৃসাধারণের স্নেহ হইতে বেশী গভীর বেশী উচ্চ এবং বাহিরের দিকে বেশী সংযত ছিল বলিয়া আমার মনে হয়। তিনি সন্তানগতপ্রাণা হইয়াও শৈশবে আমাদিগকে যথেষ্ট শাসন করিয়াছেন। আমি যখন তাঁহার অঞ্চলের একমাত্র নিধি সেই সময়েও আমি তাঁহাকে যেমন ভালবাসিতাম, তেমনি ভয় করিতাম। অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতে তাঁহার চক্ষের একটু দৃষ্টি আমাকে খেলা হইতে ফিরাইয়া আনিত। রোগেশোকে, বিশেষ পরীক্ষার মধ্যে মাতৃদেবীর স্নেহের গভীরতা বিশেষভাবে প্রকাশ পাইত। তিনি কখনও অস্থির হইতেন না। একবার তাঁহার একটি সন্তানের যখন ধনুষ্টঙ্কার হইয়াছে,

তাহার হস্তপদের বিক্ষেপ-দর্শন নিকটবর্ত্তী সকলের যখন অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন সন্তানের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও নিজে কেবল অশ্রু মুছিয়াছেন, মুখ ফুটিয়া কাঁদেন নাই, আমাকে বলিয়াছেন—"কাঁদিও না, কাঁদিবার অনেক সময় আছে, চিকিৎসার সময় চলিয়া যায়।"

একটি সন্তান অল্পদিনের মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হইবে, শরীরের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন আর একটি টাইফয়েড রোগগ্রস্ত সন্তান শ্রীমান প্রভাতকে কোলে লইয়া দিনরাত্রি একাসনে কাটাইয়াছেন। ঈশ্বরকৃপায প্রভাত ক্রমে আরোগ্য লাভ করিল।

কেবল নিজের সন্তান নহে, পরের সন্তানের জন্যও এইরূপ করিতে পারিতেন। একবার আমি বেথুন স্কুলের একটি ক্ষুদ্র বালিকার অভিভাবকত্ব প্রাপ্ত হই। তাহাব টাইফযেড জ্বর হইলে তাহাকে আমাদের বাড়ীতে লইয়া আসিলাম। চিন্ময়ীর জন্মের পর মাতৃদেবী তখন সূতিকাগার হইতে সবে বাহির হইযাছেন। তাঁহার ক্রোড়ের সন্তানটি দশ-বার দিনের অধিক হইবে না। সেই অবস্থায রুগ্না বালিকার কাপড়-চোপড় স্বহস্তে কাচিযা দিতেন এবং অন্যপ্রকারে তাহার শুশ্রূষার সাহায্য করিতেন। তখন আমার বি এ পরীক্ষা অতি নিকট বলিযাই বোধহয আমাকে খুব বেশী খাটিতে দিতেন না।

পিতামহাশযের পীড়ার সময় মাতৃদেবী রোগে-শোকে একান্ত ভগ্ন। তখনও দিবারাত্রি তাঁহার সেবা করিয়াছেন; দেখিযা পিতৃদেব অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

আমার কনিষ্ঠ সন্তানের জন্মের কযেক মাস পূর্ব্বে আমার তৃতীয় ভগিনী প্রেমকুসুম স্বর্গগত হন। সে সময় মাতৃদেবী অত্যন্ত পীড়িত হইযা ওযাল্টেয়ারে যান। একটু আরোগ্য হইবার পরই, আমার কাছে কেহ নাই বলিয়া আমাকে ও আমার শিশুগুলিকে দেখাশুনা আবশ্যক মনে করিয়া আমার নিকট আসিলেন। শোকের মধ্যে একরকম আলস্য ও বিলাসের অবসর থাকে, সে অবসর মাতৃদেবী গ্রহণ করেন নাই।

আমার ভাই যতীন্দ্র যখন মায়ের হৃদয় ভাঙ্গিয়া দিয়া চলিয়া গেল তখন তিনি বধূকে লইয়া নেপালে যামিনীর নিকট ছিলেন। সেই শোকের অবস্থায়ও বন্ধুগণ তাঁহাকে পানাহার করাইতে গেলে কাঁদাকাটি ও ওজরআপত্তি না করিয়া কিছু খাইতে চেষ্টা করিতেন। বলিতেন, "যামিনীর এত কষ্ট, আবার আমাকে লইয়া যেন তাহার কষ্ট না হয়।" তিনি না খাইলে যামিনীও কিছু খাইবে না সেজন্যও চেষ্টাপূর্ব্বক কিছু গলাধঃকরণ আবশ্যক মনে করিতেন।

প্রকৃতপক্ষে কাহাকেও কিছু বলিতেন না, কাহারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। বাদানুবাদ উপস্থিত হইলে অনেক সময় ইচ্ছা করিয়াই হার মানিতেন। নিজের মত প্রচার করা বা অন্যকে বলপূর্ব্বক নিজের মতানুবর্ত্তী করিবার কোন চেষ্টা তাঁহার

ছিল না। তিনি নিরভিমানিনী ছিলেন এমন কথা বলিতে পারি না। অনাদরের ব্যথা নীরবে এবং গোপনে বহন করা যদি অভিমানের চিহ্ন হয় তবে তাহা তাঁহাতে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এই অভিমানের সহিত আত্মবিলোপী ভাবের (Self effacement) আশ্চর্য্য সমন্বয় দেখিয়াছি।

পুত্রকন্যাকে সকলে ভালবাসে, পুত্রবধূকে সকলে ভালবাসিতে পারে না। মাতৃদেবী পুত্র হারাইয়া বধূকে বুকে টানিয়া লইলেন, বলিলেন, "তুমি আমার বড় আদরের, তুমি যে তার একমাত্র চিহ্ন।"

দাসদাসীদের প্রতি তাঁহার স্নেহযত্ন সর্ব্বদাই দেখিযাছি। অতিথিঅভ্যাগতদিগের জন্য অনেক ত্যাগস্বীকার করিতেন। এই শিক্ষা অতি অল্পবয়সেই আরম্ভ হইয়াছিল। দেশে থাকিতে কতবার এমন হইয়াছে যে পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় একদল কুটুম্ব ভৃত্যাদি লইযা গ্রামান্তর হইতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতেন এবং এক-ক্রমে মাসাধিক কাল থাকিয়া যাইতেন। ইঁহারা তাঁহার পূর্ব্বকথিত খুড়শ্বশুর মহাশযের বৈবাহিক-পরিবাব। প্রথম রাতে নিজেরা অভুক্ত থাকিয়া বালিকা বধূ ও খুড়শাশুড়ী আপনাদের আহার্য্য ইঁহাদিগকে বাঁটিয়া দিতেন। তাহার পর যতদিন ইঁহারা থাকিতেন ইঁহাদের জন্য রন্ধনাদিতে ব্যস্ত থাকাতে কি দিবসে কি রাত্রে বধূ ও গৃহিণীর সময়ে আহার হইত না। এ কালে এরূপ আতিথ্য কেহ চাহেও না, পায়ও না।

আলস্য কাহাকে বলে মাতা জানিতেন না। বালিকা-বয়স হইতে আরম্ভ করিয়া ৬৭ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি চিরদিন কুটনা কুটিয়াছেন, বহুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়াছেন। ইদানীং সে শক্তি ছিল না। তথাপি যেদিন তিনি শেষশয্যা গ্রহণ করিলেন সেদিন বধূরা কার্য্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিল বলিয়া নিজে গিয়া সকলের জন্য পান সাজিতেছিলেন।

১৮৭২/৭৩ সনে তিনি একেবারে পৌত্তলিকতার সকল সংস্রব ত্যাগ করেন। ভারতাশ্রমে ব্রাহ্মপদ্ধতি-অনুসারে তাঁহার তৃতীয়া কন্যার নামকরণ হয়। তদবধি জীবনে প্রতিদিন উপাসনা করিয়াছেন। পিরোজপুরে তাঁহার জন্য গান শিখিতে চেষ্টা করিযাছি, চিরকাল যেমন করিয়া পারি তাঁহাকে গান শুনাইতে হইয়াছে। ব্রহ্মসঙ্গীত পুস্তকখানি তাঁহার প্রিয় সঙ্গী ছিল। চক্ষের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল তবু চসমা চোখে দিয়া সঙ্গীতগুলি পড়িতে চেষ্টা করিতেন। মৃত্যুকালেও সঙ্গীতখানি শিয়রে ছিল দেখিলাম। কোথায় কি হইতেছে না হইতেছে জানিবার জন্য তাঁহার চিরদিন কৌতূহল ছিল। খবরের কাগজে কি আছে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করিতেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেখিতাম সন্ধ্যার সময় অথবা রাত্রে পুত্রবধূর হাতে একখানি সংবাদপত্র দিযা উহা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন; অনেক ঘটনা যাহা আমরা ভুলিয়া যাইতাম তিনি মনে রাখিতেন।

সাতবৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়, দশবৎসরে তিনি স্নেহময়ী শাশুড়ীকে হারাইয়া খুড়-শাশুড়ীদের অধীনে থাকিয়া আত্মশাসনে অভ্যস্ত হইতে থাকেন, সাড়ে-একুশ হইতে তেইশ বৎসর প্রাণপণে শ্বশুরের সেবা করেন, সাড়ে-তেইশ হইতে ৫৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সুখে প্রকৃত সহধর্ম্মিণীরূপে স্বামীর অনুবর্ত্তন করেন। তাঁহার পাঁচ কন্যা ও পাঁচ পুত্রের মধ্যে একটি কন্যার শৈশবেই মৃত্যু হয়। তৃতীয়া কন্যা ও জ্যেষ্ঠ পুত্র তাঁহার শেষবয়সে তাঁহাকে বড়ই ব্যথা দিয়া যায়। পুত্রের মৃত্যুর চারিমাস পরেই তাঁহার বৈধব্য-প্রাপ্তি ঘটে। তাহার পর নীরবে ক্রমে আরও দুইটি শোকের কঠিন আঘাত সহিতে হইয়াছে। আমাদিগের নিকট বসিয়া মৃত্যুকামনা করিলে আমি বলিয়াছি, "মা, তুমি এখন গেলে চলিবে না, এ পরিবারের কেন্দ্র তুমি, তোমাকে ঘিরিয়া, তোমার টানে, সকলে যে-যাহার স্থানে আছে, তুমি সরিয়া গেলে কে কোথায় গিয়া পড়িবে।" তিনিও সেই আশঙ্কা একটু করিতেন এবং সকলকে সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা কিয়দংশে পূর্ণও হইয়াছে।

তিনি কাহাকেও কষ্ট দিতে চাহিতেন না। দেহে বল না থাকিলেও পুত্রগণের ও পুত্রবধূদের বিনা-সাহায্যে চলিতে চাহিতেন। ১৩ই আগষ্ট দ্বিপ্রহর-রাত্রে স্নানের ঘরে গিয়া পড়িয়া যান, বধূ ও পুত্রেরা গিয়া ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দেয়। তখন তাহারা বা ডাক্তার আঘাতের গুরুত্ব কেহ অনুভব করে নাই। পরদিন সকালে তাঁহার চৈতন্য লোপ হইল। বেলা ৯টার সময় নীরবে পুরাতন গৃহ ত্যাগ করিয়া নবগৃহে স্বামী পুত্র কন্যা জামাতা ও দৌহিত্রের সহিত মিলিত হইতে গেলেন।

বিচিত্রা, ভাদ্র ১৩৩২

আমার অতীত জীবন

মানকুমারী বসু

"যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।"

যাহারা মাইকেল মধুসূদন দত্তের অমর জীবনকাহিনী পড়িয়াছেন, তাঁহারা উক্ত কবিবরের জ্যেষ্ঠতাত - রাধামোহন দত্ত-চৌধুরীর কথা অবশ্য মনে রাখিয়াছেন; কারণ, তিনিই সাগরদাঁড়ির দত্ত বংশের সৌভাগ্য-প্রতিষ্ঠাকারী। তিনিই আমার পিতামহ দেব। তাঁহার প্রথমা পত্নী বালিকা বয়সে গতাসু হইলে, দ্বিতীয়বার যে পত্নী গ্রহণ করেন, সেই পত্নীর গর্ভে একমাত্র পুত্র, আমার পিতৃদেব ৺আনন্দমোহন দত্ত-চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন।

আমাদের যশোহর জেলার শ্রীধরপুর গ্রামের জমিদার ৺বনমালী বসু আমার মাতামহ দেব। আমার জননী শ্রীযুক্তেশ্বরী শান্তমণি দেবী তাঁহার আটটি সন্তানের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা।

অতি বাল্যকালে (তখনকার প্রথামত) আমার মাতা-পিতা বিবাহিত হন। বিবাহকালে পিতৃদেবের বয়স এগার, মাতৃদেবীর বয়স পাঁচ বৎসর।

আমার মাতার চারিটি মাত্র সন্তান হয়। দুইটি পুত্র, দুইটি কন্যা। প্রথম, মন্মথমোহন দত্ত-চৌধুরী, দ্বিতীয়, প্রমথমোহন দত্ত-চৌধুরী, তৃতীয় মনোমোহিনী, চতুর্থ, আমি—মানকুমারী সর্ব্বকনিষ্ঠা।

আমার জন্মের চারি বৎসর পূর্ব্বে আমার সহোদরা বসন্ত রোগে মারা যান। কন্যা বিয়োগে মা বড়ই শোকাকুলা হন। সেই জন্য আমার মাতামহী ঠাকুরাণী এবং দুই বিধবা মাতৃস্বসা, আমার মায়ের পুনরায় একটি কন্যা হইবার জন্য ঠাকুর দেবতাকে অনেক "মানসিক" করেন।

১২৭১ সালে ১৩ই মাঘ রাত্রিকালে, মাতুলালয় শ্রীধরপুরে এ অভাগিনীর জন্ম হয়। দেবতার কৃপায় সেই মৃতা কন্যা আবার আসিয়াছে, এই বিবেচনায় আত্মীয়গণ যারপরনাই আনন্দিত হইলেন এবং "যথোচিতের উপরেও" আমার আদর-যত্ন হইতে লাগিল। বাঙ্গালীর মেয়ের অদৃষ্টে ইহা ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে।

আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা দূর হইলে আমার জন্য দেবতার পূজা ও ৺হরিঠাকুরের লুট দেওয়া হইয়াছিল। শিশুকালে আমাকে "অভিমানিনী" বুঝিয়াই নাকি আমার

নামকরণ হইয়াছিল।

আমি মায়ের নিকটে বড় থাকিতে চাহিতাম না; বাবার কাছে থাকিতেই ভালবাসিতাম।

ছেলে ভুলানো শক্তি বাবার খুব বেশী ছিল; বাবা কত গান গাহিয়া, গল্প বলিয়া, খেলা শিখাইয়া, পোষা পাখীদের খেলা দেখাইয়া আমাদিগকে একান্ত বশীভূত করিতেন। "আমাদিগকে" কেননা বাড়ীর, পাড়ার এবং গ্রামের অনেক শিশুই বাবার কাছে আসিয়া থাকিত।

যখন আমার জ্ঞানের উদ্রেক হইল তখনই আমি দেখিলাম, আমার বাবা, আমার ঋষিপ্রতিম বাবা, ধর্ম্মাচরণ ও জ্ঞানানুশীলন লইয়াই দিনযাপন করেন। বৈষয়িক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অনেক সময়ে ন্যায়-ধর্ম্মের সীমা পাছে অতিক্রম হয়, এই আশঙ্কায় তরুণ বয়সেই বাবা বিষয়-কর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইলেন। তখন কর্মচারীদিগের প্রতি বৈষযিক সমস্ত কার্য্যেব ভার দিয়া তিনি জ্ঞান-ধর্ম্মালোচনায় নিরত থাকিতেন, ইহার ফলে বাবার অনেক ভূ-সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছিল। ভবিষ্যতে আমার মাতৃদেবীর বুদ্ধিবলে, আমার মাতুল মহাশয়দিগের আনুকূল্যে সেই সম্পত্তি আবার উদ্ধার করা হয়।

যাহা হউক, আমি অতি বাল্যকাল হইতে আমার মাতা-পিতাকে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি অথবা পুবাণের শিব-শক্তির মতই দেখিতে পাইয়াছিলাম। বাবা পুস্তক-পাঠ, পণ্ডিতদিগের সহিত শাস্ত্রালোচনা, শিবপূজা, পুর-মহিলাদিগের নিকটে পুরাণ পাঠ, বালিকাদিগকে সদুপদেশ দান এবং শিশুদিগের সহিত ক্রীড়া— এই সব করিতেন। আব মা কার্য্যকারকদিগকে উপলক্ষ্য করিয়া বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, পুত্রের উন্নতি চেষ্টা, সাংসারিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন, গৃহকর্ম্মে অসাধারণ নৈপুণ্য, এই সব করিতেন। বাবা মা দুজনেরই অপত্য-স্নেহ বড়ই প্রবল দেখিযাছি।

প্রায প্রতিদিন বিকালে বাবা পুব-মহিলাদিগকে পুরাণ শুনাইতেন; বালিকাদিগকে সদুপদেশ দিতেন, বাবা বলিতেন, "মিথ্যা কথা বলিও না, পরের জিনিষ চুরি করিও না, ঝগড়া করিও না, কখনও কুপথে যাইও না"— ইত্যাদি, আমি সকলের অপেক্ষা ছোট; সকল কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতাম না, কিন্তু কথাগুলি আমার খুব মনে থাকিত।

আমাদের বাহিরের বাগানে একটি বড় বকুল গাছ ছিল, আমি সকাল বেলায় সাথীদের সহিত মিলিয়া ফুল কুড়াইতে যাইতাম। একদিন আমাকে ফেলিয়া সাথীরা আগে ফিরিয়াছিল, আমি আসিবার সময়ে দেখি, পথে এক শিংওয়ালা গরু। তখন ভয়ে পড়িয়া নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে, বনের উপর দিয়া অন্য পথে বাড়ী আসিলাম। আসিয়াই কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাবাকে বলিলাম, "বাবা! আজ আমি কুপথে গিয়াছিলাম!" বাবা আমার চোখের জল মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন করিয়া কুপথে গিয়েছিলে

মা?" আমি বলিতে লাগিলাম, "আপনি ওঁদের কুপথে যাইতে মানা করিয়াছেন, আমিও কুপথে যাই না; আজ রাস্তার উপরে একটা গরু ছিল বলিয়া কুপথ দিয়া চলিয়া আসিয়াছি।"

"কুপথ" বিষয়ে কন্যার অভিজ্ঞতা দেখিয়া বাবা কি ভাবিলেন জানি না; আমাকে বলিলেন, "আচ্ছা, ভাল পথে যাওয়া-আসা করিও!" বাবা সেই দিন হইতে আমাকে লেখা-পড়া শিখাইতে মনোযোগ করিলেন।

আমি বাবার কাছে, আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার পত্নীর কাছে এবং আমার এক দিদির কাছে প্রথম ভাগ পড়িতে লাগিলাম। ঔকার বানান শেষ হইলেই দ্বিতীয় ভাগ ধরিলাম। দ্বিতীয় ভাগের যুক্তাক্ষর শীঘ্র মুখস্থ হইবে বলিয়া বাবা আমার সহিত সর্ব্বদা বানান করিয়া কথা কহিতেন। যুক্তাক্ষর পড়া শেষ হইলে আমাদের বাহির বাড়ীতে বালিকা বিদ্যালয় হইতে লাগিল। আমি দ্বিতীয় ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কথামালা লইয়া পড়িতে স্কুলে চলিলাম। আমার প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ দুই মাসের পূর্ব্বে শেষ হইয়াছিল— এরূপ স্বেচ্ছাচারিতায় বাবা কিছুই বলিলেন না।

বিদ্যালয়ে যাইবার সময়ে বাবার আদেশ মত ভগবানের চরণে প্রণাম ও প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাঁহারই কৃপায় পাঠ আমি খুব শীঘ্র শিখিতে লাগিলাম। কিন্তু হাতের লেখার বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতাম না। পণ্ডিত মহাশয় আমার পাঠনা বিষয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন বলিয়াই হউক, আর বাবার আদুরে মেয়ে বলিয়াই হউক, আমার লেখার জন্য বা অন্য কোন কারণে আমাকে কোন দিন রুক্ষ শাসন করিতেন না।

এই সময়ে আমি ঘরে বসিয়া বাবার পুস্তক সকল অর্থাৎ কাশীরাম দাসের মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীখণ্ড, হর-পার্ব্বতী-মঙ্গল প্রভৃতি পড়িতাম আর পুরবাসিনীদিগের অনুকরণে, বাবা, মা, দাদা প্রভৃতি আত্মীয়দিগের উদ্দেশে কৃত্রিম পত্র লিখিতাম। সেই সকল পত্র সাথীদিগকে পড়িয়া শুনাইতাম; সে লেখা এত অস্পষ্ট, যে অন্য কেহ তাহা পড়িতে পারিত না।

আমার দাদা স্ত্রী-শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন। তখন তিনি আমাদের মাতুলালয়স্থ এনট্রান্স স্কুলের অন্যতম শিক্ষক ছিলেন এবং মাতুল মহাশয়দিগের নিকট হইতে জমিদারী কার্য্য-কলাপ শিক্ষা করিতেন। তিনি সেখান হইতেও আমার ভ্রাতৃজায়ার লেখাপড়ার তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি আমার ভ্রাতৃজায়াকে নারী-শিক্ষা, সুশীলার উপাখ্যান , গৃহকর্ম্ম, কুমুদিনী-চরিত, স্ত্রীর প্রতি উপদেশ প্রভৃতি পুস্তক পাঠাইয়া দিতেন। আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া ও অন্যান্য সমবয়স্কাগণ সেই সকল পুস্তক পাঠ করিতেন। দ্বিপ্রহর সময়ে আমাদের অন্তঃপুরে বিলক্ষণ বিদ্যানুশীলন হইত। আমার সধবা ভ্রাতৃজায়া বামাবোধিনীর গ্রাহিকা ছিলেন। উক্ত পত্রিকায় বামা-রচনা দেখিয়া তাঁহারাও পদ্য গদ্য রচনা করিতেন। এই সব দেখিয়া আমারও "রচনা" করিতে

মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত। কিন্তু উঁহারা কি বলিবেন, এই লজ্জা ও সঙ্কোচে সে ইচ্ছা আমি প্রকাশ করিতে পারিতাম না।

আমার মনে হয়, একদিন আমার এক ভগিনীকে দিয়া একখানি ছোট খাতা বাঁধিয়া লইয়াছিলাম। তিনি বলিলেন, "খাতাখানা আমার কাছে দে, আমি তো'কে গান লিখিয়া দিব।" আমি তাহা দিলাম না। অতি নির্জ্জনে বসিয়া সেই খাতা এবং দোয়াত কলম লইয়া তাহার নামকরণ করিলাম "লাইবাইটের উপাখ্যান"। চরিতাবলীর "অদ্ভুত" নামগুলি শুনিয়াই "লাইবাইট" নাম আমার মাথায় আসিয়াছিল। কিন্তু সে লাইবাইট্ "পুস্তকে" কি লিখিয়াছিলাম, তাহা আমার ভাল মনে নাই। বোধ হয় যেন যে সব উপকথা শুনিতাম, তাহারই এক "সংস্করণ" করিয়াছিলাম। যাহা হউক সে লাইবাইট্ই আমার প্রথম রচনা। মনে হয়, তাহা গদ্য। তারপর আমি পদ্য রচনার প্রবৃত্ত হইলাম। বাড়ীর লোকে জানিতে পারিলে আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিবেন, আমিও রচনা করিতেছি, এমনতর অস্বাভাবিক কথা শুনিলে লোকে কি বলিবে, এই সব ভয়ে এতটা গোপন করিতাম। তখন আমার বয়স সাত বৎসরের অধিক নহে। সে সব রচনাও অবশ্য মাথা-মুণ্ড রকমের।

আমি গান শুনিতে বড় ভালবাসিতাম। গান শুনিতে শুনিতে আমার মন এত আকৃষ্ট হইত যে আহার-নিদ্রা ভুলিয়া যাইতাম। উপকথা শুনিতেও আমি ঐ রকম ভালবাসিতাম। বাবা আমাকে উপকথারূপে রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন। বাবার কর্ম্মচারী গোবিন্দ কাকা, পুরাতন ভৃত্য মধুদাদা, মা এবং অন্যান্য সকলে খাঁটি উপকথা বলিতেন। আমি উহা তন্ময়রূপে শুনিতাম। তখন আমার মন বড় নরম ছিল; কাহারও কোন বিপদ শুনিলে আমার হৃদয়ে ভয়ানক যন্ত্রণা হইত। বাড়ীর কাহারও কোন অসুখ হইলে আমি আহার-নিদ্রা ছাড়িয়া, যথাশক্তি তাহার শুশ্রূষা কবিতাম; বাবার পুরাতন ভৃত্য আমার মধুদাদা মরিয়া গেলে আমি তাহার জন্য অনেক দিন পর্য্যন্ত লুকাইয়া কাঁদিতাম।— কেননা মানুষের সাক্ষাতে সহজে কাঁদিতে আমার লজ্জা করিত। এইরূপ প্রবৃত্তি বশতঃ উপকথার "লোক"-দিগের কোন বিপদ শুনিলেও আমার প্রাণ বড় আকুল হইত। অভিমন্যুর মৃত্যু-কথা শুনিয়া, রাজকন্যার পিতৃবংশ রাক্ষসে খাইল শুনিয়া, অথবা "চীল-মা"কে গরম জলে পোড়াইল শুনিয়া আমি চোখের জলে ভাসিয়া যাইতাম; কয়দিন পর্য্যন্ত মনে মনে সেই বেদনা অনুভব করিতাম। সেই জন্য বাবা নিষেধ করিয়াছিলেন, যেন কেহ আমাকে ঐ রকম "বিয়োগান্ত" উপাখ্যান না শুনায়।

আকাশে মেঘোদয় হইলে আমি অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকিতাম। আমি ভাবিতাম, উপকথায় যাঁহাদের কথা শুনি, সেই সব লোক এখন স্বর্গে গিয়া ঐ মেঘের ভিতরে ঘর-বাড়ী করিয়া আছেন। কোন মেঘ দেখিয়া ভাবিতাম, ঐ নীলধ্বজ রাজার বাড়ী—

উহার মধ্যে জনা, প্রবীর প্রভৃতি আছেন ; কোনও মেঘ দেখিয়া ভাবিতাম, উহা গিরিরাজের বাড়ী--- উহার মধ্যে মেনকা উমাকে খেলনা দিতেছেন ; কোনও মেঘে রাজা বিক্রমাদিত্য নবরত্ন সভায় বসিয়া আছেন, এই সব কল্পনা করিতাম। আবার এই কল্পনা সাথীদিগকে বলিতাম, আমি সত্য দেখিয়াছি বলিয়া তাহারা বিশ্বাস করিত। আমিও সত্য বলিয়া ভাবিতাম।

এই সময়ে অর্থাৎ আমার বয়স যখন আট বৎসর তখন আমার স্মরণশক্তি প্রবলা হইয়াছিল। পদ্যপাঠ, চারুপাঠ, বস্তুবিচার, শিশুবোধ ব্যাকরণ, এই সকল পাঠ্য গ্রন্থ অতি সহজে আমার মুখস্থ হইয়া যাইত। হস্তাক্ষর তখনও ভাল ছিল না।

আমি চাঁদের জ্যোৎস্নায় বসিয়া উপকথা রচনা করিয়া খাতায় লিখিতাম। সেই লেখা দুই একজন বালক দেখিয়াছিল, আমাকে বলিয়াছিল, "ইহা কখনও তোমার রচনা নয়"— আমার বড় রাগ হইল; আমি ইহার পরে পদ্য বা গদ্য অর্থাৎ উপকথা যাহা লিখিতাম, কাহাকেও দেখাইতাম না, বাবাও জানিতেন না। একদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া দেখিলাম বাবার হাতে আমার পদ্যের খাতা। আমি লজ্জা, সংকোচ, আরও কি জানি কি "অদ্ভুত" ভাবে যেন মরিয়া গেলাম --- আমার কান্না আসিতে লাগিল। কিন্তু বাবা খুব স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! এ খাতায় কার রচনা ?" আমি বাবার আদেশে মিথ্যাকথা বলিতাম না; অনেক ভয়ে কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলাম, "আমার রচনা বাবা!" বাবা বড় আনন্দিত হইয়া আমাকে বুকে টানিয়া লইয়া খুব আদর করিলেন। বাবা বিশ্বাস করিলেন, আমাকে ধমক দিলেন না, ইহাতে আমি বাঁচিলাম।

যে খাতার জন্য আমার বুকের ভিতরে এমন মহাপ্রলয় হইতেছিল, তাহার ভিতর রচনার দুইটি ছত্র মাত্র আমার স্মরণ আছে, তাহা এই :—

রাখ রাখ সবে ভাই বচন আমার,
ঈশ্বরের পদে কর কর নমস্কার।

গদ্য রচনারও একটু নমুনা দিলাম; "এক রাজ-কন্যার বারান্দায় এক ঝাঁক পাখী আসিয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে রাজ-কন্যা একটি পাখী ধরিয়াছিলেন; তাহার গায়ের রং লাল, সবুজ, হলুদে আর কালো; এমন সুন্দর পাখী কেহ কখনও দেখে নাই; তাহাকে দেখিতে ঠিক যেন একটি বাদুড়!"

এই রচনা দেখিয়া আমার ভ্রাতৃজায়াদ্বয় হাসিয়া গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, আমি ভয়ানক অপ্রতিভ হইয়াছিলাম; সৌন্দর্য্যের শেষ উপমেয় "বাদুড়" হওয়া যে এত হাসিবার কথা তাহা আমি মোটেই বুঝি নাই, কারণ "বাদুড়" আমি তখন মোটেই দেখি নাই।

যাহা হউক, আমার পদ্য রচনা দেখিয়া বাবা বলিলেন —"মা! তোমার পদ্য

বেশ হইয়াছে; এখন হইতে প্রত্যহ যাহা নূতন দেখিবে, তাহাই একটি পদ্য করিয়া আমাকে দিবে" — আমি বড়ই উৎসাহ পাইলাম।

ইহার দুই একদিন পরে বাবার বৈঠকখানার খোলা ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া আমার তৎকালোচিত বুদ্ধির হিসাবে এক নূতন দৃশ্য দেখিলাম। সে ঘটনাটি এই: —

আমাদের এক প্রতিবাসিনী "সখী-তেলিনী"র বাড়ীর নিকটে একটি ডোবা ছিল, লোকে তাহাকে "সখীর কূয়া" বলিত। তখন গ্রীষ্মকাল, সে ডোবার জল শুকাইয়া সেখানে সুন্দর দূর্ব্বা ঘাস হইয়াছিল, একটি গাভী তাহা খাইতেছে দেখিয়া সখী সে গাভীকে খুব গালি-গালাজ দিল; কিন্তু গাভী তাহাতে কিছুমাত্র মনোযোগ করিল না দেখিয়া ছোট একগাছি লাঠি দিয়া তাহাকে তাড়াইতে লাগিল। ঐ প্রহার দেখিয়া আমার বুকে একটু বাজিল। আমি ঘরের ভিতরে গিয়া বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাবা! ভাল কথায় কূয়াকে কি বলিতে হয়?" বাবা বলিলেন, "কূপ বলিতে হয়।" তখন আমি ছাদে আসিয়া কবিতা লিখিলাম।

"জল শুকাইয়া কূপ হয়ে গেছে মাটি;
গাভীতে খেতেছে তাহে ঘাস চাটি চাটি;
আসিয়া সখী তেলিনী মারে ঝাঁটা লাঠি;
মোর মনে হয় বাবা, তার নাক কাটি।"

সেই কবিতা বাবার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া আমি দৌড়িয়া পলাইলাম। একদিন শুনিলাম, বাবা তাঁহার বন্ধুদিগের কাছে বলিতেছেন, "আমার মেয়েটির উপরে মা সরস্বতী দয়া করিবেন এমন ভরসা হইতেছে; আমার মেয়ে এই বয়সেই কবিতা রচনা করিতে শিখিতেছে।" তাঁহারা কেহ কেহ বলিলেন, "আপনাদের বংশে তো মা সরস্বতীর দয়া মাঝে মাঝে হইয়া থাকে।"*

বাবা শিশুকাল হইতেই আমাকে দীনদুঃখীদিগকে দান করিতে শিক্ষা দিতেন এবং বিপন্নকে দয়া করিতে বলিতেন। সেজন্য কাণা, খোঁড়া, বৃদ্ধ ও ভিক্ষুকদিগকে দেখিলে আমি যথাশক্তি তাহাদের উপকার করিতাম। শেষে যখন অভ্যাস হইল, তখন আর "বাবার আদেশ" বলিয়া নহে; দুঃখী বা বিপন্ন দেখিলে আমার হৃদয় সহানুভূতি-পূর্ণ হইত। তাহাদের জন্য মা'র কাছে পয়সা, কাপড়, চাউল প্রভৃতি প্রার্থনা করিতাম; আমার মা চিরদিনই দান করিতে মুক্তহস্তা; আনন্দের সহিত আমার সেই সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন।

---

* যাঁহাবা মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী পাঠ কবিয়াছেন তাঁহাবা জানেন আমাব এক প্রপিতামহ ৺মাণিকরাম দত্ত সুকবি ছিলেন। আমাদেব বংশে আবও কেহ কেহ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। আমার পিতৃদেব দুর্গাস্তব, শিবস্তব, গণেশ-বন্দনা প্রভৃতি বচনা করিয়াছিলেন। (মাইকেল) কাকা মহাশয়ের কবিত্ব-শক্তি তো তাঁহাকে অমরতা দিয়াছে।

আত্মীয়দিগের অত্যধিক যত্ন আদর পাইয়া আমার স্বভাবে কতকগুলি দোষ জন্মিয়াছিল। আমি যখন যে বাহানা করিতাম, প্রায় তৎক্ষণাৎ তাহা পূর্ণ হইত, সেজন্য আমি বড় "একগুঁয়ে" হইয়াছিলাম; যাহা ধরিতাম, তাহা সম্পন্ন হইলে তবে ছাড়িতাম। প্রায় সকল বিষয়ে ঐ রকম ছিলাম। সহজে কেহ আমাকে রুক্ষ শাসন কবিত্তেন না। কদাচিৎ আমার বাহানায় অধীরা হইয়া মা এক একটু ধমক চমক করিতেন, কিন্তু বাবার কাছে আমার সাতখুন মাপ; আমার সেই বিরক্তিকর বাহানাও বাবার কাছে খুব আমোদ বলিয়া বোধ হইত। সেই জন্য কেহ আমাকে একটু কটূক্তি বা কুব্যবহার করিলে আমার বড়ই অভিমান হইত।*

আরও এক দোষ ছিল, আমি গৃহকর্ম্ম কিছুই করিতাম না—শিখিতাম না; আমার মা, ভ্রাতৃজায়াদ্বয, পিসীমা, ঝি, চাকর প্রভৃতি কোন দিন ঘড়া হইতে আমাকে এক গেলাস জল ঢালিতে দেন নাই, কি একটি সলিতা পাকাইতে দেন নাই। আমিও সে-সব কিছু করিতে ইচ্ছা করি নাই। এক পীড়িতের শুশ্রূষা ভিন্ন আর কোনও কাজ করিতে জানিতাম না।

আমার দাদা প্রবাসে থাকিতেন, তাহা বলিয়াছি। এক মাত্র অনুজা বলিয়া তিনি আমাকে খুব স্নেহ করিতেন বটে, কিন্তু মাতা-পিতার অত্যধিক আদরে আমার "পরকাল নষ্ট হইল" বলিয়া অনেক সময় আমাকে বিশেষ শাসন করিতেন। দাদা বাড়ী আসিলে আমি "চোরের" মত হইয়া থাকিতাম। সকলের চেয়ে তাঁহাকে বেশী ভয় করিতাম।

আমার পিত্রালয় সাগরদাঁড়ি গ্রামের পাঁচ-ছয় মাইল দূরবর্ত্তী বিদ্যানন্দকাটীগ্রাম, সেখানকার বসু মহাশয়েরা ধন, মান, বিদ্যাবত্তা এবং লোকহিতকর কাজের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। আমার এক পিতৃব্যের দুইটি কন্যা ঐ বসু মহাশয়দিগের গৃহে বিবাহিতা হইয়াছিলেন। আমার সেই দিদিদিগের কয়টি দেবর কার্য্যোপলক্ষ্যে একদিন আমার সেই পিতৃব্যের বাটীতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই একজনকে দেখিয়া আমার মাতৃদেবী, তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং সচ্চরিত্রতার কথা শুনিয়া, নিজ জামাতা

* আমার সেই অভিমান ও একগুঁয়েমী হইতে একটি বিশেষ উপকাব হইয়াছিল। আমাব হস্তাক্ষব অতি জঘন্য ছিল, তাহা পূর্ব্বে বলিযাছি। আমাদেব স্কুলে একজন নূতন শিক্ষক নিয়োজিত হইযাছিলেন। তঁহাব নিকটে আমরা সকল ছাত্রী হস্তলিপি দেখাইতেছিলাম; শিক্ষক আমাব হস্তাক্ষব সকলেব অপেক্ষা নিকৃষ্ট দেখিয়া অবজ্ঞাভরে ফেলিযা দিলেন।

আমার বড় অভিমান হইল। আমি একগুঁয়ে ছিলাম কি না, তাই প্রতিজ্ঞা-পূর্ব্বক ঘবে বসিযা কেবলই লিখিতে লাগিলাম। এক সপ্তাহ পরে আবার যেদিন সকলে লেখা দেখাইলাম সেদিন শিক্ষক মহাশয় আমার হস্তাক্ষব সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট বলিযা মন্তব্য প্রকাশ কবিলেন। আবও দোষ ছিল, আমি "স্নেহনীড়ে" পালিতা বলিয়া লোক-ব্যবহাব বুঝিতাম না— আমার সামাজিক বুদ্ধিব অভাব ছিল। সেজন্য কত দুষ্ট মেয়ে আমাকে ফাঁকি দিয়া আমার খেলনা চুরি করিত, কত রকম চাতুরী করিয়া আমাব অনিষ্ট কবিত, আমি কিছুই বুঝিতাম না, শেষে মা ভর্ৎসনা করিলে কাঁদিতে বসিতাম।

করিতে একান্ত ইচ্ছুক হন। ক্রমে সেই পাত্রের সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ করেন।

এই বিবাহের সম্বন্ধ শুনিয়া হিংসা দ্বেষাদি প্রযুক্ত অনেক আত্মীয-কুটুম্ব এই বিবাহ যাহাতে না হইতে পারে, এমন চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভগবৎ ইচ্ছার প্রতিকূলে মানুষ কি করিতে পারে? আমার মাতা-পিতা, সহোদর, মাতুল প্রভৃতি আত্মীয়দিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, বাবা তাঁহার স্নেহের কন্যাকে মহাসমারোহ পূর্ব্বক, ১২৭৯ সালে ৭ই মাঘ তারিখে, সেই মনোনীত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

"বিবাহ" রূপে হিন্দু-সমাজের বালিকাদিগকে এক অন্ধকার-পূর্ণ ভবিষ্যৎ-রাজ্যে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। সেখানে হয় তাহার ভাগ্যে সুখের চন্দ্রমা, না হয় দুঃখের অমানিশা উপস্থিত হইয়া থাকে! ভগবানের দয়াকে সহস্র ধন্যবাদ, আমি যে মাতা-পিতার সন্তান হইয়া জন্মিয়াছিলাম, তাঁহাদিগের স্নেহ ও সুবিবেচনায় সহস্র ধন্যবাদ, আর আমার দাদা এবং আত্মীয়-বন্ধু যাঁহারা আমার সেই বিবাহের অত আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সদাশয়তাকেও সহস্র ধন্যবাদ। বাবা আমাকে সেই বালিকা বয়সে যাঁহার হাতে দিয়াছিলেন তিনি ধার্ম্মিক, কৃতবিদ্য, সংযত, সুশীল ও চরিত্রবান। —আমার মনে হয় আমি কোন প্রকারেই তাঁহার যোগ্যা পাত্রী ছিলাম না!—তার পরে আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি যে রকম অদ্ভুত রকমের ছিল তাহাতে যদি কোন অধর্ম্মাচারী, অসহিষ্ণু, নির্ম্মম, স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়িতাম, তাহা হইলে আমার দুঃখের পরিসীমা থাকিত না।

বাল্য বিবাহের ফলে আমি তাঁহার গুণের মর্ম্ম বুঝিবার অবকাশ পাই নাই। জল, বায়ু, আলোকাদির মত তাঁহার স্নেহ, দয়া ও শুভাকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত সহজপ্রাপ্য বলিয়া আমি তাঁহার বিশেষত্ব কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তবে তাঁহার প্রতি আমার মাতা-পিতার একান্ত আদর ও যত্ন দেখিয়া আমি তাঁহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতাম; তাঁহাকে খুব সম্ভ্রম করিতাম; শিক্ষকের নিকটে ছাত্রী যেমন বিনীতা, আমিও তাঁহার কাছে সেইরূপ বিনীতা থাকিতাম। আমি যে কবিতা রচনা করিতে পারি, এ কথা যাহাতে তাঁহার কর্ণ-গোচর না হয়, সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতাম। তিনি উহা জানিলে আমি লজ্জায় মরিয়া যাইব, ইহাই আমার ধারণা ছিল।

বিবাহের সময়ে চারি পাঁচ দিন শ্বশুরালয় গিয়া শ্বশুর, শাশুড়ী, ননন্দা, যাতা প্রভৃতি নূতন আত্মীয়দিগের যথেষ্ট আদর পাইয়া মাতৃ-ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। তখনও আমার লেখাপড়া চলিতেছিল। বাবার বৈঠকখানায় বসিয়া পণ্ডিত মহাশয় আমাকে পড়াইয়া যাইতেন। আমি বারো বৎসরে পড়িতেই সেই শিক্ষক অন্যত্র চলিয়া গেলেন; অন্য নূতন শিক্ষকের কাছে আমাকে আর পড়িতে দিলেন না। তখন আমি ঘরে বসিয়া লেখাপড়া করিতাম।

তেরো বৎসর বয়সে পড়িয়াই অর্থাৎ বারো বৎসর উত্তীর্ণ হইবা মাত্র আমাকে

দ্বিতীয় বার শ্বশুরালয়ে যাইতে হইয়াছিল। আমার এক গুঁয়েমী এবং অভিমানাদির জন্য পাছে সেখানে গঞ্জনা পাই, সেই ভয়ে মা আকুল হইয়াছিলেন। মা'র আকুলতা দেখিয়া ঐ-সকল দোষ পরিত্যাগ করিব-- অন্ততঃ আমার শ্বশুর বাড়ীতে কেহই আমার ঐ-সকল দোষের পরিচয় পাইবেন না, ইহা আমি মনে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম।

আমার শ্বশুরালয়ে গিয়া দেখি, তাঁহারা বৃহৎ পরিবার। তাঁহাদের বাটীর মধ্যে একটি বারান্দায় বালিকা-বিদ্যালয় হইত। একজন অতি সচ্চরিত্র আত্মীয় শিক্ষকতা করিতেন। বাড়ীর এবং পাড়ার প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েরা সেখানে পড়া-শুনা করিত; তাহার মধ্যে কেহ কেহ বিবাহিতাও ছিলেন। আমার অন্যতম শ্বশুর স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি এবং লোকহিতকর কার্য্যে একান্ত মনোযোগী ছিলেন। ৺রাসবিহারী বসু। ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। তাঁহারই যত্ন ও চেষ্টায় আমার শ্বশুর পরিবারে, অন্যান্য পরিবার অপেক্ষা গৃহ-শিক্ষা বিশেষরূপে হইয়াছিল। মেয়েদের মধ্যে পরিচ্ছদের উন্নতি দেখিয়াছিলাম। মিশনরী মহিলাদিগকে বিদ্যানন্দকাটীতে আনিয়া মেয়েদিগকে সেলাই শিখান হইত। আমি দেখিলাম আমার প্রাচীনা শাশুড়ীরা ও চস্‌মা চোখে দিয়া মহাভারত, রামায়ণাদি গ্রন্থ পাঠ করেন। বাড়ীতে মাইনর স্কুল, পোষ্টাপিস ছিল। এ-সব আমার সেই দেবতুল্য শ্বশুর ঠাকুরের যত্ন ও চেষ্টায় হইয়াছিল।

প্রথম প্রথম সেখানটা আমার ভাল লাগিত না। আমার পিতার সেই স্নেহ-ভবন—সেখানে আমার জন্য মাতা-পিতার প্রাণ-ভরা স্নেহ, ভ্রাতা ও ভ্রাতৃ-জায়াদিগের দয়া-মমতা, সঙ্গিনীদিগের প্রীতি, সকলেরই আত্মীয়তা-পরিপূর্ণ আশ্বাস, সেই গৃহে ফিরিয়া যাইতেই ইচ্ছা যাইত। তার পরে সেখানে অনেক লোক ছিলেন, তাঁহাদের প্রকৃতিও নানা রকম। আমাকে "অদ্ভুত জীব" দেখিয়া অর্থাৎ আত্ম-গোপন করিতে অক্ষম, ছলনা-চাতুরীতে অনভ্যস্ত এবং গৃহ-কর্ম্মে অশক্ত, এমনতর অদ্ভুত জীব দেখিয়া অনেকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং নিষ্ঠুর সমালোচনা করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। কেবল আমি বলিয়া নহি, বঙ্গ গৃহের অনেক বালিকা বধূকেই এইরূপে "মানুষ" হইতে হয়।

যাহা হউক, ক্রমে ক্রমে আমাকে বিনীতা ও আজ্ঞানুবর্ত্তিনী দেখিয়া গুরুজনেরা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন। আর আমার তখনকার সরলতা ও কবিতা রচনার ক্ষমতা দেখিয়া ননন্দা প্রভৃতি সমবয়স্কাগণ আমাকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিলেন। এখানে আমি এক-গুঁয়েমী ও অভিমান ত্যাগ করিয়া সকলকে প্রসন্ন করিতে এবং গৃহকর্ম্ম শিখিতে একান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার জ্যেষ্ঠা যাতা শিল্প কাজে সুনিপুণা, তাঁহার নিকটে সেলাই শিখিলাম।

তখন পতি-দেব কলিকাতায় পড়িতেন। ছুটিতে বাটী আসিয়া আমার ননন্দাদিগের

নিকটে আমার কবিতা রচনার কথা শুনিলেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ এক একটি কবিতা রচনা করিতে বলিলেন। তিনি যে আমার পরম সুহৃদ্, শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া তাহাই আমার বিশ্বাস হইল। ক্রমশঃ তাঁহাকে সুখী ও সন্তুষ্ট করাই আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে আমি সহস্র গৃহ-কর্ম্মের মধ্যে দিনের বেলায় এক একটি পদ্য লিখিয়া রাত্রিতে তাঁহাকে "উপহার" দিতাম। এই কাজ খুব গোপনে করিতে হইত। কারণ, তখনকার দিনে এরূপ কাজ বড়ই "লজ্জার", বড়ই "অসমসাহসের" এবং বড়ই "বিরক্তি"র বিষয় হইত। যাহা হউক, স্বামী ইহাতে বড়ই আনন্দিত হইতেন এবং পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত উহা পাঠ করিতেন। বন্ধুগণ সেই কবিতার সুখ্যাতি করিতেন; কিন্তু আমি পাছে সুখ্যাতি শুনিয়া অহঙ্কৃতা হইয়া উঠি, এ-জন্য স্বামী অত্যন্ত সতর্ক হইতেন। পরবর্ত্তী তিনি আমার নিকটে—যিনি আমাদের বঙ্গ-মহিলা-কুলের শীর্ষস্থানীয়া সেই "দীপনির্ব্বাণ" "ছিন্ন-মুকুল"-রচয়িত্রী, সুকবি প্রসন্নময়ী দেবী প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণের আদর্শ রচনা শক্তি আমার সম্মুখে ধারণ করিতেন। আমাকে ভাল করিয়া লেখাপড়া শিখাইতে তাঁহার মনে মনে বড়ই ইচ্ছা হইত, কিন্তু তিনি সময় ও সুযোগ পাইতেন না। তাঁহার নিজের পাঠ্যাবস্থা, সেজন্য অধিকাংশ সময়ে কলিকাতায়ই থাকিতেন, যে সময়ে বাটী আসিতেন, তখন গুরুজনদিগের শাসনে, লজ্জার অনুরোধে দিনের বেলায় আমার সহিত সাক্ষাৎ হইত না। রাত্রি ১২টা কি ১টার সময়ে যখন শয়ন-গৃহে যাইতাম, তখন আমি পড়িতে ইচ্ছা করিলেও, তিনি আমার অসুস্থতার আশঙ্কায় নিষেধ করিতেন; সেই জন্য তাঁহার কাছে আমার লেখাপড়া হইত না।

২

আমার বয়স যখন চৌদ্দ বৎসর, তখন আমি "পুরন্দরের প্রতি ইন্দুবালা" শীর্ষক অমিত্রাক্ষর ছন্দে, বীর-রস-পূর্ণ একটি কবিতা লিখিয়া স্বামীকে দিয়াছিলাম; তাহার প্রথম কয়েক ছত্র এই:—

দুরন্ত যবন যবে ভারত ভিতরে
পশিল আসিয়া, পুরন্দর মহাবলী
কেমনে সাজিলা রণে, প্রিয়তমা তার
ইন্দুবালা, কেমনে বা করিলা বিদায়?
কৃপা করি কহ মোরে হে কল্পনা দেবী!
কেমনে বিদায় বীর হ'ল প্রিয়া-কাছে।

পদ্যটি সুদীর্ঘ হইয়াছিল। স্বামী এবং তাঁহার কলিকাতার বন্ধুগণ ইহা পড়িয়া বিশেষ প্রীত হন। কিছু দিন পরে একজন বন্ধু এই কবিতাটি 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রে মুদ্রিত করেন। ইহাই আমার প্রথম প্রকাশ্য লেখা।

কবিতাটি মুদ্রিত করিয়া উক্ত কাগজের সম্পাদক টীকায় লিখিয়াছিলেন, "আমরা অবগত হইলাম, লেখিকা কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রী ; ইনি ইঁহার পিতৃব্য-সৃষ্ট বাঙ্গলা অমিত্রাক্ষরে যে কবিতা লিখিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার গলায় আমরা প্রশংসার শত-নরী হার পরাইলাম। চর্চ্চা থাকিলে ইঁহার মধুময়ী লেখনী কালে অমৃত প্রসব করিবে।"

ইহা দেখিয়া পতিদেব আমাকে বলিয়াছিলেন, "লোকে প্রশংসা করিতেছে বলিয়া তুমি যেন গর্ব্বিতা হইও না। দেখ দেখি, তোমার কাকা কত বড় ক্ষমতাপন্ন কবি ছিলেন ; তুমি তাঁহার উপযুক্তা ভ্রাতুষ্পুত্রী হইলে তবে আমার মুখোজ্জ্বল হইবে। স্ত্রীলোকের রচনা বলিয়াই সকলে এতটা প্রশংসা করে।"

যাহা হউক, আমি বিশেষ উৎসাহ পাইয়া দুই বৎসরের মধ্যে অনেক গুলি গীতিকাব্য, খণ্ডকাব্য এবং উপন্যাস লিখিয়াছিলাম। তাহা স্বামীর কাছে দিয়াছিলাম ; তিনি তাঁহার কয়েকটি বন্ধুর একান্ত প্রার্থনায় তাঁহাদিগকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

স্বামী আমাকে কলিকাতা হইতে ইংরাজী শিখিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার আদেশে আমি আনন্দের সহিত আমার একখানা খাতাকে সঙ্গিনী করিয়া বাটীর বালকদিগের নিকটে ইংরাজী পড়িতে প্রবৃত্তা হইয়াছিলাম।

আমার বয়স যখন সতর বৎসর তখনই আমার একমাত্র সন্তান—আমার কন্যাটি ভূমিষ্ঠা হয়। তখন আমি পিত্রালয়ে ছিলাম।

আমার কন্যার বয়স যখন কুড়ি দিন, তখন আমার পরমারাধ্যতম স্নেহময় বাবা আমাদিগকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বর্গে গমন করেন।

তাঁহার উদ্দেশে আমি একটি শোক-গাথা লিখিয়াছিলাম। তারপর অনেকদিন আর লেখাপড়া করিতে পারি নাই।

পর বৎসর স্বামী মেডিকেল কলেজ হইতে এল্, এম্, এস্ (L. M. S.) উপাধি প্রাপ্ত হন। স্বাধীনভাবে ডাক্তারি করিতে, এবং কলিকাতায় থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি পরীক্ষা দিয়া উপাধি লইয়া বাটী আসিলে কিছুদিন পরে আমাদের কন্যাটি এবং বাটীর অনেকে পীড়িত হন। তাঁহাদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা তিনিই করিতে লাগিলেন।

সেই বৎসর আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার স্ত্রী কতকগুলি শিশু-সন্তান রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুতেও আমি যারপর-নাই আকুল হইয়াছিলাম ; সেদিন পতিদেব আমাকে যে স্নেহপরিপূর্ণ সান্ত্বনা দিয়াছিলেন, তাহা আজিও মনে হইলে

আমার প্রাণ লোকাতীত রাজ্যের আরাম উপভোগ করে!

কিন্তু আমার অদৃষ্টে এত সুখ ও সৌভাগ্য বেশীদিন সহিল না! আমার শ্বশুরঠাকুরের অনুরোধে এবং কয়েকটি সম্ভ্রান্ত বন্ধুবান্ধবের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে স্বামী সাতক্ষীরা মহকুমায় ডাক্তারি করিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই সেখানে "সুদক্ষ চিকিৎসক" বলিয়া সাধারণের চিত্তাকর্ষক হইলেন। দু'জনেই মনে করিয়াছিলাম, এইবারে আমাদের সকল কষ্টের অবসান হইল। তিনি আমাকে বারংবার বলিয়াছিলেন, "এইবার আশ্বিনমাস হইতে তোমাকে, খুকিকে এবং আমার ছোট ভাই দু'টিকে আমার কাছে লইয়া যাইব।" আমার এক ননন্দা পীড়িতা হওয়াতে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন। দুই তিনদিন মাত্র বাড়ীতে থাকিয়া, ২৭শে বৈশাখ সাতক্ষীরায় চলিয়া গেলেন। আমরা উভয়েই আশ্বিনমাসের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।

শ্রাবণ মাসে তাঁহার দারুণ পীড়ার সংবাদ আসিল। আমার শ্বশুর, আমার অন্যতর ডাক্তার দেবর, আমার দাদা প্রভৃতি একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া সাতক্ষীরায় চলিয়া গেলেন। কেহ আমাকে লইয়া যাইবার কথা বলিলেন না। আমি হিন্দু কুলবধূ, লজ্জায় ভয়ে কিছুই বলিলাম না। কেবল তাঁহার আরোগ্য সংবাদ পাইবার জন্য পথ চাহিয়া রহিলাম; কেবল তাঁহার মঙ্গল-কামনায় ভগবানকে ডাকিলাম। এই সময়ে এক সদাশয়া সহৃদয়া বিধবা মহিলা, আমাকে যে রকম আশ্বাস ও শক্তি দিতেন, তাহা আমার মনে চিরদিনই মুদ্রিত হইয়া আছে।

তারপরে আর কি বলিব? সংবাদ পাইলাম, যিনি আমার রমণী-জীবনের অবলম্বন, আমার সেই পরোপকারী, দয়ালু, দেবপ্রতিম পতিবন্ধু, তিনি ২৯শে শ্রাবণ সোমবারের রাত্রিতে আমাকে জগতের দুয়ারে হতভাগিনী করিয়া ভগবানের কাছে চলিয়া গিয়াছেন! ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে বিদ্যানন্দকাটীর বাটীতে থাকিয়া আমি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম।*

অতি বাল্যকাল হইতে ভগবানকে আমি ভক্তি-বিশ্বাস করিতাম। আমার পিতৃদেব এই ভক্তি-বিশ্বাসের বীজ বপন করেন এবং স্বামী ইহার বিকাশ সাধন করেন। যে কোন বিপদ বা ভয়ের সম্ভাবনায় আমি সেই বিপদ্ভঞ্জন দেবতার অভয়চরণে শরণ লইতাম। কিন্তু যখন সেই সর্ব্বশক্তিমান দেবতা থাকিতে আমার এমন সর্ব্বনাশ হইল, তখন তাঁহার করুণার উপরে আমি অবিশ্বাসিনী হইলাম। তাঁহার উপরে আমার ভয়ানক রাগ হইল।

*আমার স্বামিদেব পরলোক গমন করা অবধি আমি তাঁহার বিষয়ে অনেক আশ্চর্য্য অথচ সত্যবিষয়ক স্বপ্ন দেখিয়াছি। আমার পারিবারিক আত্মীয়দিগের মধ্যে অনেকে তাহা জানেন। তখন আমার বয়স উনিশ বৎসর পূর্ণ হয় নাই —সাড়ে আঠারো।

অতি বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এইরূপ হইয়াছিল যে, কোনরূপ সুখ-দুঃখাদি কর্ত্তৃক আমার মন একটু উত্তেজিত হইলে আমার একটি কবিতা হইত। এই কবিতা প্রায়ই পদ্য, সময়ান্তরে গদ্য কবিতাও লিখিতাম। আমি যখন সেই তরুণ বয়সে নিদারুণ পতিশোক প্রাপ্ত হইলাম, তখন যেন আমার হৃদয় পিষিয়া কবিত্বশক্তি সকল বাহির হইতে লাগিল। এই শোকোন্মাদ অবস্থায় আমার গদ্য-কাব্য "প্রিয়-প্রসঙ্গ"[৮৬] রচিত হইয়াছিল। উহা কেবল নিজের মনকে সান্ত্বনা দিবার জন্যই লিখিতাম। বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য কোন চিন্তা করি নাই।

আমার একজন কৃতবিদ্য আত্মীয় তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে ঐ হস্ত-লিপি দেখিতে পান, এবং উহা ছাপাইলে বিধবা রমণীগণের একটা সান্ত্বনার জিনিস হইবে, এইরূপ পরামর্শ দেন। আমার স্বর্গীয় পতিদেবের একটি স্মৃতি রক্ষা হইবে, ইহা মনে করিয়া উহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে আমি একান্ত উৎসুক হই। আমার স্বামীর পরলোক গমনান্তে আমার আত্মীয়গণ, তাঁহার কিছু অর্থ আমাকে আনিয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই অর্থ দিয়া আমার আত্মীয়ের নিকটে উহার মুদ্রাঙ্কনের ভার প্রদান করি। পুস্তকে আমার নাম এবং পরিচয় দিতে নিষেধ করি। এই কাজ খুব গোপনে করিয়াছিলাম। এখন আমার মনে হয়, তখন আমার যে রকম লজ্জা সঙ্কোচাদি ছিল, তাহাতে যদি আমার মন সেরূপ অপ্রকৃতিস্থ না হইত, তবে আমি "প্রিয-প্রসঙ্গ" ছাপাইতে পারিতাম না। যাহা হউক "প্রিয প্রসঙ্গ" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইলে, আমার আত্মগোপনের বহু চেষ্টাসত্ত্বেও অনেকে বুঝিতে পারিলেন আমিই উহার রচয়িত্রী। তখন অনেক হিংসা, দ্বেষ, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা আমাকে সহিতে হইয়াছিল। আমার এত আদরের "প্রিয-প্রসঙ্গ" ও সাধারণের কাছে আদৃত হয় নাই। বিজ্ঞাপনাদি অভাবে অনেকে উহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অনেকদিন জানিতে পারিলেন না। সেই সময়ে আমার স্বর্গীয় পতিদেবের স্নেহময় অগ্রজ, আমার সদাশয় দেবপ্রতিম ভাশুর মহাশয়, উহা বিশেষ আদরে গ্রহণ করিয়া আমাকে সান্ত্বনা ও উৎসাহ দিয়াছিলেন।

যখন ক্রমশঃ দিন যাইতে লাগিল, তখন কেবল গুরুজনের সেবা, শিশু-পালন অথবা সংসারের কাজকর্ম্ম করিয়া আমার হৃদয়ের তৃপ্তি হইল না। বাকী জীবনটি কি করিয়া কাটাইব, তাহাই আমার চিন্তার বিষয় হইল। ভগবান এ অধম সন্তানকে যে বিদ্যানুরাগ ও একটু কবিত্বশক্তি দিয়াছিলেন, তাহাই অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ক্রমে মনে বুঝিলাম, জগতে থাকিতে হইলে বিশ্ব-বিধাতার কাজে আত্মোৎসর্গ করা উচিত। বলা বাহুল্য, তখন ভগবানের স্নেহে অবিশ্বাস বা তাঁহার উপরে আমার অভিমান দূর হইয়াছিল। আমার অদৃষ্ট-ফল আমি পাইলাম, ইহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইল।

আমি মনে করিলাম, সধবা মহিলাদিগের যেমন সংসারের কাজ করা কর্ত্তব্য, বিধবা মহিলাদিগের সেইরূপ সমাজের কাজ করা কর্ত্তব্য। ইহা যখন আমার "সত্য" বলিয়া ধারণা হইল, তখন সেই অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতা দ্বারা সমাজের সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম।

এই সময়ে আমি পুরাতন বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা, বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশযের কবিতা এবং সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক গ্রন্থ পড়িতাম। নবজীবন, প্রচার, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্র এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশযের হৃদযোচ্ছ্বাস[৪৭] পড়িতে আমার স্বদেশ ও স্বজাতীয়া ভগিনীদিগের জন্য অনেক চিন্তা উপস্থিত হইত। সেই সকল চিন্তা আমি অনেক সময়ে লিপিবদ্ধ করিতাম। যখন পিত্রালযে থাকিতাম, তখন আমি দাদার নিকট অনেক মিনতি করিয়া তাঁহার কাছে একটু ইংরাজি পড়া শিখিয়া লইতাম। একখানি উপক্রমণিকা ব্যাকরণ হইতে শব্দরূপ, ধাতুরূপ প্রভৃতি মুখস্থ করিতাম। আমার দাদার প্রথমা পত্নী-বিয়োগ ঘটিলে তাঁহার পূর্ব্বতন উৎসাহ, স্ত্রী-শিক্ষানুরাগ প্রভৃতি হ্রাস হইযাছিল ; সেই জন্য আমার বড় অসুবিধা হইত। এ সময়ে আমি আমার বিশেষ আত্মীয় ব্যতীত কোন পুরুষের সম্মুখীনা হইতাম না; কোনরূপ আমোদ বা উৎসাহে যোগ দিতাম না এবং স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গেও বিশেষ মিশামিশি বা রহস্যালাপ করিতাম না। আমার স্বর্গীয় স্বামীর দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমার উপরে নিপতিত আছে, ইহাই আমার ধারণা ছিল।

আমাদেব বাড়ীতে "সখা" নামক মাসিকপত্র আসিত।[৪৮] সম্পাদক প্রমদাচরণ সেন দেশেব বালক-বালিকাদিগকে জ্ঞানানুশীলন এবং নীতিশিক্ষা দান করিয়া গঠিত চরিত্র করিবেন এই উদ্দেশ্যে "সখা" প্রবর্ত্তন করেন। আমি তাঁহার এই সাধু কাজের কিছু সহায়তা করিতে একান্ত ব্যগ্র হইলাম। "সখা"র উপযুক্ত কবিতা লিখিয়া প্রমদাবাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি যত্নপূর্ব্বক প্রকাশ করিলেন। সেই হইতে কিছুদিন পর্য্যন্ত "সখা"য লিখিতে লাগিলাম।

কিছুদিন পরে প্রমদাবাবু ইহ-জগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। সেই অ-দৃষ্ট বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদে আমি মনে মনে বড় শোকাকুলা হইলাম। এরূপ দুঃখে কেহ সহানুভূতি করিবে না বলিয়া কাহাকেও বলিলাম না। তখন "শোক-সঙ্গীত"-শীর্ষক একটি কবিতা লিখিয়া সখার উদ্দেশে প্রেরণ করিলাম। প্রমদাবাবুর ভ্রাতা এবং "সখা"র রক্ষক বাবু অন্নদাচরণ সেন তাহা সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনেকগুলি প্রাপ্ত কবিতা হইতে কেবল আমার সেই কবিতাটি "সখা"য় প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে একখানি অতি সুন্দর ছবির পুস্তক উপহার দিয়াছিলেন।

আমার জাতীয় ভগিনীগণের জন্য কিছু কাজ করিতে আমার আকাঙ্ক্ষা বড়ই প্রবল হইল। সেই জন্য অনেক চেষ্টা করিয়া আমি বামাবোধিনীর লেখিকা শ্রেণী-ভুক্তা

হইলাম। কিছুদিন বামাবোধিনীতে কবিতা লিখিয়াছিলাম। তাহার অধিকাংশ আমার স্বর্গীয় পতিদেবের উদ্দেশে রচিত।

বামাবোধিনীর ২৫শ বর্ষ পূর্ণ হইলে ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত্ত বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়, উহার জন্য "জুবিলী" করেন। সেই সময়ে অনেকগুলি পুরস্কার প্রবন্ধের বিজ্ঞাপন দেন। আমি তিন চারিটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, এবং প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিশ টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলাম। বামাবোধিনীর বিজ্ঞাপনানুসারে "বনবাসিনী" নামক এক ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়া উক্ত সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।[৪৯] তিনি উহা অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়া আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়া বামাবোধিনী জুবিলীতে বিতরণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বিধবা রমণীর কর্ত্তব্য বিষয়ে আমি অনেক সময়ে চিন্তা করিতাম। সেই চিন্তার ফলে আমার মনে হইল, জ্ঞানধর্ম্মে আত্ম গঠন করিয়া, ভগবানের চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া, হৃদয়ের মধ্যে স্বর্গীয় স্বামীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া, জাতীয় ভগিনীগণের উন্নতি সাধন, শিশুদিগকে উপযুক্তরূপে গঠন এবং অনাথ আতুরদিগকে সেবা, ইহাই বিধবা রমণীদিগের কর্ত্তব্য। আমার এই কথা জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য উপন্যাসাকারে "বনবাসিনী" লিখিয়াছিলাম। ইহা বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় স্বতঃই বুঝিয়াছিলেন। বনবাসিনীর প্রকাশের কয়েক বৎসর পরে যখন কলিকাতায় "দাসাশ্রম"[৫০] প্রতিষ্ঠা হয়, তখন উক্ত মহাশয় আমাকে এক পত্র লিখেন, "মা! তোমার 'বনবাসিনী' কল্পনা সফল হইয়াছে, কলিকাতায় দাসাশ্রম নামক এক 'স্নেহভবন' স্থাপিত হইয়াছে"— ইত্যাদি। ঐ ক্ষুদ্র পুস্তক সাধারণের নিকটে খুব আদৃত হইয়াছিল।

এই "জুবিলী" সময় হইতে বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় আমাকে নিজ কন্যারূপে স্নেহ করেন। আমার শরীর, মন ও আত্মার কল্যাণ সাধন, তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। আমার লেখা তিনি সাগ্রহে, সমাদরে সম্পাদকীয় স্তম্ভে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। লিখিত বিষয়ে কোন ত্রুটি হইলে তাহাও স্নেহের সহিত বুঝাইয়া দিতেন। আমাকে যেরূপ সদুপদেশ দিয়া পত্র লিখিতেন, আমার জীবনে তাহা যেরূপ প্রার্থনীয়, সেইরূপ দুষ্প্রাপ্য। তিনি ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য এবং দেবতুল্য চরিত্রবান জানিয়া তাঁহার কাছে পত্রাদি লিখিতে আমার কিছুমাত্র লজ্জা সঙ্কোচ হইত না। আমি মনে মনে তাঁহাকে আমার পিতৃদেবের মত ভক্তি করিতাম।

এই সময় হইতে বামাবোধিনীতে আমি পদ্য অপেক্ষা গদ্য প্রবন্ধ অধিকাংশ লিখিতে লাগিলাম। আমাদের অন্তঃপুর শিক্ষার জন্য শিক্ষয়িত্রী, পল্লীগ্রামের স্ত্রী-চিকিৎসক এবং ধাত্রীর আবশ্যকতা বিষয়ে আমি সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ জন্য একাধিকবার

প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। বাল্য-বিবাহ নিবারণ এবং বরপক্ষের অর্থলুব্ধতা নিবারণ জন্যও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম।

অতঃপর আমি নব্যভারত পত্রে কবিতা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সেই সঙ্গে অন্যান্য মাসিক পত্রে দুই চারিটি কবিতাও প্রকাশ করিয়াছিলাম।

ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের পুরস্কার প্রবন্ধ "বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধর্ম্ম" রচনায়, প্রতিযোগিতা পরীক্ষায়, আমি ১২৯৬ সালে পুরস্কার পাইয়াছিলাম। ঐ কথা শুনিয়া আমার কয়জন আত্মীয় "যশোহর-খুলনা-সম্মিলনী" সভার বিজ্ঞাপনানুসারে "বিবাহিতা রমণীর কর্ত্তব্য" বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করেন। সেই প্রবন্ধের জন্য প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় আমি প্রথম হইয়াছিলাম এবং মিসেস্ বি, দে প্রদত্ত রৌপ্য মেডেল পাইয়াছিলাম।

সম্মিলনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা সেই প্রবন্ধটি উক্ত সম্মিলনীর কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ করেন। বামা-হিতৈষী পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়[৫১] তাহা দেখিয়া নিজ সহৃদয়তায় একান্ত আনন্দিত হন, এবং আমাকে বিশেষ উৎসাহজনক পত্র লিখিয়া কতকগুলি পুস্তক পাঠাইয়া দেন। ঐ প্রবন্ধ দেখিয়া মহাত্মা যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ডাক্তার (ধাত্রী-শিক্ষা-প্রণেতা) তাঁহার "বাঙ্গালীর মেয়ের নীতি শিক্ষা" পুস্তকে আমার নাম মুদ্রিত করিয়া, বিশেষ গৌরবসূচক এক পত্র মুদ্রিত করিয়া, উহা আমাকে উপহার দিয়াছিলেন।[৫২]

ইহার পরে আরও দুইবারে আমি যশোহর-খুলনা-সম্মিলনীতে "সুশীলা রমণীর পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য" এবং "মহৎ জীবন" নামক প্রবন্ধ রচনায় প্রথম বিবেচিত হই, এবং শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার পাই।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ও আমাকে যারপরনাই স্নেহ ও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তাঁহার এবং বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়ের আগ্রহাতিশয়ে আমি অধিকতর মনোযোগপূর্ব্বক ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিখিতে চেষ্টা করি। তখন আমার শিক্ষক বিশেষ কেহই ছিল না। আমি ভগবানের উপরে নির্ভরপূর্ব্বক একান্ত চেষ্টা করিতেছিলাম। একদিন ইংরাজী পড়িতাম আর একদিন সংস্কৃত পড়িতাম। ইংরাজী এবং দেবনাগর অক্ষর লিখিতেও শিখিতাম। যেদিন আমার ইংরাজী হস্তাক্ষর বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম, আর যে দিন টীকা দেখিয়া কুমার-সম্ভব পড়িতে পারিয়াছিলাম, সেই দুই দিন ঐ মহাশয়দ্বয় যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমার চিরস্মরণীয়। মানবের মাতৃ-পিতৃ-স্নেহঋণ যেন অপরিশোধনীয়, ঐ দুই আরাধ্যতম স্নেহের ঋণও আমার সেইরূপ অপরিশোধ্য।

আমার পূজনীয় পিতৃব্য মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিস্থলে যখন স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা হয়, তখন ভক্তিভাজন বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়ের আদেশক্রমে আমি একটি

কবিতা লিখিয়াছিলাম। তিনি তাহা নিজ ব্যয়ে ছাপাইয়া, উক্ত কার্য্যস্থলে বিতরণ করেন। সেই সূত্রে উক্ত কবিবরের জীবনী-প্রণেতা, আমার অগ্রজ-প্রতিম ভক্তিভাজন যোগীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের[৫৩] নিকটে আমি পরিচিতা হই।

এই সকল সময়ে আমাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইত। আমি ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে উঠিয়া, প্রাত্যঃকৃত্য সমাপনান্তে গীতাপাঠ করিতাম। আমার গীতাপাঠ শেষ হইলে তখন বাড়ীর সকলে উঠিতেন। তখন আমি ব্যাকরণ-কৌমুদীর খানিকটা মুখস্থ করিতে করিতে, অথবা ইংরাজী বানান শিখিতে শিখিতে গৃহকর্ম্ম করিতাম। আহারের সময়ে বেশী খাইলে পাছে শরীরে আলস্য হয় সেই ভয়ে সামান্যরূপ আহার করিতাম। দিনের বেলায় ৩/৪ ঘণ্টা এবং রাত্রিতে ৫/৬ ঘণ্টা লেখা-পড়ার সময় পাইতাম। আহার নিদ্রা বিষয়ে বিশেষ সংযত হইয়াছিলাম। কিন্তু বেশী দিন ইহা সহিল না —সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় আমার "শারীরিকী-বৃত্তি সকল যথোচিত অনুশীলিত" হইয়াছিল না, তাই কিছুদিন মধ্যে আমার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল।

বলিয়াছি, বামাবোধিনী, নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্রে আমি কবিতা লিখিতাম। পূজনীয় কবিরত্ন মহাশয় স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হইয়া সেই সকল সংগ্রহপূর্ব্বক "কাব্য-কুসুমাঞ্জলি" নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।[৫৪] তিনি স্বয়ং উহার বিজ্ঞাপন লিখিয়া দেন। দেশের অনেক প্রথিতযশা ব্যক্তিগণ — সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমবাবু, কবিবর হেমবাবু ও নবীনবাবু, মনীষী চন্দ্রনাথবাবু, জাষ্টিস্ গুরুদাসবাবু, ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণবাবু প্রভৃতি কাব্য-কুসুমাঞ্জলি পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া আমাকে যারপরনাই উৎসাহ দিয়াছিলেন।

ইহার পরেও স্নেহময় কবিরত্ন মহাশয়ের আগ্রহ ও অনুগ্রহে আমার "কনকাঞ্জলি", "প্রিয়-প্রসঙ্গ" (২য় সংস্করণ), "বীরকুমার-বধ কাব্য" জনসমাজে প্রকাশিত হইয়াছে।[৫৫]

বামাবোধিনীর ত্রিশ বৎসর বয়সেও এক জুবিলী হইয়াছিল; আমি তাহাতে বিজ্ঞাপনানুসারে "বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীদিগের অবস্থা"-শীর্ষক এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়[৫৬] তাহার পরীক্ষক ছিলেন, সেবারেও আমি কয়েকজন পুরুষ ও রমণীর সহিত প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হই।

যাঁহারা দেশ-হিতৈষী, নারী-হিতৈষী এবং সমাজ-শিক্ষক, তাঁহাদিগকে আমি মনে মনে গভীর ভক্তি করিতাম। বরিশালের শ্রদ্ধেয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের "ভক্তিযোগ"[৫৭] পড়িয়া অবধি প্রত্যহ প্রত্যূষে তাঁহার উদ্দেশে প্রণাম করিতাম।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আমি জীবনে কখনও না দেখিলেও তাঁহাকে একান্ত আত্মীয়ের ন্যায় ভক্তি করিতাম। তাঁহার মৃত্যু সময়ে আমি আমার জনৈক

ডাক্তার দেবরের বাসায় কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলাম। সেই ১৩০১ সালের ১৪ই শ্রাবণ আমার অন্যতমা শাশুড়ীর সহিত নিমতলার ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া বঙ্গবাসিনীগণের পিতৃতুল্য সুহৃদ, বঙ্গভূমির উজ্জ্বলতম রত্ন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত দেহ দেখিতে পাইলাম। তাঁহাকে মৃত দেখিয়া, আমার হৃদয়ে যে কি আঘাত লাগিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। আমি বাড়ীতে ফিরিয়া, অশ্রুপাত করিতে করিতে তখনই শোকোচ্ছ্বাস শীর্ষক এক গদ্য কবিতা লিখিয়া, চির সুহৃদ্ বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয়ের নিকটে পাঠাইয়াছিলাম। ক্রমে ক্রমে আরও তিন চারিটি কবিতা লিখিলে বামাবোধিনী সম্পাদক মহাশয় এবং কবিরত্ন মহাশয় উহা পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন।

"কাব্য-কুসুমাঞ্জলি" প্রকাশিত হইবার কিছুদিন পরে আমরা দেওঘরে গিয়াছিলাম। সেখানে ঋষিপ্রতিম রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে যে আদর ও স্নেহ করিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে চিরদিনই জাগিয়া আছে। আমি আসিবার সময়ে বলিয়াছিলেন, "মা! আমাকে মনে রাখিও, তোমার কবিতা আমি মুখস্থ করিয়া থাকি"— লজ্জা ও আনন্দে বিহ্বল হইয়া আমি তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

ইহার কিছু দিন পরে আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রণাম করিতে যাই। সেই নর-দেবতা যখন আমার মাথায় হাত দিয়া আমাকে অমৃতময় আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তখন আমার জীবন যেন পবিত্র হইয়াছিল।

যাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান মহিলা-কুলের গৌরব, সেই সকল বঙ্গবাসিনী দেবীদিগকে আমি চিরদিনই ভক্তিশ্রদ্ধা সহ পূজা করিয়া তৃপ্তিলাভ করি।

এই বঙ্গদেশে যাঁহারা সমাজ-শিক্ষক রূপে পরিগণিত — যাঁহারা ধর্ম্মবেত্তা, নীতিবেত্তা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এবং সুকবি, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে মনুষ্যত্ব লাভে সহায়তা করিয়াছেন (ব্যক্তিগত ভাবে না হইলেও শক্তিগত ভাবে), আমি এই সকল লোকের নিকটে ঋণী। এই রূপে নব্যভারতের অন্যতম সুকবি বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিত্ব শক্তি এবং ৺গিরিজাপ্রসন্ন রায়-চৌধুরী মহাশয়ের[৮] সাহিত্যিক শক্তির নিকটে আমি বহুল পরিমাণে ঋণী। সকলের অপেক্ষা সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্রের ঋণই আমার গুরুতর। কেবল সাহিত্য শিক্ষা বিষয়ে নহে। আমার চির অপ্রত্যক্ষ, ধর্ম্মতত্ত্ব-প্রণেতা আচার্য্য-দেবকে আমি গুরুদেবের আসনে বসাইয়া, তাঁহারই উপদেশানুসারে আত্ম-গঠন-চেষ্টা করিয়াছি।

উত্তরা, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩৩৩

পৌরাণিকী

মৃণালিনী দেবী

ইংরাজী ১৮৭১, বাঙ্গলা ১২৭৭ সালের ২৪শে কার্ত্তিক, বুধবার, শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে ভবানীপুরে আমার জন্ম হয়। আমার পিতৃদেবের নাম ৺শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সেই সময়ে তিনি নলহাটীতে মুন্সেফ্ ছিলেন। যে দিন আমার জন্ম হয়, পিতা সকালে ১০টার সময় বাড়ী আসিয়াছিলেন। ঐ দিন অপরাহ্ণ ৪টার সময় লর্ড মেয়োর মৃতদেহ জাহাজে করিয়া কলিকাতায় আসে[৫৯] ; তাহা দেখিয়া ফিরিতে তাঁহার রাত্রি হয়। ভোর চারটার সময় আমার জন্ম হয়। পিতামহের নাম ৺কালিদাস ন্যায়রত্ন। শান্তিপুরের লক্ষ্মীতলা-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুরুদেব ছিলেন; কোন কারণে রাজার সহিত মনান্তর হওয়াতে তিনি রাজাকে ত্যাগ করেন। তিনি পিতামহের বৃদ্ধ প্রপিতামহ। ভবানীপুরে শ্রোত্রিয়ের ঘরে বিবাহ করিয়া জমি ইত্যাদি পাইয়া প্রপিতামহ এইখানেই বাস করিয়াছিলেন। পিতামহ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান্ হিন্দু, বেশ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ অবয়ব, সৌম্য মূর্ত্তি ও মিষ্ট বচনে অনেকেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইত। তিনি অনেক লোকের গুরুদেব ও অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের পুরোহিত ছিলেন। কখনো শূদ্রের দান গ্রহণ করিতেন না ও সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন। আমার পিতামহ শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হন। তিনি জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর যত্নে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে আমার পিতামহের পূর্ব্বপুরুষেরা শান্তিপুরে বাস করিতেন ; কিন্তু প্রপিতামহ ভবানীপুরে বিবাহ করেন ও শ্বশুরের কিছু সম্পত্তি পাইয়া পূর্ব্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। শান্তিপুরে এখন তাঁহার জ্ঞাতিরা কেহ কেহ বাস করিতেছেন। আমার পিতামহী বেহালার সুপ্রসিদ্ধ হালদার জমিদারদের দৌহিত্রীর কন্যা ছিলেন। তাঁহার আমলে কলিকাতায় আহিরীটোলা, চোরবাগান, বড়বাজার ও বউবাজার এ কয়েকটী স্থানে লোকের বসতি ছিল ; বাকী স্থান বনজঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। সন্ধ্যাকালে কলিকাতা হইতে বেহালায় একাকী লোক চলিত না ; ফাঁসুড়ে ও গুণ্ডার ভয় ছিল।

ঠাকুরমার পিতার নাম ৺ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়। ইনি গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিতেন ও বেশ ইংরাজী জানিতেন। ইনি সৌম্যদর্শন ও সুগায়ক ছিলেন এবং গ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। ঠাকুরমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদুনাথ বাবু অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও সরলপ্রকৃতির

লোক ছিলেন। তাঁহার মত আমুদে লোক আজকাল বাংলাদেশে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঠাকুরমা কিন্তু আমোদ আহ্লাদ বেশী ভালবাসিতেন না। সংসারের কাজকর্ম্ম, পিতার ভ্রাতার পরিবারবর্গের সেবা ও সন্তানসন্ততি পালনে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। তাঁহার মত কর্ত্তব্যপরায়ণা সাধ্বী স্ত্রীলোক এ জগতে দুর্লভ। তিনি এত গম্ভীরপ্রকৃতি ছিলেন যে, পাড়ার সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভয় করিত ও সকল বিষয়ে পরামর্শ লইত। ছেলেমেয়ের বিবাহে তত্ত্ব করা, চিকিৎসা করা কিছুই তাঁহার অমতে হইত না।

আমার পিসিমার নাম এলোকেশী। তাঁহার ১১ বৎসর বয়সে ফরিদপুর জেলানিবাসী উমেশচন্দ্র বন্দ্যেপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়। তিনি চার পাঁচ বৎসর সধবা ছিলেন। পিসামহাশয় ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী শোনবর্ষার রাজার দেওয়ান ছিলেন ও রাজসংসারে তাঁহার বেশ প্রতিপত্তি ছিল। পিসিমা দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী, পিসেমহাশয়ের পূর্ব্বের স্ত্রীও জীবিতা ছিলেন। কেন পিসেমহাশয় পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন বলিতে পারি না —বোধ হয় কুলীনসন্তান বলিয়া। পিসিমা কখনো শ্বশুরবাড়ী যান নাই।

আমার বাবা বেহালার পাঠশালে ও টোলে বাল্যকালে পড়া সাঙ্গ করিয়া কালীঘাটে একটী ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি হন। তিনি এন্‌ট্রেন্স্ পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিলেন। বাবার সহপাঠী ছিলেন — সিতিকণ্ঠ মল্লিক (পরে সব্‌জজ্ হন,), ডাক্তার রাজেন্দ্র মল্লিক, অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাশ্মীরের রাজমন্ত্রী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।[৬৩] আড়িয়াদহ নিবাসী দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠা কন্যা দয়াময়ী দেবী আমার জননী। মাতামহ মহাসমারোহ করিয়া বাড়ীতে দুর্গাপূজা করিতেন। প্রতিমার নাম "বুড়ামা" — প্রায় দেড়শত বৎসরের পূজা। আমার দিদিমা কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত ধর্ম্মদার বাঁড়ুয্যেদের কন্যা। তাঁহার পিতা লবণের দারোগা ছিলেন ও প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। একবার বাড়ীর ভোজপুরী দারোয়ান বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছিল ও ছোটকর্ত্তাকে ঘিয়ে ভাজিয়া টাকার সিন্দুকের উপর শোয়াইয়া ডাকাতি করিয়াছিল। মাতামহ তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে কখন ঐ দূর দেশে যাইতে দিতেন না।

আমার মাসীমার নাম মায়াময়ী। শান্তিপুরে পিতার এক জ্ঞাতির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। একদিন বৈশাখ মাসে শুক্লপক্ষীয়া রাত্রি ১১/১২টার সময় মাতামহ তামাক খাইবার জন্য মাসীমাকে একটু আগুন আনিতে বলেন। মাসীমা একখানি কোরা ও খুব পাতলা শান্তিপুরে শাড়ী পরিয়াছিলেন। দক্ষিণা বাতাসে আগুনের ফিন্‌কি উড়িয়া তাঁহার কাপড়ে পড়ে ও জ্বলিয়া উঠে। দাদামহাশয় বার বার কাপড় ফেলিয়া দিতে বলেন। কিন্তু মাসীমা অত্যন্ত লজ্জাশীলা ও ধীর প্রকৃতি ছিলেন, — কাপড় ফেলিলেন না। দাদামহাশয় দৌড়িয়া তাঁহার ঘর হইতে আফিসের উড়ুনী আনিয়া দগ্ধবস্ত্র ছাড়িতে বলিলেন। তখন বুকের ও পায়ের অনেকাংশ পুড়িয়া গিয়াছে।

মাখনের মত কোমল শরীর, —তাহার উপর জ্বর হইল ও বিকার দেখা দিল। স্বর্ণপ্রতিমা পিতামাতাকে কাঁদাইয়া অকালে অনন্ত রাজ্যে চলিয়া গেলেন। মাতামহ মার বিবাহ দিলেন বটে, কিন্তু তেমন আনন্দ হইল না। তখন মা নয় বৎসরের।

মাতামহ একদিন ভাদ্র মাসে কলিকাতা হইতে বাড়ীর পান্‌সিতে বাড়ী ফিরিয়া যাইতেছিলেন। সায়ংসন্ধ্যা বন্দনার পর জপ করিতে করিতে তাঁহার ঘুম আসে। এমন সময় হঠাৎ 'গেল গেল' শব্দে চাহিয়া দেখেন যে, একখানা বড় ষ্টীমার নৌকার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্ত্তমধ্যে আরোহী সমেত নৌকা জাহ্নবীবক্ষে নিমগ্ন হইল। দু'একজন মাঝি ও তিন চারজন আরোহী অনেক কষ্টে বাঁচিয়াছিল। দিদিমা সাবিত্রীব্রত করিতেন ; হঠাৎ দাদামহাশয় মারা গেলেন বলিয়া যে কয় বৎসর ব্রত বাকী ছিল, সে কয় বৎসর তিনি দাদামহাশয়ের খড়মপূজা করিতেন ও নারায়ণ লইয়া ব্রত সমর্পণ করিতেন। তিনি অনেক করিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন যে, ঐ ব্রত যেন তাঁহার পুত্র-কন্যার বংশে কেহ না করে। দাদামহাশয়ের মৃতদেহ অনেক করিয়া গঙ্গাগর্ভে খোঁজা হয়। ঘুসুড়ির ট্যাকে নৌকা ডুবি হয়। হুগলি অবধি ক্রমাগত জাল ফেলিয়া খোঁজা হয় ; কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সন্ধ্যাকালে এই হৃদয়বিদারক সংবাদ বাড়ীতে পৌঁছিল। কন্যা ও স্বামীহারা হইয়া সতী বড়ই মর্ম্মদাহ ভোগ করিলেন।

বড়মামা তখন ১৬ বৎসরের। দিদিমা সন্তানদের মুখ চাহিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া দাদামহাশয়ের মনিব সাহেবদের কাছে বড়মামাকে পাঠাইলেন। সেকালের সাহেবরা বড় দয়ালু ছিলেন; তৎক্ষণাৎ পঁচিশ টাকা বেতনে তাঁহারা বড়মামাকে একটী চাকরী দিলেন ও পরে ভাল করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। বড়মামা ঐ আফিসে বহুকাল চাকরী করেন।

বাবার বিবাহের পর তাঁহার পিতা আর পড়াইলেন না, চাকরী করিতে বলিলেন। তিনি প্রথমে টেলিগ্রাফ আফিসে ও পরে রেল আফিসে চাকরী করেন। কিন্তু কোনটীতেই তাঁর মন বসিল না। পরম করুণাময় তাঁহার জন্য ভবিষ্যতে অন্যরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমার পিতার সহপাঠী যোগেশচন্দ্র মিত্র (ইনি পরে জেলার জজ্ হন) তৎকালে আইন পড়িতেছিলেন। তাঁহার কথায় ও উৎসাহে পিতাও আইন পড়িতে ইচ্ছুক হন। পিতামহের ভর্ৎসনা সত্ত্বেও গোপনে তাঁহার পড়া চলিতে লাগিল ও যথাসময়ে তিনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। ওকালতী আরম্ভ করিয়া তিনি কেরাণীগিরি ছাড়িয়া দিলেন।

২

বাল্যকালে পিতামহীর নিকট 'আশ্বিনে ঝড়ে'র যে গল্প শুনিয়াছি, তাহারই উল্লেখ করিব। সেদিন ষষ্ঠীর কল্প। ভবানীপুরের মুখুয্যেরা বিখ্যাত বড়মানুষ। তাঁহাদের বাড়ীতে

ঠাকুরদাদা চণ্ডীপাঠ করিতে গিয়াছিলেন। ঝড় আরম্ভ হইল, তিনি আর বাড়ী ফিরিতে পারিলেন না। ক্রমে ঝড় বাড়িতে লাগিল, কোন ঝি-চাকর আর কর্ত্তার খবর লইতে পারিল না। ক্রমে পাড়ার অনেক বাড়ী ঝড়ে উড়িয়া গেল, কিন্তু আমাদের নূতন বাড়ী নষ্ট হয় নাই। ৮/১০টী পরিবার আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। সে দিন রাত্রি কাটিল, কিন্তু প্রাতে সপ্তমী পূজার দিনও কর্ত্তা বাড়ী আসিলেন না। বেলা বাড়িতে আশ্রয়প্রাপ্ত সকলেই ক্ষুধার্ত্ত হইল। ঠাকুরমা সকলের জন্য যথাসম্ভব আহারের যোগাড় করিলেন ও পিসিমা খিচুড়ী করিয়া দিলেন। পরদিনও ঝড় পূর্ব্ববৎ রহিল। মহানবমীর প্রভাতে ঝড়ের বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল, যেন কৈলাসবাসিনী দুরন্ত অসুরকে পরাস্ত করিলেন। দশমীতে দিক্ প্রসন্ন হইল, কিন্তু ভবানীপুর তখন মহাশ্মশানে পবিণত হইযাছে দেখা গেল।

আমার দুইটী সহোদর— বড়দাদা সত্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মেজদাদা শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বাবার সহপাঠী গোপালবাবু বিলাতফেরতা ডাক্তার ছিলেন। বড়দাদা যখন ছয়মাসের, তখন একদিন রাত্রে হঠাৎ তাঁর খুব অসুখ করে। গোপালবাবুকে তখন পাওয়া গেল না। আমাদের পদ্মপুকুরের বাড়ীর সম্মুখের বাড়ীতে তখন ৺গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এম-বি পাশ করিয়া প্র্যাক্‌টিশ্ আরম্ভ করিয়াছিলেন।[৬১] ঠাকুরমার মত লইয়া বাবা তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া দাদাকে দেখাইলেন। ঈশ্বরের এমনি কৃপা যে সেই প্রথম দর্শনেই গঙ্গাপ্রসাদবাবু পিতাকে কি সুনয়নে দেখিলেন। তদবধি উভয়ে চিরবন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

বাবার পাঁচ ছয়টী বন্ধু ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমার পিতৃদেবও ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপর শ্রদ্ধাবান্ হইলেন ও আদি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম জামাতা জে. ঘোষাল মহাশয় বাবার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ঠাকুরবাড়ীর ছেলেমেয়েরা বাবাকে নিজের ভাইএর মত দেখিতেন; বধূরাও কেহ লজ্জা করিতেন না। মহর্ষি যেমন নিজের ছেলেদের উপদেশ দিতেন, তেমনি বাবাকেও কাছে বসাইয়া ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তাঁহাকে বাবা গুরুর মত ভক্তি করিতেন, আর সত্যেন্দ্রবাবু ও জ্যোতিঃবাবুকে ভ্রাতা মনে করিতেন।

বড়দাদার জন্ম হইবার কিছুদিন পরে আমার পিতামহ বাবাকে ডাকিয়া এক দিন বলিলেন, 'আমার নিতান্ত ইচ্ছা যে তুমি মুন্সেফ্ হও।' বাবা ক্রমে হাইকোর্টের জজেদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন ও তাঁহারা চাকুরী দিবেন বলিযা আশ্বাস দিলেন। বাবার সহপাঠী সিতিকণ্ঠবাবু ও অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন মুন্সেফ্ হইয়া বিদেশে গিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে বাবা খবর পাইলেন, তিনি রামপুরহাটের মুন্সেফ্ নিযুক্ত হইয়াছেন। এ সংবাদে পিতামহ খুব সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার পুত্র যে আইন পরীক্ষা দিয়া ভাল কাজ করিয়াছেন, এত দিনে তাহা বুঝিলেন। বাবা ওকালতী

করিয়া আমার পিতামহীকে ৮/১০ খানা বেশ ভাল গহনা দিয়াছিলেন; আর পিসি, জ্যেঠাই, মামী সকলকে বহরমপুর হইতে উৎকৃষ্ট গরদ ও গিনি দিয়া প্রণাম করিয়াছিলেন।

মা বাবার সঙ্গে রামপুরহাটে গেলেন। রামপুরহাট তখন বন—সীতারামপুর হইতে পাল্কীতে যাইতে হইত। সেখানকার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাবাকে বড় ভালবাসিতেন। বাবার যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, সে বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। সাহেব খুব সম্ভ্রান্তবংশীয় ছিলেন। ইহাঁর স্ত্রী পুত্র বিলাতে ছিলেন। ঐ সাহেবের কুঠীতে বর্ষাকালে একটী নূতন বাগান তৈয়ার করিবার জন্য ২২/২৪টী কুলীরমণী কাজ করিতে আসে। সকলে যখন ছুটী পাইয়া পয়সা লইয়া চলিয়া গেল, তখন সাহেব একজনকে যাইতে দিলেন না। তাহাকে রাখিয়া দিলেন। কিছুদিন পরে অন্য সাহেবরা জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত আহার বিহার ত্যাগ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তিনি অত্যাচারী বলিয়া আবেদন করিলেন। এদিকে সাহেবেরও সরকারী কাজে তাচ্ছিল্য হইল, চাকুরীও রহিল না। এমন সময়ে ঐ কুলী রমণীর অসুখ হইল। সাহেব আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র তাহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া থাকিতেন ও সমস্ত সেবা নিজে করিতেন। তখন তাঁহার হাতে এক পয়সাও ছিল না। বাবা যতদূর সাধ্য সাহায্য করিতেন। অতঃপর বাবা এক দিন সাহেবকে বিলাতে তাঁর স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সাহেব নিজেকে ঘোর অপরাধী মনে করিতেন বলিয়া কিছুতেই এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। তখন বাবাই তাঁর স্ত্রীকে টেলিগ্রাম করিলেন যেন তিনি শীঘ্র আসেন, তাঁর স্বামী বড় বিপন্ন। টেলিগ্রাম পাইয়া তাঁহার স্ত্রী উত্তর দিলেন যে তিনি শীঘ্রই রওনা হইতেছেন। ঐ কুলী রমণী মারা গেল। সাহেব সেই শয্যায় পাগলের মত পড়িয়া রহিলেন। বাবা সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে থাকিতেন। এক দিন বেলা আটটার সময় সাহেবের নিকট বসিয়া বুঝাইতেছেন। সাহেবের সেদিনের খাবার খরচ নাই, অথচ আর কাহারও সাহায্য লইবেন না। এমন সময় সহসা তাঁর স্ত্রী ও এক ভ্রাতা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বন্যার উচ্ছ্বাসের মত মেম একেবারে সাহেবের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন ও প্রায় মূর্চ্ছিত হইলেন। তিনি কতকটা শান্ত হইলে সাহেব বলিলেন, 'আমার জীবনদাতার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। কেবল ইহার জন্যই বাঁচিয়া আছি। আর আমার বৃত্তান্ত সব ইহার মুখে শুনিবে।' ৫/৬ দিন পরে সাহেবকে লইয়া মেম বিলাত গেলেন। বিদায়ের সময় মেম বাবার নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। বাবা হাসিয়া বলিলেন, 'আপনি আর সাহেবকে চক্ষের অন্তরাল করিবেন না।'

বাবা শিউড়ীতে ও পরে দেওঘরে বদলি হন। দেওঘরে হাঁসপাতালের সম্মুখে তাঁহার বাসা ছিল। ডাক্তার চন্দ্রা তখন সেখানকার ডাক্তার। পরে তিনি বিলাত হইতে

পাশ করিয়া ও একজন মেম বিবাহ করিয়া ফেরেন। এই নারী কোন নামজাদা ডিউকের কন্যা ছিলেন। একটু খোঁড়া ছিলেন বলিয়া অন্যত্র বিবাহ হয় নাই। বাবা যখন নলহাটীতে থাকেন, তখন আমার জন্ম হয়। বাবা পরে পাবনায় বদলি হন। বাবার চাকরী ছাড়িবার একটী বেশ ইতিহাস আছে। হঠাৎ কি-একটী ছুটীর সময় বাবা কলিকাতায় বেড়াইতে আসেন। সন্ধ্যাকালে টাউনহলে নুনের নূতন আইনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা হইতেছিল। বাবা সেই সভায় যোগদান করিয়া কিছু বক্তৃতা করেন। তাঁহার সুন্দর ভাষা ও ভাবপূর্ণ যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হন। তিনি হল্ ত্যাগ করাতে সকলেরি মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। একজন সাহেব বলিলেন, 'আমি চিনিয়াছি, ইনি পাবনার মুন্সেফ্— শীতল মুখার্জ্জি।' বাবা তৎপর দিনই পাবনায় ফিরিয়া গেলেন ও শুনিলেন, তাঁহার পুরীতে বদলির সংবাদ আসিয়াছে। ভবানীপুরে ফিরিয়া আসিযা তিনি পুরীতে রওনা হইলেন। তখন কলিকাতা হইতে জাহাজে করিয়া ১২/১৩ দিনে সমুদ্রপথে পুরী যাইতে হইত। সেখানে গিয়া হঠাৎ হাইকোর্ট হইতে পত্র পাইলেন, 'তুমি ফিরিয়া আইস।' বাবা হাইকোর্টে গিয়া রেজিষ্ট্রার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি টাউনহলে কোন বক্তৃতা করিয়াছিলে?' বাবা সমস্ত অকপটে স্বীকার করায় সাহেব কহিলেন, 'তুমি কর্ম্মে রিজাইন্ দাও। তুমি সরকারী কর্ম্মচারী—ওরূপ কথা বলিবার তোমার ত অধিকার নাই।' বাবা তৎক্ষণাৎ কার্য্যে ইস্তফা দিয়া বাড়ী ফিরিলেন।

এ সময় বাবা উদরাময় রোগে বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। কলিকাতার ডাক্তার চার্লস্ তাঁহাকে গঙ্গার হাওয়া খাইতে উপদেশ দেন। বাবা বজরা করিয়া গঙ্গায় হাওয়া খাইতে বাহির হন। বরাবর সমস্ত দেশ দেখিয়া চুণার অবধি গঙ্গাবক্ষে গমন করিলেন। তৎপরে রেলপথে আগ্রা, মথুরা ও বৃন্দাবন গেলেন। আগ্রাতে বাবার বাল্যবন্ধু অবিনাশবাবু ছিলেন। সেখান হইতে আসিবার সময় বাবা অবিনাশবাবুকে বলেন, 'এদেশে আমার জন্য একটী ভাল চাকুরীর যোগাড় করিও। আমার বাঙ্গালাদেশ আর সহ্য হইবে না।'

বাবা চাকুরীতে ইস্তফা দিবার পর হইতে ঠাকুরদাদা বিশেষ বিরক্ত হন। সর্ব্বদা মা ও বাবাকে ঐ জন্য তিনি ভর্ৎসনা করিতেন। আমার ধীরস্বভাবা জননী সমস্ত নীরবে সহ্য করিতেন, পিতাকে কিছুই জানাইতেন না। ঠাকুরদাদা একদিন স্পষ্ট করিয়া বাবাকে বলিলেন, 'আজ বাদে কাল জজ্ হইতে—এমন চাকুরী নিজের দোষে ত্যাগ করিলে! অতঃপর তোমার ছেলেপুলে কি খাইবে?' মা ও বাবা তিরস্কৃত হইয়া অনাহারে রাত্রি যাপন করিলেন। মা জগদীশ্বরের চরণে কাঁদিয়া পড়িয়াছিলেন; প্রভাতে তিনি স্বপ্ন পাইলেন, 'দয়া, ভাবিও না—তোমার দুঃখ দূর হইয়াছে।' পরদিন প্রভাতে মার মুখে হাসি দেখিয়া বাবা আশ্চর্য্য হইলেন। মা প্রসন্নমুখে বলিলেন,

'ভাবিও না, আমার দুঃখের দিনের আজ অবসান হইল।' সেইদিনই ৯টার সময় আগ্রার অবিনাশবাবুর নিকট হইতে এক টেলিগ্রাম আসিল। তিনি জানাইয়াছেন যে, মথুরার শেঠেদের ষ্টেটে বাবার ম্যানেজারি চাকরী হইয়াছে। তখন মথুরায় রেল হয় নাই; আগ্রা হইতে ১৮ ক্রোশ উটের গাড়ী করিয়া যাইতে হইত।

আমরা মথুরায় চলিয়া যাইবার পর জ্যেঠাইমা (৺গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্ত্রী) বড়দাদা (৺সার আশুতোষ মুখার্জি) ও হেমলতাকে লইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য সেখানে যান। জ্যেঠাইমার আর একটী পুত্র ছিল,—তাঁহার নাম হেমন্তকুমার; তিনি ভবানীপুরেই থাকিতেন। বড়দাদা ও হেমলতা বেশ সারিয়া দশমাস পরে দেশে ফিরিয়া গেলেন।

বাবার তখনকার মনিব গোবিন্দদাস শেঠ। ইঁহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন। একটী পুত্র রাখিয়া বড় ভাই অল্প বয়সে মারা যান। তিনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী। মধ্যম ভ্রাতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন; তাঁহার সময়ে মন্দির ও দেবতা প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীবৃন্দাবনে রঙ্গজীর মন্দির প্রচুর ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর ও অতিথি সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য ছোট ছোট ঘর। একটী মন্দিরে শ্রীঅনন্তশয়নের প্রতিমা। লক্ষ্মীনারায়ণ ও অন্যান্য দেবতারও অনেক মন্দির আছে। আবার একটী উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত অঙ্গন, তাহার মধ্যে ভারতবিখ্যাত 'সোনার তালগাছ'। ইহারই সম্মুখে প্রকাণ্ড মারবেল্ পাথরের দালান ও রঙ্গজীর মন্দির। এই অক্ষয় কীর্ত্তি কত দূরদেশ হইতে যাত্রীরা দেখিতে আসিত। দাক্ষিণাত্যে মাদুরায় যে মন্দির আছে, তাহারই অনুকরণে এই মন্দির তৈয়ারি হয়। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে বড় গজগিরিকরা পুষ্করিণী ও শেঠ সাহেবদের দপ্তরখানা ও বৈঠকখানা। তৎপার্শ্বে তিন চারি শত গুরুগোষ্ঠী বাস করেন; প্রত্যেকের বিভিন্ন বাড়ী। মন্দিরে যাহা ভোগ হয়, তাঁহারাই সব পান, একটী কণামাত্র আর কেহ পাইতে পারে না। শেঠ সাহেবেরা ৬০,০০০ টাকার ভোগ বৎসরে বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাহার উপর তিন চারি খানি প্রকাণ্ড বাগান; এগুলিও অতি সুন্দর। মথুরায় শেঠসাহেবদের আবাসবাড়ীও অতি সুন্দর। ইহার বারান্দা যমুনার উপরে ঝুলিয়া আছে। সম্মুখে রাস্তার অপর পারে দ্বারকাধীশের মন্দির; ইনি কুলদেবতা। ইঁহারও বৎসরে তিন হাজার টাকার ভোগের বন্দোবস্ত ও হীরা-জহরতও অনেক। এ-সব মধ্যম শেঠসাহেবের কীর্ত্তি। ইঁহার একটী মাত্র সন্তান, নাম লছমন দাস। ইনি তখনও নাবালক ছিলেন। নয় বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইঁহার কাকা গোবিন্দপ্রসাদ পরম বৈষ্ণব, বিষয়বিরাগী ও জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। বাবাকে ইনিই নিযুক্ত করেন ও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন।

ইতিমধ্যে বাবা ভবানীপুরে একবার আসিয়া বড়দাদার উপনয়ন দিয়া গেলেন। আমরা আবার মথুরায় গেলাম। পিসীমা ও আমাদের বাড়ীর একজন বিধবা রাঁধুনী

মথুরায় দেবতার উৎসব দেখিতে যাইতেন। অন্নকূট, দেওয়ালী, কংসবধ, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও শরৎ-পূর্ণিমায় খুব ঘটা হইত। বাবার মনিব-বাড়ীর গাড়ীর অভাব ছিল না। সর্ব্বদা বন্ধু বান্ধব কত যে বেড়াইতে যাইতেন বলিতে পারি না। আমি তখন বাবার কাছেই পড়িতাম। পড়ার মধ্যে অবসর পাইলে দাদাদের সঙ্গে শেঠেদের বাগানে খেলা করিতাম। সেখানে ১০০টী ঘোড়া, ৪০টী উট, কতকগুলি হাতী, প্রায় ৮০টী গাড়ী টানিবার বয়েল ও বিস্তর ঘোড়ার গাড়ী, জুড়ি, বড় বড় ব্রুহাম, পাল্কীগাড়ী, ব্রেক ও টমটম থাকিত। গরু টানবার রথ, চূড়াওয়ালা ধামনী, সামপুনি, মঝুলি, এক্কা, উটের গাড়ী, পাল্কী, লালকি, সেয়ানা, ডাণ্ডি, ডুলিও থাকিত। এ-সব কোন সাহেব-সুবা বা রাজা আসিলে সাজান হইত। যেদিন বিবাহের লগ্ন থাকিত, কত আমোদ উৎসব হইত। হাতীকে রং দিয়া চিত্রিত করা হইত—কনে-চন্দন পরাইবার মত। ভাল জরীর আস্তরণ হাতীর গায়ে দেওয়া হইত, পায়ে ঝাঁঝর মল, কটিতে মেখলা, গলায় ছোট বড় ঘন্টা ও সোনা রূপার বড় বড় হামেল পরানো হইত। সোনারূপার হলকরা হাওদা দেওয়া হইত, কিন্তু সজ্জা হইয়া গেলে হাতীকে আর রাখিবার যো থাকিত না—অহঙ্কারে অস্থির হইয়া মল বাজাইয়া চলিবে!

এই সময় কাশ্মীরের মহারাজা মথুরায় বেড়াইতে আসেন। সঙ্গে নীলাম্বরবাবুও ছিলেন। কাশ্মীর রাজ-সরকারে কাজ করিবার জন্য তিনি বাবাকে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু শেঠজী কিছুতেই ছাড়িলেন না। শেঠ সাহেবের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় বাবা দেশে গেলেন। ছোটদাদার উপনয়নের সপ্তাহকাল পূর্ব্বে আমার পিতার একজন ভাইঝির—ব্রজবালা দিদির—বিবাহ হইল। তাহার পূর্ব্বে বিবাহ কখনও দেখি নাই। আমার খুব আমোদ হইল। ভগ্নীপতি দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে আদর করিয়া কি পড়ি, কি নাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। পরদিন বৈকালে ব্রজদিদি শ্বশুর বাড়ী গেল, আমি খুব কাঁদিতে লাগিলাম। আমার পিতামহী আমাকে আদর করিয়া কহিলেন, আমাকেও ঐরূপ পরের বাড়ী যাইতে হইবে—সকলেই যায়, শুধু ব্রজবালাকে লইয়া গিয়াছে তাহা নয়।

আবার আমরা মথুরায় ফিরিয়া আসিলাম। আমাদের বাড়ীর রাঁধুনী সৌদামিনী বেশ ভদ্র ঘরের মেয়ে। সে আমায় প্রায়ই সকালে যমুনায় স্নান করিবার জন্য লইয়া যাইত। প্রায়ই আমরা বিশ্রামঘাটে যাইতাম। সেই সমস্ত প্রাতঃকালের কথা আজিও আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। বিশ্রামঘাটে ত্রিলোকপতি শ্রীকৃষ্ণ কংস-ধ্বংস করিয়া বিশ্রামার্থ বসিয়াছিলেন। কলনিনাদিনী সুরতরঙ্গিনী যমুনা সেই স্থানকে ধৌত করিয়া প্রবাহিতা; —অদূরে পূর্ব্বগগনে সবিতৃদেব উদয় হইতেছেন, ব্রাহ্মমুহূর্তে শত শত চৌবে ও চৌবেণী স্নানার্থ আসিতেছেন; কেহ বা স্নান সমাপন করিয়া উদাত্তকণ্ঠে স্তবগান করিতেছেন ও পূজা করিতেছেন। তাঁহাদের অলোকসামান্য রূপে

ঘাট উদ্ভাসিত। কোন কোন চৌবের কন্যার সহিত আমার অত্যন্ত আলাপ ছিল। অনেকের পিতামাতা সর্ব্বদা আমাদের বাড়ী যাতায়াত করিতেন। শেঠেদের দরবারে সর্ব্বদাই অনেকের অনেক রূপ প্রয়োজন থাকিত। তাহারা আমাকে 'সখী' -সম্বোধন করিত ; কেহ বা কাছে বসিয়া গল্প করিত —যতক্ষণ না সদুদিদির স্নানাহ্নিক শেষ হয়। ঘাট হইতে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে প্রণাম করিয়া পার্শ্বে মহাদেব ও গৌরীর প্রতিমা দর্শনে যাইতাম। অতি সুন্দর মূর্ত্তি —গৌরী শ্বেত-প্রস্তরে নির্ম্মিত ও মহাদেব কৃষ্ণ কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত। সময় থাকিলে কুব্জানাথের মন্দির, দ্বারকাধীশের মন্দির ও গোবিন্দ গোপীনাথ দাউজি দর্শন করিতে যাইতাম। এখনও এই বৃদ্ধ বয়সে শৈশবের সেই নির্ম্মল দিনগুলি সিনেমার ছবির মত চক্ষের সমক্ষে ভাসিতেছে!

৩

মথুরার চারটী ফটক, — সর্ব্বপ্রথম হোলি দরোয়াজা। শ্রীকৃষ্ণ এই স্থানে গোপিনীগণের সহিত হোলি খেলিয়াছিলেন। এখানে এখন হার্ডিঞ্জ গেট হইয়াছে ও একটী প্রকাণ্ড ঘড়ি বসান হইয়াছে। অতি সুন্দর পাথরের লতা-পাতায় ফটক ভূষিত। দ্বিতীয়টী ভরতপুর দরোয়াজা —ভরতপুরে রাস্তা গিয়াছে। তৃতীয়টি ডিগ্ দরোয়াজা। এই রাস্তা গোবর্দ্ধন হইয়া ডিগে গিয়াছে। ভরতপুরের প্রাচীন রাজাদের ঐ ডিগে সব কীর্ত্তি আছে। চতুর্থটি বৃন্দাবন দরোয়াজা। এই রাস্তা দিয়া বৃন্দাবনে যাওয়া যায়। ঐ বৃন্দাবন-দরোয়াজাতে গৌকর্ণেশ্বর মহাদেব ও দুর্গাদেবী আছেন। গোবর্দ্ধনের রাস্তায় ভূতেশ্বর মহাদেব ও দুর্গাদেবী আছেন। অদূরে পীঠস্থান মহাবিদ্যার মন্দির, —রক্তবর্ণা দেবী, সুন্দর উপবন, চারিধারে গড়খাই। এই স্থানে পূর্ব্বে বড় ডাকাতের ভয় ছিল। ভরতপুরের দরোয়াজাকে 'বাজারমণ্ডি' বলে ; যব, গম, ছোলা, তিসি, সরিষা, জোয়ার, বাজরা সব বিক্রয় হইতেছে।

আমাদের বাড়ী ছিল হোলি-দরোয়াজার খুব কাছে। ইহারই অনতিদূরে কংসরাজা ধনুর্যজ্ঞ করিয়াছিলেন। রঙ্গেশ্বর মহাদেব কংসের স্থাপিত। মহাদেবের সুন্দর মুখ, চক্ষু ও প্রকাণ্ড মূর্ত্তি। শক্তিও আছেন। গোকর্ণেশ্বরের মন্দিরের কাছে একটী রজকের শিরশ্ছেদন করা হয়। সেই দিনের স্মরণার্থ এখনও প্রতি বৎসর একটী মেলা হয়। কার্ত্তিকমাসের শুক্লা অষ্টমীতে এখানে গোচারণ হয়। বড় বড় চৌবেদের কিশোর ও সুকুমারদর্শন ছেলেরা কৃষ্ণ-বলরাম সাজেন ও ঘোড়ায় চড়িয়া গোচারণে আসেন। এখানে সংখ্যাতীত গাভী জমা হয়। এই সব গো-বৎস ও গাভীর খুব ধূমধাম করিয়া পূজা হয় ও ভাল ভাল মিঠাই ইহাদিগকে খাওয়ান হয়। দশমীর দিন কংস বধ হয়। কাগজের একটী প্রকাণ্ড কংস তৈয়ার করা হয় ও যজ্ঞস্থলে রাখা হয়। কিছুক্ষণ

পরে কৃষ্ণ-বলরাম ঘোড়ায় চড়িয়া আসেন ও তীরধনুক লইয়া মূর্ত্তিকে আঘাত করেন। তাঁহারা আঘাত করিবামাত্র পাঁচশত চৌবে যষ্টিপ্রহারে কংসমূর্ত্তি ধ্বংস করেন। সমবেত জনমণ্ডলী সেই ভগ্ন মূর্ত্তি হইতে কাগজের ছিন্নখণ্ড লইয়া কৃষ্ণ-বলরামকে বিশ্রামঘাটে লইয়া যায় ও সেইখানে তাহাদিগকে সিংহাসনে বসাইয়া আরতি করে। রোজ রাত্রে বিশ্রামঘাটে আরতি হয়। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। ঘাটের মধ্যস্থলে একটী সাদা পাথরের দুই তিন হাত উচ্চ চারকোণা বেদী আছে। একজন খুব বলবান্ চৌবে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া গলায় ফুলের মালা পরিয়া দাঁড়ান। একটী শতশিখ প্রদীপ লইয়া একজন আসে ও প্রদীপটী জ্বালা হয। চৌবে তখন এই প্রদীপটী লইযা প্রায় দশ মিনিট কাল আরতি কবেন। প্রদীপটী নামানো হইলে শত শত উপাসক ও উপাসিকা যমুনা-মাঈর এই আরতি-প্রদীপের উত্তাপ নেয। আরতি শেষ হইলে কৃষ্ণ -বলরাম স্ব স্ব স্থানে চলিযা যান।

মথুরাতে এক মাস রামলীলা হয। সহরে তিন সপ্তাহ ধরিয়া যাহা হয়, তাহাতে তত ঘটা হয না বটে, কিন্তু দশ দিন যাবৎ সহরের বাহিরে সরস্বতীকুণ্ডের ও রামলীলার মাঠে যাহা হয, তাহাব ধূমধাম অতুলনীয়। কুম্ভকর্ণবধ, ইন্দ্রজিৎবধ ও রাবণবধ হয়। রাবণবধের দিন খুব বাজি পোড়ানো হয়। একাদশীর দিন ভরতমিলন হয়। সহরের মধ্যস্থলে শত্রুঘ্ন ও ভরত দাঁড়াইয়া থাকেন, আর রাম-লক্ষ্মণ-সীতা অরণ্যবাসের পর গৃহে ফিরিযা আসেন। মথুরাবাসীরা মনে করে যে মথুরাই যেন অযোধ্যাধাম, আর কলিযুগের রামচন্দ্র যেন সত্যই ফিরিয়া আসিতেছেন। কত বাদ্য, কত আসাশোটা, কত হাতী-ঘোড়া-উট সাজানো! এই সময় সমস্ত সহর সজ্জিত করা হয় ও জনপদবাসীরা অতি সুন্দর সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করে। সহরটী যেন অমরাবতী বলিয়া ভ্রম হয়। মধ্যে মধ্যে লতা-পুষ্পে শোভিত সিংহাসন পাতা থাকে। চুড়িওয়ালা শেঠের দোকানে, শেঠসাহেবদের কুঠীতে, বিশ্রামঘাটে, ছাত্তাবাজারে ও হোলি দরোয়াজাতে বাজনা বাজে, আরতি হয়, ভোগ ও হরির লুট হয়। তাহার পর দেওয়ালী। সমস্ত নগর আলোকমালায় সজ্জিত হয়। তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা জানি না। তৎপর দিন অন্নকোট। পর্ব্বতপ্রমাণ অন্ন মন্দিরের ভিতর সজ্জিত হয়। নানাপ্রকার তরকারি, মিষ্টান্ন, ফল, দধি, ক্ষীর, মিঠাই ও আচারও ঐরূপে সজ্জিত হয়। এই সব দ্রব্য উৎসর্গ হইলে প্রথমে মন্দিরের অধিকারীর বাড়ী প্রসাদ যায়। তৎপরে বন্ধু-আত্মীয়দের বাড়ী, বড় বড় কর্ম্মচারীদের বাড়ী। তৎপরে চাকর, কামদার, চেলাদার। তার পরে সাধারণ লোক ও সর্ব্বশেষে কাঙ্গালীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

মথুরায় দুর্গোৎসবে প্রতিমা গড়া হয় না। প্রতি মন্দিরে একটী করিয়া মাটীর এক হাত উচ্চ বেদী হয়। ঐ বেদী কখনো অষ্টদল, কখনো বা দ্বাদশদল হয়। বেদীর পরিমাণ আট-দশ হাত। তাহার ধারে কলসী রাখা হয়। বেদিটি নানা রঙ্গে চিত্রিত

করা হয়। প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাকালে শ্রীকৃষ্ণের নূতন নূতন লীলা চিত্র করা হয়, যথা—শ্রীকৃষ্ণের বকাসুরবধ, পুতনাবধ, কালিয়-দমন, বস্ত্রহরণ, গোচারণ, কালীকলঙ্কভঞ্জন, দানলীলা, রাসলীলা, কেশীবধ, কংসবধ, ইত্যাদি। রাত্রি দশটার সময় সাজিপূজা হয় এবং প্রাতে ও রাত্রে সকলে দর্শন করে। চিত্র অতি সুন্দর হয়। যে পারে, সে মথুরা বৃন্দাবন চৌদ্দক্রোশ পরিক্রমা দেয়। তার নাম 'যুগল-পরিক্রমা'। যাহারা না পারে, তাহারা শুধু 'মথুরা-পরিক্রমা' দেয়। বিশ্রামঘাটে স্নান করিয়া যাত্রীরা দক্ষিণের পথে বাহির হয় ও সমস্ত দেবতা দর্শন করে। সেগুলির নাম পিপুলেশ্বর, দাউজী, ধ্রুব ও পদ্মপলাশলোচন হরি, রঙ্গেশ্বর, জগন্নাথ, শ্রীকৃষ্ণের মন্দির, পেতড়াকুণ্ড, বসুদেব ও দেবকীর মন্দির (শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান), ভূতেশ্বর, মহাবিদ্যা, চামুণ্ডাদেবী, সরস্বতীদেবী ও কুণ্ড। এইখানে মহামেলা বসে ও পরিক্রমাযাত্রীরা জলযোগ করে। সরস্বতীদেবী দর্শন করিয়া যাত্রীরা গোকর্ণেশ্বরে যায়। সেখান হইতে কৃষ্ণগঙ্গায় যায়। ঐ ঘাটে দশহরার দিন যোগ হয় ও বহুলোক স্নান করে। সেখানে স্নান সমাপন করিয়া নৌকায় চড়িয়া যাত্রীরা ২৮ ঘাটের পরিক্রমা দিতে যায়। গৌঘাট, স্বামীঘাট, উসকুণ্ডাঘাট, ব্রহ্মাঘাট, পিতৃঘাট, ধ্রুবঘাট, দাউজীঘাট প্রভৃতি অতি প্রসিদ্ধ। এক একটী ঘাটে ভিন্ন ভিন্ন তিথিতে ভিন্ন ভিন্ন ফল হয়। তৎপরে ধ্রুবঘাটে বা বিশ্রামঘাটে নামিয়া সহরের দেবতা দেখিতে হয়, —কুব্জানাথ, দাঁউজি, গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, দ্বারকাধীশ ইত্যাদি। পরে যে যাহার গৃহে গমন করে ও ফলারি দ্রব্য খায়।

মথুরায় ভূতেশ্বর, শান্তনুকুন্ত প্রভৃতি নানা মেলা হয়। পল্লীগ্রাম হইতে, দেশদেশান্তর হইতে কত লোক মেলা দেখিতে আসে। গোবর্দ্ধন, গোকুল, মহাবন, দাউজি, নন্দগ্রাম, বর্ষাণা প্রভৃতি অনেক বড় বড় গ্রাম আছে। গোকুলে ও মহাবনে নন্দ-যশোদার মন্দির ও গোকুলনাথের মন্দির বিখ্যাত। মহাবনে বাল্যে শ্রীকৃষ্ণ অনেক লীলা করিয়াছিলেন, যথা, পুতনাবধ, শকটভঙ্গ, যমলার্জ্জুন ভঙ্গ, বকাসুর বধ, কালীয়দমন ও কেশী অসুর বধ। সেকালে বোধ হয় মহাবন ও গোকুল এক ছিল ; এখন তফাৎ হইয়াছে। মহাবন হইতে দাউজি যাইতে হয়। ঠাকুর খুব বৃহদাকার। এখানে যাত্রীরা কেবল মাখন ও মিশ্রীর ভোগ দেয়।

মথুরায় অনেক 'বন' আছে, যথা সাতাশ বন শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার জন্য বিখ্যাত, শ্রীবৃন্দাবন, মধুবন, তালবন, তমালবন, ভাণ্ডিরবন, নাটাবন, কোকিলাবন। বনসমূহের দৃশ্য অতি মনোরম। বহু বনযাত্রী কেহ পাল্কীতে, কেহ গোশকটে, কেহ পদব্রজে, কেহ বা ডুলীতে যায়। খাবারের দোকান, মুদির দোকান, তেলির, বেনের, খেলনার, চুড়ির, কাপড়ের দোকান সব সঙ্গে সঙ্গে যায়। গোস্বামীর বন কার্ত্তিকমাসে বাহির হয় ও এক মাস ধরিয়া বেড়ানো হয়। তাহাতে প্রতিরাত্রে রামধারীর যাত্রাকথা,

পুরাণ ও ভাগবত পাঠ। এ বনের স্থিতিকাল এক পক্ষ। ইহাতে উৎসব-বাহুল্য না থাকিলেও সাধারণ যাত্রীরা এই বনে প্রায়ই যায়। অনেক পুলিশের কর্ম্মচারী ও পাহারাওলা সঙ্গে যায়। আমার পিসীমা একবার বনভ্রমণে গিয়াছিলেন ; তিনি অবশ্য কমিশেরিয়েটের তাঁবু ও লোকলস্কর পাইয়াছিলেন।

খুব কিশোর বযসে আমি একবার গোস্বামীবনে গিয়াছিলাম। গোবর্দ্ধনেও আমি পাঁচ-ছয়বার বাবা ও মার সঙ্গে গিয়াছিলাম। মানস-সরোবর হইতে গিরিগোবর্দ্ধন উঠিয়াছে। এই গিরি সাতক্রোশ লম্বা, তবে তত উচ্চ নহে। মানস-সরোবরে পর্ব্বতের উপর মন্দির আছে ও তিনক্রোশ দূরে গোপাল আছেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কোনও ভক্ত এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ঐ স্থানে জ্যোতিঃপুরা গ্রাম। এখানে গোপালের খুব ভোগ হয়। অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা। গোবর্দ্ধনে ভরতপুরের পূর্ব্বতন রাজাদের সমাধি হয়। তাই সেখানে অনেকগুলি ছত্রি আছে। মন্দিরের ন্যায় সেগুলিও শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত। এইসব বিগ্রহহীন মন্দিরের বহির্গাত্রে নানা কারুকার্য্য ক্ষোদিত, —শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম মালা প্রভৃতি। গোবর্দ্ধন হইতে কিছুদূরে রাধাকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড প্রভৃতি কুণ্ড আছে ও বিগ্রহও অনেক আছে। তন্মধ্যে গোবিন্দজী ও জগন্নাথজী সমধিক বিখ্যাত। রাধাকুণ্ডের জল শীতকালে প্রায়ই শুকাইয়া যায়। এই সময়ে ব্রজবাসীরা ইহার মাটী তুলিয়া রাখে। এই মৃত্তিকা অতি সুস্বাদু ও মোলায়েম। ইহারই নাম 'গোপীচন্দন'। তিলকসেবা ইহাতেই হয়। সমুদায় বৈষ্ণবমণ্ডলীর নিকট ইহার অত্যন্ত সমাদর। এই 'গোপীচন্দন' নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি বহু দূরদেশে যায়।

দিগ্‌ও বেশ দেখিবার স্থান। এই স্থানটী মৃত্তিকা-প্রাচীরে বেষ্টিত। অনেকবার যুদ্ধ করিবার পর তবে ইংরাজেরা ইহা জয় করিতে পারিয়াছে। যত কামান ছোঁড়া হইত, সব মাটীর স্তূপে প্রোথিত হইয়া যাইত। ইহা ভরতপুরের রাজাদের গ্রীষ্মাবাস। তিন চারটী অতি সুন্দর প্রকাণ্ড দীঘি আছে; চারিদিকে গড়খাই করা। তাহার ধারে সব বড় বড় পাথরের বাড়ী ; হাওয়ামহল, বারদোয়ারি, অন্দরমহল ও বহু সুন্দর উপবন। তন্মধ্যে একটী বাড়ীতে ৩৮০টী ফোয়ারা আছে; যখন সমস্ত উৎসগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তখন মেঘগর্জ্জনের মত শব্দ হইতে থাকে। বনযাত্রীরা যেদিন আসে, সেদিন নাটাবনের এই উৎসগুলি খুলিয়া দেওয়া হয়। ভরতপুরের স্বাধীনতা-নাশের সঙ্গে সঙ্গেই দিগের পূর্ব্বশ্রী লোপ পাইয়াছে; তবুও ইহা অতি সুন্দর স্থান। দূরে বর্ষাণার পাহাড় দেখা যায়। সেখানে শ্রীরাধিকার পিত্রালয় ছিল বলিয়া প্রবাদ।

৪

আমি বাবা ও মার সঙ্গে আগ্রাতে যুবরাজ প্রিন্স্ অব ওয়েল্‌স্ (পরে সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড)

দেখিতে যাই। দিল্লীর দরবারের সময় আমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া অনেক রাজা মহারাজা শোভাযাত্রা করিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে আগ্রাতে দরবার হয়। তখন তাজমহল যেরূপ সাজানো হইয়াছিল, তেমন আর কখনো দেখি নাই। যে রাস্তা দিয়া যুবরাজ যাইলেন, সেই রাস্তায় অবস্থিত পুলিস্ সাহেবের বাড়ীতে আমরা গিয়াছিলাম। কত রাজা, মহারাজা, নবাব ও বড় বড় জমীদার হাতী ঘোড়া উট লইয়া বাজনা করিয়া গেলেন। কত চক্ষু ঝল্‌সানো হীরা, মতি, পান্না, জহরত! কাশ্মীর, যোধপুর, জয়পুর, উদয়পুর, গোয়ালিয়র, ভরতপুর, কোটা, বুঁদি, গুইকোয়ার, ঢোলপুর, টান্‌জোর কত দেশের রাজা মহারাজা গেলেন। আমরা পনেরো দিন আগ্রায় ছিলাম, শেঠ সাহেব ও অনেক কর্ম্মচারী গিয়াছিলেন। সেজন্য বাবাকে পক্ষ কাল থাকিতে হইল। শেঠ সাহেব ও যুবরাজের সঙ্গে হাতীতে গিয়াছিলেন ও ভারত নক্ষত্র উপাধি লইয়া ফিরিলেন।

আমরা ও আরও অনেকগুলি পরিবার আগ্রায় অবিনাশবাবুর বাড়ী ছিলাম। অবিনাশবাবু আমায় 'মা' বলিয়া ডাকিতেন, আমিও সত্য সত্য মনে করিতাম, তিনি আমার ছেলে। এই সময়ে আমাদের সঙ্গে তাঁহার তিন পুত্রের খুব সদ্ভাব হয়। সুশীলচন্দ্র, সতীশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র তিন ভাই, তন্মধ্যে সুরেশ আমার সমবয়সী ছিল। এরা আমায় 'ঠাকুরমা' বলিত। প্রত্যেক ছুটীতে ও রবিবারে অবিনাশবাবু আমাদের বাড়ী আসিতেন। রবিবারে আমাদের বাড়ীতে খুব ধূমধাম হইত, আমরা সবাই আনন্দে উৎফুল্ল থাকিতাম। একদিন ৺গোবিন্দচন্দ্র রায়ের দুই পুত্র সুশীল সুবোধ অবিনাশবাবুর বৈঠকখানাতে তাঁহাদের পিতার রচিত "কতকাল পরে বল ভারত রে" নামক সুবিখ্যাত গানটী গাহিয়াছিল।

এই সময় আমরা বৃন্দাবন দর্শনে যাই। বৃন্দাবনে অনেক মেলা হইত। বৈশাখ মাসে বঙ্কবেহারীর চরণ দর্শন, জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণে শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী ও লাট্টার মেলা, আশ্বিনে রামলীলা, কার্ত্তিকে দেওয়ালী ও অন্নকূট, অগ্রহায়ণ মাসে দেবীপূজা ও কাত্যায়নীব্রত, পৌষে বড় কিছু নাই, মাঘে বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশীর মেলা, ফাল্গুনে মহাসমারোহে হোলী ও চৈত্রে শেঠেদের রথযাত্রা হইত। প্রত্যেক উৎসবে যে ঘটা হইত, আধুনিক কালের লোকেরা তাহার কোন ধারণাই করিতে পারিবেন না। রথের পরদিন শেঠসাহেবদের বাড়ীতে বহু অর্থব্যয় করিয়া বাজি পোড়ানো হইত। সে-সব বাজিকরও আজ নাই। আজকাল 'পাইরোটেক্‌নিক্'-বিদ্যাটা বিদেশীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে। উৎসবের সময় রসিবার ঘরে খুব সুন্দর বন্দোবস্ত হইত। বহু বড়লোক ও সাহেব-সুবা উপস্থিত থাকিতেন। বাবা ইঁহাদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। বাবাকে লায়াল সাহেব ছোটলাট, কমিশনার ও ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার খুব ভালবাসিতেন ও তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির

জন্য সাহেবরা বাবার নাম দিয়াছিলেন —'দি লিভিং লাইব্রেরী'।

সব মেলা দেখিয়া ফিরিতে আমাদের খুব রাত হইয়া যাইত। সমস্ত দর্শন করিয়া মা ও মাসীমা মতিমারঞ্জন জোয়ার্দারের বাড়ী যাইতেন। ইনি পাইকপাড়াব লালাবাবুর যে কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর আছেন, তাঁহার ম্যানেজার ছিলেন; খুব বড দাড়ি, সৌম্যমূর্ত্তি, মিষ্টভাষী, নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। ইনি বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আমার পিতাকে একটী কায়স্থ-কন্যা পিতৃসম্বোধন করিতেন। ইঁহার স্বামী কিছু সম্পত্তি রাখিয়া যান। তাঁহার নাম পদ্মাবতী। আমি পদ্মদিদি বলিয়া ডাকিতাম। আমরা বৃন্দাবনে গেলেই পদ্মদিদিকে দেখিতে যাইতাম। তিনি খুব সৌখীন ছিলেন ও গানবাজনা বড ভালবাসিতেন। সর্ব্বদা সখিগণ পরিবেষ্টিতা হইয়া তবলা-বেহালা-মন্দিরা-সহযোগে সর্ব্বদা কৃষ্ণগুণগান করিতেন।

ঝুলনে যেমন ঘটা বৃন্দাবনে দেখিয়াছি, আর কোথাও তেমন দেখিব না। ঠিক মনে হইত —এই ত বৈকুণ্ঠধাম, গোলোকের শ্রীবাসমণ্ডল। যেমন জ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনী, তেমনি আলোকমালা,বিগ্রহসজ্জা, গন্ধাঢ্য কুসুমদাম, মনবিমোহন সঙ্গীত -নির্ঝর! দর্শকবৃন্দের আনন্দোৎফুল্ল মুখ দেখিলে বৈকুণ্ঠ বলিযা ভ্রম জন্মে! স্থানকাল না হইলে ভক্তির উদ্রেক হয় না। গোপীনাথ, মদনমোহন, কৃষ্ণচন্দ্র, রাধা-দামোদর, যুগলকিশোর, রাধারমণ, ধীরসমীর সাজির মন্দির ঝুলনের জন্য বিখ্যাত। সর্ব্বোপরি শেঠেদের মন্দিরেব শোভা অতুলনীয়। লক্ষ্ণৌর নবাবের সমস্ত আসবাব ১০০-ডালের সমস্ত ঝাড় শেঠসাহেবরা কিনিয়াছিলেন। আলোকমালার ছটায় চক্ষু ঝলসিয়া যায়! টিকারীর রাজার মন্দির, বর্দ্ধমানের রাজার মন্দির ও নূতন মন্দিরও মন্দ নহে। সর্ব্বত্রই যাত্রা হয়। আর ব্রহ্মচারীর মন্দিরে প্রত্যহই যাত্রা হয। জযপুরের রাজাগুরুর মন্দিরে তিনটী বিগ্রহ আছেন; তিন কুঠারীতে হংসগোপাল, কৃষ্ণগোপাল ও রাধাগোপাল। বিগ্রহগুলি অতি সুন্দর। নির্ম্মাতৃগণ অনুরাগের অঙ্গুলি দিয়া মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন, তাই বোধ হয় এত সুন্দর। সম্মুখে গোপী-পূজিত গোপীশ্বরের মন্দির। আর গোপী-স্থাপিতা পূর্ণমাসী দেবীও আছেন।

মথুরার তিন ক্রোশ দূরে গড়গোবিন্দে মার সঙ্গে একবার গিয়াছিলাম। শুনিলাম, সেখানে একটি সুড়ঙ্গ আছে, তাহার মধ্যে বিগ্রহ। সুড়ঙ্গ বহুদূর অবধি গিয়াছে, কিন্তু সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বরে কে ঢুকিতে সাহস করিবে? বিগ্রহ অতি সুন্দর। একটী গাছ আছে, তাহার পত্রগুলি সোনার। আবার আশ্চর্য্যের বিষয়, টেঁটিগাছ চারিদিকে; শ্রীকৃষ্ণ টেঁটি ফল খাইতে ভালবাসিতেন। গড়গোবিন্দের পথে আরও পাঁচ ছয় ক্রোশ দূরে নরীশেমরি দুই দেবী আছেন, তাঁহাদের খুব মাহাত্ম্য। মথুরার নিকটে ভূতেশ্বরের মন্দিরের কাছে আর একটী জৈন মন্দির আছে; তন্মধ্যে পার্শ্বনাথ ঠাকুর আছেন। যাত্রী জৈন না হইলে ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। শেঠসাহেবের

জৈনধর্ম্মাবলম্বী একজন খুল্লতাত ভ্রাতা ছিলেন; তাঁহার নাম রঘুনাথ দাস। তিনি ঐ বিগ্রহের রথে ও অন্যান্য পর্ব্বোপলক্ষে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন; তখন মেলা বসিত ও সকলেই ঠাকুর দেখিতে পাইত।

৫

এই সময়ে আমার পিতামহ আমার বিবাহের জন্য বারংবার বাবাকে পত্র দিতেন। দুইবার শীতকালে বড়দিনের ছুটীতে বাবা বাড়ী আসিয়াছিলেন ও দিবারাত্রই পাত্রের সন্ধানে ব্যস্ত থাকিতেন। বাবার পছন্দ ও কর্ত্তার পছন্দমত পাত্র মিলিল না। কর্ত্তা চাহেন খুব বড় কুলীনের ছেলে, আর বাবা চান কৃতবিদ্য ও সচ্চরিত্র পাত্র। আমার নয় বছর বয়স হইতে পাত্র খোঁজা আরম্ভ হয়। বাবার মামাত মেঝো ভাই উপেনবাবু সকাল সকাল আহার করিয়া প্রত্যহ কলিকাতাময় যোগ্য পাত্রের সন্ধানে ঘুরিতেন। সে-সব কথা মনে হইলে এখন একটা বিপুল রহস্যময় ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়। তিনি একদিন আসিয়া মাকে সংবাদ দিলেন, 'প্রেসিডেন্সী কলেজের কেরাণীদের নিকট শুনিলাম ফোর্থ- ইয়ারে একজন ভাল কুলীনের ছেলে অবিবাহিত আছে।'মা তাই শুনিয়া বাবাকে ধরিলেন। ব্যাপার বহুদূর অগ্রসর হইল। আমাকে তিন চার বার সাজানো হইল। বড় বিরক্তি ধরিত, —কনে-দেখা-দেওয়ার অপেক্ষা কষ্টের কাজ জগতে খুব অল্পই আছে!

আমার বড় ভাই সত্যচন্দ্র (এলাহাবাদ-হাইকোর্টের অ্যাড্‌ভোকেট্) এই বৎসর প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ হইলেন ও ১৫ টাকা বৃত্তি পাইলেন। এই উপলক্ষে আমাদের সমস্ত বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করা হইল। সেইদিন ব্রজদিদি আবার আমায় সাজাইলেন। আমার পিতামহ আমার হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে লইয়া গেলেন। ভয়ে আমার মুখ শুকাইল, বুক দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। মনে পড়ে অর্জ্জুনের কথা—

সীদন্তি মম গাত্রানি মুখং চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥—

আমি মুখ নীচু করিয়া ছিলাম, আগন্তুক ভদ্রলোকদের দেখি নাই। একজন আমাকে 'কি পড়ি, কি নাম' ইত্যাদি দুই চারিটী প্রশ্ন করিলেন। একজন কিন্তু নির্ব্বাক ছিলেন; কর্ত্তা আমার হাত লইয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন, 'তুমি যখন বরের বন্ধু, ভাল করে একবার দেখে যাও।'আমাকে ভিতরে যাইবার হুকুম হইল। আসিবার সময় সেই তথাকথিত 'বন্ধু'-টীর দক্ষিণপাদ মাত্র দেখিতে পাইলাম, —তখন ভাবি নাই যে সেই চরণে আমাকে চিরজীবনের মত আশ্রয় লইতে হইবে। এবার বিবাহের কোনই দিন স্থির হইল না।

আমরা মথুরা গিয়াই দুই চারিদিন পরে রথের মেলা দেখিলাম। তাহার পর বাবা একদিন আমায় বলিলেন যে, গোবর্দ্ধন পাহাড়ের উপর যে গোপালজী আছেন, তাঁহার মেলা হইবে। বার বৎসর পরে তাঁহার অন্নকূট হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা অন্নকূট দেখিতে গেলাম। মথুরা হইতে দশ ক্রোশ দূরে জ্যোতিঃপুরা গ্রাম তাম্বুতে ছাইয়া গিয়াছে। কত দূরদেশ হইতে লোক আসিয়াছে। মাদুরা, নাসিক, পঞ্চবটী, মান্দ্রাজ, বোম্বাই হইতে ভক্ত বৈষ্ণবেরা আসিয়াছেন। শেঠসাহেবের জমিদারী, সুতরাং সমস্ত ভার তাঁহার। বেলা দুইটার সময় অন্নকূট দর্শন করিলে যে যতবার জন্মগ্রহণ করুক, কখনই অন্নকষ্ট পায় না। নারায়ণের ছাপান্ন প্রকারের ভোগ হয়। সে সব জিনিষ এক পোয়া পথ অবধি সাজানো হইয়াছে। শুনিলাম, এই সমস্ত দ্রব্য একমাস ধরিয়া তৈয়ার হইয়াছে। ভোগের পর আরতি। চার পাঁচটী নধরকান্তি সুকুমারদেহ যুবা হাতে বালা, গলায় পান্নার মালা, কর্ণে হীরার গহনা, কোমরে চন্দ্রহার, মূর্দ্ধায় চূড়া, অঙ্গে কৌষেয়বাস ও পদে মঞ্জীর ধারণ করিয়া অপূর্ব্বভাবে আরতি করিলেন। শুনিলাম, তাঁহাদের সখীভাব হইয়াছে। দেখিয়া ভক্তিরসে মন ভরিয়া গেল।

এই সময় দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়[৬৩] এক দিন হঠাৎ মথুরায় আসেন। তিনি আমার ভাবী স্বামীর সহপাঠী ও প্রেসিডেন্সিতে সেই সময় এম-এ পড়িতেন। তিনি পাঁচ দিন মথুরায় ও দুই দিন বৃন্দাবনে ছিলেন। আমায় বড় স্নেহ করিতেন ও 'দিদিমণি' বলিয়া ডাকিতেন। দেববাবুর এই আকস্মিক মথুরায় আগমনের কারণ পরে জানিয়াছিলাম, —উদ্বাহ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের যৌবনসুলভ খেয়াল। যাঁহার সহিত আমার সম্বন্ধ স্থির ছিল তাঁহার সম্বন্ধে বাবা দেববাবুকে বহু প্রশ্ন করিতেন। দেববাবু কলিকাতায় গিয়া এঁকে আশ্বাস দেন, 'আমি মথুরায় গিয়াছিলাম। সেখানে কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলা তোমার প্রতীক্ষায় আছেন।'

পিতার সঙ্গে কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ভোজনথালির মেলা দেখিতে বৃন্দাবন গেলাম। দ্বাপরে এইখানে মুনিগণ যজ্ঞ করিতেন। এ সব শ্রীকৃষ্ণের গোচারণের ভূমি ছিল। শ্রীকৃষ্ণ গোপাল-বালকদের আজ্ঞা করিলেন, 'মুনিদের নিকট হইতে যজ্ঞের অন্ন মাগিয়া আন। বল, যে নন্দগোপ-পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অন্ন মাগিতেছেন।' গোপালেরা এই কথা বলাতে মুনিগণ বিশেষ রুষ্ট হইলেন ও বলিলেন, 'গোপবালককে যজ্ঞের অন্ন দিব কেন? যিনি নারায়ণ জগৎপতি, তাঁহাকেই এখনও অন্ন দেওয়া হয় নাই।' শ্রীকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া সখাদের নিকট বলিলেন, 'ঐরূপ বলিয়া মুনিপত্নীদের নিকট অন্ন চাহ।' গোপালগণ যেমন বলিলেন, 'আজ আমাদের সুপ্রভাত —নারায়ণ অন্ন চাহিলেন' —এই কথা বলিয়া মুনিপত্নীগণ আলুলায়িতকেশে ব্রাহ্মণসেব্য অন্নব্যঞ্জন লইয়া তৎক্ষণাৎ বনপথে গমন করিলেন ও ভোজ্যদ্রব্যাদি শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে প্রণামান্তে রক্ষা করিলেন। ভক্তবৎসল হরি আহারে ব্যস্ত, এমন

সময়ে মুনিগণ লগুড়হস্তে পত্নীদের তাড়নার জন্য ব্যস্ত হইয়া আসিলেন। কিন্তু নারায়ণকে সম্মুখে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহারা দিব্যচক্ষু পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সেই যজ্ঞেশ্বর যজ্ঞের অন্তে ভোজনে ব্যাপৃত। ইহা দেখিয়া তাঁহারা যোড়করে স্তব আরম্ভ করিলেন। আর পত্নীগণ যে সহজেই শ্রীকৃষ্ণকে চিনিতে পারিযাছে, অথচ তাঁহারা অজ্ঞ —এজন্য পত্নীদের বহু সমাদর করিলেন। সেই স্মরণীয় বাসরে ভোজনথালির মেলা হয। শেঠসাহেব ঐ দিন পঞ্চাশ মণ লাড্ডু তৈয়ার করাইয়া ছাদে রাখেন ও সপারিষদ্ ছাদ হইতে দরিদ্র ও সাধারণ লোকদিগকে বিতরণ করেন। কিন্তু বাগানের গাছপালাতে লাগিযা অনেক লাড্ডু নষ্ট হইযা যায।

বৃন্দাবনে শেঠদের মন্দিরে একটী মেলা হয়, তার নাম লাট্টার মেলা। একটী খুব বড় গাছ প্রাঙ্গণে পোঁতা হয। ঐ গাছের মাথার উপরে স্থাপিত পাঁচটী ঘটীতে পাঁচটী করিয়া টাকা রাখা হয। চারটা হইতে পাঁচটার মধ্যে যে-কেহ ঐ সরল পিচ্ছিল গাছ বাহিযা উপরে উঠিবে, সে-ই ঐ টাকা ও দ্রব্যাদি পাইবে। পাচজন উপরি উপরি দাঁড়াইলে তবে ঐ গাছের নাগাল পাওয়া যায। একটু কৌপীন ব্যতীত আর কিছুই অঙ্গে থাকিতে পারিবে না। মূলতানী মাটী তৈল দ্বারা ঐ গাছ এত পিচ্ছিল করা হয় ও লোকের গাছে চড়িবার সময় উপর হইতে তৈল জল এত ঢালা হয় যে তাহারা পড়িয়া যায়; অনেক কষ্টে পরে উঠিতে পারে ও টাকা পায। ঐ মেলা আমার ভাল লাগিত না, দরিদ্রদের দুঃখভোগ ও নির্য্যাতন দেখিযা বড কষ্ট হইত।

শেঠসাহেবদের পুকুরে গজ-কচ্ছপের মেলা হয়। গজকে টানিয়া জলমধ্যে লইয়া যাবার চেষ্টা হয়, তখন গজ কাতরভাবে শ্রীভগবানকে ডাকিতে থাকে। পূর্ব্বেই ঠাকুর আসিয়া স্বর্ণ-সিংহাসনে পুষ্করিণীর তীরে থাকেন ও গজ তীরে আসিলেই অগ্নিময় বাণ নিক্ষেপ করেন। কচ্ছপ পুড়িযা ভস্মসাৎ হইযা যায় ও শাপমুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে।

মাঘী পূর্ণিমায় বৈকুণ্ঠ দ্বাদশীর মেলা হয। একবার মা আমায তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। একটী প্রকাণ্ড মন্দিরের দরজা এক বৎসর বন্ধ থাকে। মেলার দিন রাত্রি বারোটার সময় ঐ দ্বার খোলা হয়। স্বর্ণময় সিংহাসনে লক্ষ্মী-নারায়ণ বসেন; তেমনি রত্নালঙ্কারে সাজান হয়, তেমনি আলোক দেওয়া হয়। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! শীত যে কি ভয়ানক, বলিতে পারি না, আমার দাঁতে দাঁতে লাগিয়াছিল। অমনি বঙ্কবেহারী ঠাকুর আছেন, তাঁহারও চরণ এক বৎসর ঢাকিয়া রাখা হয়। অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে চরণ খোলা হয়। বৈশাখ মাসে ভীষণ যাত্রীর ভিড় হয়। কত লোকের সর্দ্দিগর্ম্মি হয়, বলা যায় না। হিন্দুর প্রাণ বড় কঠিন —তীর্থদর্শন যত দুর্ঘট, আগ্রহও তত বাড়ে। সহজ দর্শনে মন তৃপ্ত হয় না। নিধুবন ও নিকুঞ্জবনের লীলা-মাহাত্ম্যও কম নয়। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধা-সহ রাসলীলা করিতেন, আজও নিকুঞ্জবনে রাত্রে

বিছানা পাতা হয়; ভোগের দ্রব্য, পুষ্পমাল্য, চুয়া, চন্দন, ব্যজনী, চামর রাখা হয়; প্রভাতে দেখা যায় যেন রাত্রে কেহ শয়ন করিয়াছিলেন, সমস্ত এমনি বিস্রস্ত। রাত্রে উদ্যানে কেহ থাকে না। আর শিঙ্গারবট, বংশীবট, কেশীঘাট, ও পুলিনযমুনাতট —এই সব অতি সুন্দর; দেখিলে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়, মনে সহজেই ভগবৎ ভক্তির উদয় হয়। যদিও ব্রাহ্মের কন্যা, আমার পিতামহ পরম হিন্দু ছিলেন; সেইজন্য আমিও বাল্যকাল হইতে তাঁহারই মত হইয়াছিলাম, তাই শ্রীকৃষ্ণের লীলা আমার এত ভাল লাগিত।

ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৩৪, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

[জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ সংখ্যার পর *ভারতবর্ষ* অথবা অন্য সমসাময়িক মাসিকপত্রে স্মৃতিকথাটির পরবর্তী কোনো অংশ প্রকাশিত হয়নি। অতএব, রচনাটি অসমাপ্ত, এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে।]

কৈফিয়ৎ

হিরণ্ময়ী দেবী

নববর্ষের ভারতীর জন্য একটি লেখা চাইই চাই—আমারও প্রতি এইরূপ একটি নোটিস জারী হইয়াছে। কেন? অপরাধ? না, কিছু দিনের জন্য একসময় আমিও ইহার সম্পাদক ছিলাম।[১৪] বেশ, হুকুম-নামা শিরোধার্য্য করিয়া সেই-কৈফিয়ৎই তবে এখানে প্রকাশ করি, যে-কারণে আমাকেও এই অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। লেখাটি যদি সুপাঠ্য না হয় ত আমার কিন্তু দায়-দোষ নাই। এ কথাটি আমি আগে হইতেই বলিয়া রাখি।

ভারতী যখন জন্মগ্রহণ করে তখন যে আমরা খুবই ছোট ছিলাম এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও বোধ হয় চলিতে পারে। তখন সবেমাত্র আমাদের অক্ষর-পরিচয় হইয়াছে। ৺পিতৃদেব তখনও ইংলণ্ডে যান নাই, আমরা থাকি তখন বীডন ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে। আমার পূজনীয় নতুন-মামা শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভারতী' বাহির হইবামাত্র পত্রিকাখানি হাতে লইয়া আমাদের বাড়ীতে আসিয়া সহাস্যমুখে মাতৃদেবীর হাতে দিলেন। তাঁহাদের সেদিনকার আনন্দ-উৎসাহের ভাব শিশু আমাকেও এতটা আনন্দ প্রদান করিয়াছিল যে সেদিনটি আমার মনে একটা শুভদিন বলিয়াই অঙ্কিত আছে।

সাহিত্য-রসে প্রবেশ করা দূরে থাক, তখন বেশ পরিষ্কাররূপে পড়িতেই পারিতাম না। কিন্তু ভারতীর নাগাল পাইলেই পাখীর মত কবিতাগুলি কণ্ঠস্থ করিতে চেষ্টা করিতাম। অর্থ না বুঝিলেও ছন্দে আমি মুগ্ধ হইতাম। শিশুকাল হইতেই—যখন হইতে আমার স্মৃতি আরম্ভ তখন হইতেই—কবিতার প্রতি আমার এই টান। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে সেই সকল কণ্ঠস্থ কবিতার অর্থবোধ যেমন সহজ হইতে লাগিল, অন্যদিকে ভারতীর সহজ সরল প্রবন্ধ ও গল্পগুলি আমাদের পাঠ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। এইরূপে ভারতী আজন্মকাল আমাদের সাহিত্য-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

যতদূর মনে পড়িতেছে ভারতীর বয়স যখন দুই বৎসর তখন পিতৃদেব আমাদের যোড়াসাঁকোর বাড়ীতে রাখিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। এই সময় রবিমামাও বিলাত

যান। আমার বড়মামা পূজনীয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদক ছিলেন নামে, কিন্তু কার্য্যতঃ নতুন-মামা ও রবিমামাই ভারতী চালাইতেন। রবিমামা বিলাত যাত্রা করিবার পর নতুন-মামার স্কন্ধেই সম্পূর্ণরূপে এ ভার পড়িল; তাঁহার একজন প্রধান সহায়ক হইলেন মাতৃদেবী। "দীপ নির্ব্বাণ" ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণে রচয়িত্রীর নাম ছিল না। মেজমামা পূজনীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদেশে এই বইখানি হাতে পাইয়া ভাবিলেন, নতুনমামার রচনা। তিনি লিখিলেন, "জ্যোতির জ্যোতি কি প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে?"

'দীপ নির্ব্বাণে'র পর যোড়াসাঁকোয় অবস্থান কালে ২য়-৩য় বৎসরের 'ভারতী'তে মাতৃদেবীর 'ছিন্ন মুকুল' 'গাথা' 'মালতী' প্রভৃতি রচনা প্রকাশিত হয়। বসন্ত-উৎসবও তাঁহার সেই সময়ের লেখা। যোড়াসাঁকো হইতে কাব্য নাট্যের সৃজন প্রথম এই 'বসন্ত-উৎসবে'ই। ইংলণ্ডে বইখানি পড়িয়া রবিমামা মাকে যে আনন্দপূর্ণ পত্র লেখেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, সে পত্রখানি মা রাখেন নাই। রবিমামা বিলাত হইতে বাড়ী ফিরিবার পর আমাদের অন্তঃপুরে বসন্ত-উৎসবের অভিনয়ও হইয়াছিল।

তারপর রবিমামা 'বাল্মীকি-প্রতিভা' 'কালমৃগয়া' প্রভৃতি কাব্যনাট্য রচনা ও অভিনয় করেন। এই সময় রবির কিরণে, জ্যোতির জ্যোতিতে, স্বর্ণের দীপ্তিতে বাড়ী আলোকময়। পুরবাসী আনন্দে তাহাতে "করিছে পান, করিছে স্নান"; ভারতীর পাঠকবর্গও বঞ্চিত নহেন। নিত্য সভায় নিত্য নব গান নব সুর নব রচনা---নবলীলা। বড়রা যা করেন, আমরা ছেলের দল তাহার অনুকরণ করি। বাল্মীকি প্রতিভা বড়দের যেমন অভিনয় হইয়া গেল, আমাদের পালা আরম্ভ হইল! স্থির হইল, আগে বড়দের এ বিষয় জানিতে দেওয়া হইবে না। গোপনে সব উদ্যোগ চলিতে লাগিল। ষ্টেজ কোথায় পাওয়া যায়? বাড়ীতে তখন হরিশবাবু নামে একটি পোষা চিত্রকর থাকিতেন। তিনি একলা নহেন, বাড়ীতে আরো কতকগুলি পোষা মানুষ তখন ছিলেন। সরকার, মাষ্টারদের সঙ্গে তাঁহারা দপ্তরখানায় বসবাস করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন নিয়মিত কাজ ছিল না; আসলে বাবুদের মোসাহেবী করিতেন।

আমরা হরিশবাবুকে ধরিলাম যে আমাদের একটি ষ্টেজ আঁকিয়া দিতে হইবে। আমাদের হাত হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা বৃথা! রফা হইল যে ৫০ টাকায় তিনি সে কাজটা করিয়া দিবেন। কিন্তু এত টাকা আমরা কোথায় পাই একেবারে? মাসে মাসে জল-খাবারের পয়সা হইতে কিছু কিছু পাইবেন এই বন্দোবস্ত হইল। আমাদের পড়ার ঘরে ষ্টেজ খাটাইয়া অভিনয়ের আয়োজন করা হইল। মাতৃদেবীর জন্মদিনে বড়দের সকলেই সেই ঘরে আমাদের তৈরী জল-পানের নিমন্ত্রণে আসিলেন। অভিনয়ের কথা আগে প্রকাশ করা হয় নাই। তাঁহারা আসিয়া ষ্টেজ দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন, অভিনয় দেখিয়াও আনন্দ লাভ করিলেন। আমার মামা মহাশয়

স্বর্গীয় গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ষ্টেজের ইতিহাস শুনিয়া হরিশবাবুর দেনা-পরিশোধের ভার লইলেন। হরিশবাবুর কপাল ভাল। আমরা কত দিনে সে টাকা শোধ করিতাম জানি না; এখন পাওনার সঙ্গে বখ্‌সিসও মিলিল। বাস্তবিক সে ষ্টেজ হইয়াছিল বড় সুন্দর। "ভারতী"র মলাটে তখন বীণাপাণির যে ছবি থাকিত, আমাদের ষ্টেজের শিরোভাগে অঙ্কিত হইয়াছিল সেই ছবি। ড্রপ্‌সিনে— মধ্যে অঙ্কিত রবিমামার মুখ— আর তার চারদিকে একটি ফুলের মালা --- কিন্তু সে ফুল, বাগানের ফুল নয়— নাট্যাভিনেতা ছেলে-মেয়েদের মুখগুলি। আজ সে মালার ফুলগুলি কোন্‌টি কোথায় ? যদি যত্ন করিয়া রাখিতে জানিতাম— আজ সে ড্রপ্‌সিন অমূল্য ধন !

ভারতীর ৭ম বর্ষের শেষে আমার পূজনীয়া নতুন-মামী ইহলোক ত্যাগ করিলে মামামহাশয়েরা শোক মূহ্যমান হইয়া ভারতী ছাড়িয়া দিতে সংকল্প করিলেন। মাতৃদেবী নববর্ষে ভারতী-রক্ষার ভার গ্রহণ করিলেন। ভারতী নূতন গৃহে প্রবেশ করিল। পিতৃদেব দুই এক বৎসর পূর্ব্বেই দেশে ফিরিয়াছেন- -আমরা বাস করি তখন কাসিয়া-বাগানে। এই সূত্রে আমরা ভারতীর সহিত ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা-সম্পর্কে আবদ্ধ হইলাম। আমরা আর তখন কেবল ভারতীর পাঠক নহি—লেখকও হইলাম। এই সাত বৎসরের শিক্ষা-দীক্ষায় ভারতী আমাদেরও সাহিত্যজীবন পরিপুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। আমারি নববর্ষের কবিতা-বচিত হইয়া ভারতী আমাদের গৃহে স্বাগত হইলেন।

ওই যে রে কেঁদে হেসে
নববর্ষ নব বেশে
বর্ষচক্রে আরবার আসিল ফিরিয়া;
নযনে শোকাশ্রুরাশি
অধরে বিদায়-হাসি
ফুলময় আশা-ডালা করেতে ধরিয়া।

ভারতীয় ভার মা গ্রহণ করিয়াছিলেন সভয়ে সঙ্কোচে। কিন্তু বৈশাখের ভারতী বাহির হইবার পর যখন মামারা আসিয়া প্রফুল্ল মুখে সার্টিফিকেট দিয়া গেলেন— সাধারণে তাহাতে যোগদান করিলেন, তখন আমরা আশ্বস্ত হইলাম।

ভারতী হাতে লইয়া মাকে আমার কি অসীম পরিশ্রমই করিতে হইত ! ছোট গল্প বড় গল্প ত তিনি লিখিতেনই, হাস্যকৌতুক হইতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ পর্য্যন্ত অনেক সময় তাঁহাকে নিজে লিখিতে হইত। ইহা ছাড়া সমালোচনা, অন্যের লেখা নির্ব্বাচন,

সংশোধন এবং প্রুফ দেখার কাজ ত ছিলই; ঘরকন্নার কাজ, লোক-লৌকিকতা—এসবও ত বাদ যাইবার নয়,—তাহার উপর— সখী-সমিতির পর্ব্ব!

তখন মাসিকপত্রের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না— বঙ্গদর্শন তখন বন্ধ, তাহার স্থলে নবজীবন ও প্রচার আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ছাড়া আর্য্যদর্শন, বান্ধব, নব্যভারত প্রভৃতি আরও কয়েকখানির নাম উল্লেখযোগ্য।[৬৫]

এক বৎসর পরে জোড়াসাঁকো হইতে প্রথম 'বালক', পরে 'সাধনা' বাহির হইল। মামাদের নিকট হইতে প্রবন্ধ-লাভের আশাও আর তখন রহিল না। বাহিরের ভাল লেখকের সংখ্যাও অঙ্গুলি-গণ্য। যে দুই চারিজন খ্যাতনামা লেখক আছেন, সকল সম্পাদকই তাঁহাদের লইয়া টানাটানি করেন। ফলে দাঁড়ায় এই,— যিনি সম্পাদক, তাঁহার নিজের লেখা দিয়া এবং তাঁহার দলের লোককে দিয়া লেখাইয়াই কাগজ পূরাইতে হয়। প্রকৃত পক্ষে তখন সম্পাদকের পরিশ্রমের উপরই একান্তভাবে মাসিক-পত্রিকার পরিচালনা নির্ভর করিত।

কাঁচা লেখকের লেখা পাকা করিয়া তুলিতে মা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতেন। যে লেখার মধ্যে একটুও ক্ষীর তিনি দেখিতেন, তাহা নীর-বর্জ্জিত করিয়া লইতেন। অনেক সময় এমন হইত যে সংশোধনের পর লেখক বুঝিতে পারিতেন না যে লেখাটি তাঁহার কি না! আজকাল লেখকের সংখ্যা, তুলনায় অনেক বেশী— ভাল লেখা সহজেই পাওয়া যায়; তখনকার দিনের লেখার কষ্ট তাই তোমরা ঠিক বুঝিতে পারিবে না। সে সময়ের অনেক সাহিত্যনবীশ এখন খ্যাতনামা লেখক। এই সময় ভারতীর নিয়মিত লেখক ছিলেন কৈলাস সিংহ, যাদব সিংহ, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়[৬৬] প্রভৃতি। তখন আমার বিবাহ হইয়া গিয়াছে— রাজসাহী হইতে চুঁচুড়ায় আমরা বদলী হইয়াছি— তাই অনেক সময়ই কলিকাতায় আসিয়া থাকি এবং মাকেও যথাসাধ্য সাহায্য করি। আমার প্রধান কাজ ছিল ইংরাজী পুস্তক হইতে 'চয়ন' সংগ্রহ করা। নিজে কবিতা এবং ছোট গল্পও লিখিতাম। তখন আমি স্বামীর নিকট হইতে বিজ্ঞান, দর্শন যাহা শিখিতাম তাহাও মধ্যে মধ্যে অনুবাদ করিয়া দিতাম। আমার ভগিনী সরলার তখন পাঠ্যাবস্থা, তাই আমরা ভারতী গ্রহণ কালে তাঁহার রচনা পাই নাই। পরে তিনিও মাতার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সংস্কৃত-সাহিত্যের সমালোচনা ভারতীর উপাদেয় প্রবন্ধাবলী।[৬৭]

মাতৃদেবীর একজন প্রধান সহায়-বন্ধু ছিলেন ৺কবিবর বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। তিনি প্রায়ই কাসিয়া-বাগানে আসিতেন এবং মাতার রচনা শুনিয়া উৎসাহ প্রদান করিতেন। বিহারীবাবু মায়ের একজন প্রকৃত ভক্ত ছিলেন। তিনি বসন্ত উৎসবের গানগুলি ঠিক তাঁর নিজের রচিত গানগুলির মতই ভাব-বিহ্বলকণ্ঠে গাইতেন। তাঁহার মতে ছিন্নমুকুলের মত উপন্যাস আর বাঙ্গলায় বাহির হয় নাই। মা আমার চিরদিনই নিরভিমান— তিনি কোন প্রশংসায় কোন দিনই চঞ্চল হ'ন নাই। ইহার প্রধান

কারণ তাঁহার নিজের আদর্শ তাঁহাকে নম্র বিনীত করিয়া রাখিয়াছে। যে মহোচ্চ আদর্শ তাঁহার মনে আছে— তাঁহার রচনাকে সে শিখরে তুলিতে পারেন নাই বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। কিন্তু তিনি গর্ব্ববোধ না করুন— তাঁহার প্রশংসায় গর্ব্ববোধ করিতাম আমরা— তাঁহার সন্তানেরা। আর আনন্দ অনুভব করিতেন আমার পিতৃদেব। মাতার এই সাহিত্য-প্রতিষ্ঠা সে ত তাঁহারি যত্নের ফল।

কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায় মাতার আর একজন অকৃত্রিম সাহিত্য-বন্ধু ছিলেন। প্রচার পত্র বাহির হইবার পর হইতে লেখকসূত্রে ইঁহার সহিত আমাদের পরিচয় আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ উভয় পরিবারের মধ্যে একটি আত্মীয়তা-সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কৃষ্ণধন বাবুর স্ত্রী মাকে দিদি বলিতেন, মা তাঁহাকে ভগিনীর ন্যায় স্নেহ-যত্ন করিতেন। মার ধাতটাই স্নেহপ্রবণ; সেজন্য তাঁহার জীবনে বন্ধুতার কখনো অভাব হয় নাই। মহিলা কবি গিরীন্দ্রমোহিনী, সরোজকুমারী, নিস্তারিণী দেবী এবং সুলেখিকা শরৎকুমারী চৌধুরাণী প্রভৃতি সকলেই তাঁহার বন্ধু।

এই অত্যধিক পরিশ্রমে ১০/১২ বৎসর ভারতী পরিচালিত করিয়া মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। ১৩০১ সালের চৈত্রমাসে একদিন চুঁচুড়া হইতে কাসিয়া-বাগানে আসিয়া দেখি ভারতীর ম্যানেজার সতীশবাবু ভারতীর ভাসান-আয়োজনে ব্যস্ত। ডাক্তার বলিয়াছেন মাকে ভারতী হইতে অবসর গ্রহণ কবিতেই হইবে। তাই সতীশবাবু— নববর্ষে আর ভারতী বাহির হইবে না এই মর্ম্মে একখানি মুদ্রিত নোটিস-সহ আগামী বর্ষের অনেক গুলি অগ্রিম মনিঅর্ডার ফিরাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। কাসিয়া-বাগানে তখন ভারতীর নিজেরই প্রেস ছিল। তাই নোটিস অবাধে অবিলম্বে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। এই আয়োজন দেখিয়া আমার মনে যে কিরূপ আঘাত লাগিল তাহা বর্ণনাতীত। আমি তৎক্ষণাৎ নোটিস বিলি প্রভৃতি বন্ধ রাখিয়া যোড়াসাঁকোয় গিয়া রবিমামাকে সম্পাদক হইবার জন্য ধরিয়া পড়িলাম। তিনি তাহাতে কিছুতেই রাজী হইলেন না, কিন্তু আশা দিলেন যে আমি ভারতীর সম্পাদন- কার্য্য গ্রহণ করিলে তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। অগত্যা তাঁহার খাতা-পত্র ঝাড়িয়া যাহা কিছু পাইলাম তাহা সংগ্রহ করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। মাকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য নীলগিরি লইয়া গেলাম। সেখান হইতে তাঁহাকে মহীশূরে সরলার কাছে রাখিয়া আমি বাড়ী ফিরিয়া ভারতীর ধান্ধায় রহিলাম। এই উপলক্ষে অনেক সময়ই আমার রবিমামাকে আক্রমণ করিতে হইত এবং কোন দিনই প্রায় একবারে শূন্য-হস্তে ফিরিতাম না। সেই জন্য মাতুল মহাশয় এখনো বলিয়া থাকেন—"আমার এই ভাগিনেয়ীটিকে আমি কিঞ্চিৎ ভয় করি।"

সম্পাদন-ভার ত গ্রহণ করিলাম, কিন্তু নিজের নাম তবু ভারতীর কলেবরে প্রকাশ করিতে বড়ই সঙ্কোচ হইতে লাগিল। ভাবিলাম একলার নাম না দিয়া যদি দুই ভগিনীর

নামে ভারতী চালাই ত নিশ্চযই দেখাইবে ভাল। সরলাকে লেখায তিনিও এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আমি অনেকটা আরাম বোধ কবিলাম। উমেশবাবু, রামেন্দ্রবাবু, অক্ষযবাবু, ঠাকুরদাসবাবু এই সময় আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিযাছিলেন। দীনেন্দ্রবাবু এবং জলধরবাবুও লিখিতেন[৮], এজন্য তাঁহাদেব নিকট আমি চিবকৃতজ্ঞ। মাও মধ্যে মধ্যে লেখা পাঠাইতেন। এইরূপে তিন বৎসব কাল আমবা দুই ভগিনী ভারতীব সম্পাদক ছিলাম। আমি কিন্তু ইহাব মধ্যে একটি দিনও মাতুল মহাশযকে ভাবতী গ্রহণের জন্য ভজাইতে ছাড়ি নাই। ক্রমাগত জল ঢালিলে পাথরও ক্ষয হয—মামামহাশযেরও আমাব প্রতি করুণাব উদ্রেক হইল। তিনি ভাবতীব সম্পাদনভার গ্রহণ করিতে অর্থাৎ লিখিতে ও লেখা নির্ব্বাচন কবিতে সম্মত হইলেন। ম্য কবা—প্রুফ দেখা, লেখা সংগ্রহ কবার ভাব আমাব উপব বহিল। এইরূপে পুনবায ভারতীকে যোগ্যহস্তে সমর্পণ কবিযা আমার সে কি আনন্দ! তবু মামাটির স্বভাব আমার জানা ছিল-বেশী দিন যে এ আনন্দ ভোগ করা আমাব ভাগ্যে ঘটিবে না মনে মনে তাহা বুঝিতাম—তাই বিদায-সংখ্যায লিখিযাছিলাম :

ববি যদি অস্ত যায আসে অন্ধকার,
তবু রব কাছে; যদি নিভে যায হাসি,
ম্লান হযে আসে রূপ, কোলে তুলে নিযে
যতনে মুছাযে দেব অশ্রুজলবাশি।

সে দুর্দ্দিন শীঘ্রই আসিল। কিন্তু মাতৃদেবী ও সবলা তখন মহীশূর হইতে দেশে ফিরিয়াছেন। কাসিযা-বাগান হইতে উঠিযা বালীগঞ্জে তখন আমরা বাস করিতে আরম্ভ কবিযাছি। সরলা এ ভার একাই বহন কবিতে প্রস্তুত হইলেন। ভারতীর নিকট সর্ব্বতোভাবে বিদায লইযা আমি মৃত সখী সমিতিকে পুনর্জ্জীবিত করিবার ভার গ্রহণ করিলাম।

এখনও পর্য্যন্ত সেই কাজ লইযাই আছি।—বাঙ্গালীব মেয়ের অবসর কোথায ? সংসার আমাদের দেহ মন প্রাণ ষোল আনায দখল করিতে চায। জোর করিয়া ইহার মধ্য হইতে যে কডাক্রান্তি বাঁচাইতে পারি, হে নবীন সম্পাদক, সেটুকু তোমায় দিলে আমার ব্রত উদ্‌যাপন হইতে কিসে ? অতএব আমার এই কৈফিয়ৎ গ্রহণ করিয়াই আমাকে মুক্তি প্রদান কব; আমি আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় গ্রহণ করি।

ভাবতী, বৈশাখ ১৩২৩

আমার বাল্যজীবনী*

সরলা দেবী চৌধুরানী

আমার সব প্রথম যে নিজেকে মনে পড়ে সে তিনবছরের আমি। সে সময়কার দুইটী ঘটনা মনে মুদ্রিত আছে। দাসীরা একটী দুরন্ত শিশুকে ঘরের মধ্যে স্নান করাইতেছে। বালিকার সাবানপিচ্ছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যত তাহারা মর্দ্দন ও ঘর্ষণের দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেছে, তত সেই অধীরা বালিকা তাহাদের হাত ছাড়াইয়া পালাইয়া,— তাহার অঙ্গধৌত সফেন জলের গতি অনুসরণ করিবার জন্য গৃহের নর্দ্দামার দিকে ছুটিতেছে। ফেণিল জল গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে কেমন এক কৌতুকরাজ্যে। নর্দ্দামার সামনেটিতে মেঝের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া, তার বৃহৎ ছিদ্রের ভিতর দিয়া দেখিলে কেমন মজা দেখা যায়। রুদ্ধ ঘরের অন্ধকারের পর সেখানে হঠাৎ কত আলো। আরও একটি কেমন আশ্চর্য্য জিনিষ সেখান হইতে দেখিবার রহিয়াছে। ঠিক্ সেই সময় তারই মত আর একটি শিশুর স্নানক্রিয়া চলিতেছে। একটা মেম্ তার বাড়ীর উঠানে একটা মোড়ার উপর বসিয়া একটা সাদা ধব্‌ধবে ছেলেকে টবের জলে চুবাইয়া চটকাইতেছে,— ছেলেটা তারস্বরে চেঁচাইতেছে। পয়ঃপ্রণালীর অন্তরালবর্ত্তিনী দর্শকস্থানীয়া অতি ক্ষুদ্র মানবিকাটির ঐ দিব্যি সাদা ছেলেটার আপত্তিসূচক ক্রন্দন ও চীৎকারই সবচেয়ে আমোদজনক লাগিত। তার তিন বছরের সুদীর্ঘ জীবনের বিজ্ঞতায় বুঝি মনে হইত— "কি ছেলেমানুষ! আমি ত কাঁদি না!"

নিজের সম্বন্ধে সব প্রথম স্মৃতি আমার ঐ কৌতুকময়ী। তিন বৎসর বয়সের আর একটি মাত্র ঘটনা মনে আছে। শেয়ালদহ ষ্টেসনের লাইনে কখানা খালি রেলগাড়ী পড়িয়া থাকিত। বিকাল বেলা হাওয়া খাওয়াইবার জন্য লইয়া গিয়া কোন কোন দিন চাকররা আমাদের কয় ভাই বোনকে সেই গাড়ীতে চড়াইয়া দিত। এক দিন তাহাতে বসাইয়া হঠাৎ তাহারা গাড়ী টানিতে লাগিল— সেদিন সেই অকস্মাৎ চলন্ত রেলগাড়ীর গতিতে বিস্ময় আনন্দ ভয় ও আগ্রহমিশ্রিত একটা তীব্রভাবের প্রথম নবীন তরঙ্গ শিশুবক্ষে রেখা খেলিয়া গেল।

---

* ইহা "বঙ্গবাসী" পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষগণের অনুরোধে প্রথমে লিখিতে আরম্ভ করি। তাঁহাদের নিরূপিত সময়ের মধ্যে সমাপন করিয়া উঠিতে না পারায়, ভারতীতে প্রকাশ করিতেছি। —ভাঃ সং।

যখন আমার বয়স পাঁচ ছয় বৎসর, আমার পিতার বিলাতগমন উপলক্ষ্যে, আমরা মাতুলালয়ে ছয় নম্বর যোড়াসাঁকোর বাটীতে দীর্ঘকালের জন্য বাস করি। আমার মামা ও মাসিদের ছেলেপিলে গণিয়া আমরা অনেক ভাই বোন। বয়সের ভিন্নতা অনুসারে আমাদের বয়স্যদলের ভিন্ন ভিন্ন থাক ছিল। খুব উঁচু থাকগুলির সবিশেষ খবর রাখি না, কিন্তু আমার দিদি শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর বয়স্যদলটি ঠিক আমারই উপরের থাকে ছিল: আর আমার দাদা—শ্রীযুক্ত জ্যোৎস্নানাথের[১১] দলটি যদিও ছেলের দল, কিন্তু আমাদের সঙ্গেই তাদের সখ্য বেশী, তাহা প্রায় আমাদেরই দলের আর একটা শাখা ছিল। দিদিদের দল আমাদের উপর মুরুব্বিয়ানা করিতেন, কিন্তু দাদাদের দলের সঙ্গে আমাদের চুলোচুলি কিলোকিলির অদলবদল প্রায়ই হইত।

দলগুলি প্রায়ই তিন তিনজনে গঠিত ছিল। আমার দলের আমি সব চেয়ে কনিষ্ঠা, সুতরাং অন্ধভাবে পরিচালিতা ছিলাম। আমাদের দলের যিনি মেজো ছিলেন তাঁকে আমি বড় ভালবাসিতাম, আর যিনি বড় ছিলেন তাঁকে ভয় করিতাম। তিনিই আমাদের পাণ্ডা। তাঁব দাসীদের মহলে ভারি গতিবিধি ছিল, সেই জন্য অনেক বিষয়ে পণ্ডিতা ছিলেন। প্রতিদিন অনেকটা সময় দাসীদের সঙ্গে যাপন করিয়া আসিয়া, নবনব জ্ঞানে পূবিত হইয়া তিনি আমাদের মধ্যে তাহা বিতরণ করিতেন। আর শুধু দাসীদের কাছে কেন? খুব বড় ভাইদের দল খুব বড় বোনদের দল— কোথায় কোথায় যে তিনি না ঘুরিতেন জানি না, সর্ব্বত্রই তাঁর অবারিত গতি ছিল, সুতরাং তাঁহার জ্ঞানসঞ্চয়ের আকর বহু ছিল। অশেষ বিষয়ে তিনি আমাদের নেত্রী ও শিক্ষাদাত্রী ছিলেন।

তাঁদের মহলে একটি ছোট কুঠুরি ছিল। কোন কোন দিন আমরা তিনটিতে সেইখানে মধ্যাহ্ন যাপন করিতে যাইতাম। সেই কুঠুরীর তিন দিক্‌কার দরজা অর্গলবদ্ধ থাকিত, একদিকে শুধু একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষ খুলিয়া রাখা হইত। সেদিকটা গোলাবাড়ীর দিক; গবাক্ষের নীচে অনেকখানি খোলা জমি, উপরে খোলা আকাশ।

তিন সখিতে এক দৌড়ে সেই ঘরে আসিয়া, তাড়াতাড়ি কবাট বন্ধ করিয়া— কবাট বন্ধ করার কারণ, পাছে দিদিদের দল বা দাদাদের দল আমাদের বেদখল করিতে আসে— মেঝেয় পাতা ছোট বিছানার উপর যে-যার নিরূপিত স্থানে ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া শুইয়া পড়িয়া একটু হাঁফ ছাড়িয়া আসিলে, পণ্ডিতা-দিদি তাঁহার জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতেন। সে কতদিন কত অমূল্য [illegible]! আমরা ছোট দুজনে ভক্তিভরে সবিস্ময়ে তাঁর সব কথা উৎকর্ণে শুনিতাম।

একদিন তিনি বলিলেন—"মরবার আগে কি হয় জানিস্?" আমরা বলিলাম—"না ভাই।"

তখন মরণ কি তাই জানিতাম না। আমাদের জ্ঞাতসারে কারও মৃত্যু তখনও সে বাড়ীতে হয় নাই।

তিনি বলিলেন—"মরবার একটু আগে আকাশ থেকে দুজন যমদূত নেবে আসে। তারা দেখতে ভয়ঙ্কর, শরীর প্রকাণ্ড, রঙ ঘোর কালো, গালপাট্টা দাড়ী। তারা জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে যে মরবে তাকে উঠিয়ে নিয়ে চলে যায়।"

আমাদের গা ছম্ ছম্ করিতে লাগিল! আমরা শ্রোত্রী দুটীতে সভয়ে আমাদের ছোট ঘরের একটিমাত্র খোলা জানালার দিকে চাহিলাম। দেখিলাম জানালা অতি ক্ষুদ্র, তার ভিতর দিয়া প্রকাণ্ড শরীর যমদূতের ঢুকিবার সম্ভাবনা নাই। কিছু আশ্বস্ত, তবুও অনেকটা ভীতভাবে আমার পাশের দিদির আর একটু গা ঘেঁষিয়া সরিয়া আমি বলিলাম—"এ রকম ছোট জানলা দিয়ে ত যমদূত ঢুক্‌তে পারবে না?"

আমাদের তত্ত্ববিদ্যাদায়িনী বলিলেন—"তা কেন পারবে না? যমদূতেরা ইচ্ছে করলেই বড শরীরকে ছোট ক'রে যেখান সেখান দিয়ে যে সে ঘরে ঢুকতে পারে। যখন ইচ্ছে যাকে তাকে নিয়ে যেতে পারে।"

একটা নিরুপায় অসহায়তার ভাবে আচ্ছন্ন হইলাম। সেদিন যে তারপর কি করিয়া সেই ঘর ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়াছিলাম বলিতে পারি না। নড়িতে চড়িতে ভয়, উঠিতে পড়িতে ভয়—জানালার দিকে কেবলই সচকিত চোরা দৃষ্টি—যদি দেখি জানালার ধারে যমদূত আসিয়া পৌঁছিয়াছে! যদি আমরা এ ঘর হইতে বাহির হইতে না হইতে আমাদের চুলের মুঠি ধরিয়া ফেলে!

একদিন বিকালে আমরা বাড়ীর ভিতরের বাগানে খেলা করিতেছিলাম। হঠাৎ খুব হাওয়া উঠিল। আমাদের আজ্ঞাকারিনী নেত্রী—ইনি এখন ডিপুটিগৃহিণী—আজ্ঞা করিলেন—"গুড়ি গুড়ি চল্! গুড়ি গুড়ি চল্! এখনি হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

আমার মনে মুহূর্ত্তের জন্য অবিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল, প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল—"কেমন করে জান্‌লে?" কিন্তু তখন প্রশ্নাত্মক বিদ্রোহের সময় নাই—কি জানি এখনি যদি হাওয়ায় উড়ে যাই! সুতরাং আমরা ছোটদুটী আজ্ঞামাত্র তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িয়া সারা বাগানটা গুড়িগুড়ি চলিলাম, খোলা বাগানের সীমা অতিক্রান্ত হইলে যেখানে আর বায়ু চলাচল নাই, সেখানে পৌঁছিয়া আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইলাম। তখন ভাবী হাকিমগৃহিণী তাঁর হুকুমের পোষকতায়, হাওয়ায় মানুষ উড়িয়া যাওয়া সম্বন্ধে দাসীদের কাছে শ্রুত নানা সত্যমূলক কাহিনী বলিয়া আমাদের চমৎকৃত করিলেন।

পাপপুণ্য ও তার দণ্ড পুরস্কার সম্বন্ধে তাঁর কাছে নানা তথ্য লাভ করিতাম। পুণ্যের কথা কিছু মনে পড়ে না, কিন্তু কথায় কথায় পাপ করিতাম বোধ হয়, কারণ পাপের দণ্ড-ভয়টা তিনি প্রায়ই দেখাইতেন। তিনি ঈশ্বরের হইয়া কতকগুলি নিজস্ব দণ্ডবিধি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, যার এক আধটির ভিতর বাস্তবিকই ভারি দক্ষতা ও ভয়ানকতা আছে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণই তাঁহার নিজের, মানবধর্ম্মশাস্ত্রে তাহা লেখে না, যদিও মানবধর্ম্মের প্রতি তাহা অতিশয় সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন।

তিনি বলিতেন, কোন পাপ যেমন বড়দের কথা না শোনা, ঝগড়া করা বা মিথ্যা কথা বলা একবার আচরিত হইলে তার জন্য ঈশ্বর ভবিষ্যজীবনে প্রথমে স্থূল রকম অল্প শাস্তি বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। অল্প শাস্তি যেমন কিনা, সাধারণ শাস্ত্রে সচরাচর যাহা পাওয়া গিয়া থাকে, নরকের আগুনে পোড়া, নরকের ভূতেদের দ্বারা প্রহারিত হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু পাপ যত বেশী করিতে থাকিবে, শাস্তির মাত্রা তত বাড়িতে থাকিবে। পাপের চূড়ান্ত শাস্তির কথা তিনি আমাদের কাছে যা ব্যাখ্যা করিতেন সেইটিই তার স্বকীয় বিশেষ শাস্ত্রের ব্যবস্থা। তিনি শাসাইয়া বলিতেন, "খুব যদি পাপ করিস্ তবে সব চেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি এই যে ব্রহ্মাণ্ডসুদ্ধ সবাই মরে যাবে, তুই একা বেচে থাকবি।" এই কথা বলিয়া আমাদের সবে মাত্র সংসারে আসা কাঁচ মনে একটা ভয়ানক শূন্যতাময় উদাস কল্পরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া দিতেন।

আমি এক দিন তাঁর কথা মনে করিয়া, তেতোলার ছাদে উঠিয়া দিগন্তরেখার চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া সেই চরম শাস্তির দিন কল্পনায় দেখিলাম। যেন কেহ কোথাও নাই; আকাশে পাখী নাই, চিল নাই, বাহিরের তেতালায় বড়মামা নাই, বাড়ী ভিতরের তেতোলায় সেজ মামীরা নাই, সেখানে আমার দিদি দাদা নাই, মঙ্গলা দাসী নাই, বাজি দাই নাই; —বাড়ীর কোথাও কেহ নাই নীচের অন্ধকার ঘরগুলার কোন কোণেও কেহ লুকাইয়া বাচিয়া নাই, ইঁদুরও নাই, একটা পিপড়াও নাই; সামনে যে খোট্টাদের বাড়ী দেখা যায় তাদের ওখানেও কেহ নাই; ব্রহ্মাণ্ড শূন্য, আমি একা রহিয়াছি।

কিন্তু আশ্চর্য্য, আমার একেবারে নিঃসঙ্গ মনে হইল না। আকাশ যেন সঙ্গী রহিয়াছে, আলো যেন সঙ্গী রহিয়াছে; আর থাকিয়া থাকিয়া মনে মনে একটা অনুভব হইতে লাগিল আমার যিনি শাস্তি-বিধাতা ঈশ্বর তিনিও যে কোন্ এক জায়গায় রহিয়াছেন, আকাশে সিঁড়ি লাগাইলেই যেন তার কাছে পৌঁছান যাইবে। কিন্তু সে জন্য কোন আগ্রহ অনুভব করিলাম না, শাস্তি দাতার প্রতি কিছুই হৃদ্যতা বোধ হয় নাই; তিনি আছেন ত আছেন! অথচ তন্মুহূর্ত্তের জন্য একটা এই উপলব্ধি হইয়াছিল তিনি আর আমি কি এক ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ! শুধু আমার সত্তা আছে, আর তাঁর সত্তা আছে, ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নাই। ইহাতে তাঁর উপর রাগও হইয়াছিল, কেমন একটা একাত্মবোধও হইয়াছিল।

ঈশ্বর কিরাতবেশে অর্জ্জুনের পথরোধ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন তাঁর স্বরূপ না জানিয়া তাঁকে স্পর্দ্ধা করিয়া তাঁর উপর বিজয়ী হইয়াছিলেন। আমি ভাবি, অর্জ্জুন যদি প্রথমেই জানিতে পারিতেন তাঁর পথরোধক কে, তবে কি করিতেন? করি কি তাঁহার হস্তকে অপটু করিয়া ফেলিতেন, না তাহাতে বেশী বল দিতেন?

ছয় বৎসর বয়সে ব্রহ্মাণ্ডে একা.অজ্ঞ আমি, শত্রুরূপী ব্রহ্মাণ্ড-পতির সম্মুখীন

হইয়া তাঁহা হইতে ভীত হইলাম না, তাঁহার শরণাগতও হইলাম না। তাঁর তথাশ্রুত কঠোরতম বিধানকে ফাঁকি দিবার ফন্দিই আমার অনুদ্বিগ্ন মস্তিষ্কে ঘুরিতে থাকিল। তাঁর পয়গম্বরস্বরূপিনীকে আমি এক দিন বলিলাম—"আমি কেমন করে একা বাঁচব ? কি খেয়ে থাক্‌ব ? আর কেউ যদি না বেঁচে থাকে আমাকে খাওয়াবে কে ? তাহলে ত আমিও মরে যাব।" —ভাবটা ঈশ্বর ত তবে নিজের ফাঁদে নিজে ধরা পড়িবেন ! কিন্তু আমার সেই দিদিটির মুখে দ্যুলোক ভূলোকের অধিষ্ঠাতা, সর্ব্বজীবের অগোচর, আমার ন্যায় পাপীর প্রতি দয়ালেশহীন বিধাতা বলিলেন—"তা হবে না। খাবার জিনিষ পত্তর সব থাকবে। তোকে রোজ নিজে রেঁধে বেড়ে খেতেই হবে। বাঁচতেই হবে।"

কি নিষ্ঠুর বিধান !

ভাবিতে ভাবিতে আর এক দিন আর একটা ফাঁকির পন্থা মনে মনে উদ্ভব করিলাম। স্বপ্রণীত উদ্ভিজ্জ শাস্ত্রে বিদুষী উক্ত দিদিরই কাছে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম গোলাপজামের বীচি বিষে ভরা, খাইতে নাই, খেলেই লোকে মরিয়া যায়। আমি তাঁর কাছে গিয়া বলিলাম—"ঈশ্বর যদি ব্রহ্মাণ্ডের সব্বাইকে মেরে ফেলে আমাকে একলা বাঁচিয়ে রেখে শাস্তি দেন, আমি সেদিন গোলাপজামের বীচি খাব, তাহলে ত আমিও মরে যাব।" আমাদের ভয়ঙ্করী গুরু-ঠাকুরাণী ক্ষণমাত্র দ্বিধা না করিয়াই উত্তর দিলেন—"সেদিন গোলাপজামের বীচিতে আর বিষ থাকবে না। তুই কিছুতেই মরতে পারবিনে।"

আমার উপায়কুশলতা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত মানিল। এমন অমোঘতার সঙ্গে কে লড়িতে পারে ?

বিবেকানন্দ স্বামী একবার বলিতেছিলেন—"আমাদের দেশে শৈশব হইতে শিশুকে ভয়ের দ্বারা ও ঈশ্বর নামক এক কল্পনার প্রতি নির্ভরপরায়ণতায় ঘিরিয়া দেওয়া হয়, তাহাতে ভারি ক্ষতি হয়। ইহার প্রতিবিধানেচ্ছু হইয়া বেদান্তবাদী একটি শ্বেতদম্পতী আলমোরায় বেদান্তাশ্রম খুলিয়া সেখানে হিন্দু শিশুদের বেদান্তসঙ্গত আত্মনির্ভরের ভাবে মানুষ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।"

বিবেকানন্দের অভিযোগ শুনিয়া আমার নিজের শৈশবের ঘটনা মনে পড়িয়াছিল, মানিয়াছিলাম সত্যই আমাদের কেবলই ভয়সমাকুল করিয়া রাখা হয়।

কিন্তু সেই অতি শৈশবে যে দিন ছাদের উপর উঠিয়া প্রাণীশূন্য বিশ্বকে দেখিয়া আমি নির্ভীক ছিলাম, যেদিন আমার মন শিশুর কলকণ্ঠে গাহিয়া উঠিয়াছিল—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
দর্শম নু বিশ্বদর্শতম্ !"

সেদিন আমার মনের সেই স্বাবলম্বন কোথা হইতে আসিল তাই ভাবি। বোধ হয় তাহা সহজাত হইবে, শিক্ষালব্ধ নয়।

রামচন্দ্রের দৈবী অস্ত্রের ন্যায়, এই সহজ স্বাবলম্বন প্রযোজনের সময় স্মরণমাত্র আজীবন আমার সহাযতা করিযাছে। ইহা মহদ্ভয়ে অভয়, শোকে সান্ত্বনা, দৈন্যে অভ্যুদয, তাপে তাপহরণরূপে আমার সেবা করিয়াছে। যখনি লতার মত লুটাইয়া পড়িযাছি, দলিত ধ্বস্ত হইবার সম্ভাবনায় নিপতিত হইযাছি, তখনি আবির্ভূত হইয়া আমায় তুলিয়াছে, জড়াইযাছে, রক্ষা করিয়াছে। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে চিত্ত যতই কেন বিক্ষুব্ধ হউক না, কেমন করিয়া অচিরে ধ্যানস্থ যোগযুক্ত করিযা সকল ক্ষোভের প্রশান্তি করিযা দিযাছে। আমার এই ঐশ্বরী দানের অংশ যদি আমার দেশের সকল বালকবালিকার মধ্যে বণ্টন করিতে পারিতাম, কৃতার্থ হইতাম।

আমাদের পরিবারে শিশুরা সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নাম লইযা নাড়াচাড়া করিত। সর্ব্বদাই যে ভীতিজনকতায় তাঁর সঙ্গে আড়ি করিয়া থাকিতাম তাহা নয। কখন তাঁকে রুদ্রমূর্ত্তিতে দেখিতাম, আবার কখন কখন তাঁর সঙ্গে বেশ ভাব হইয়া যাইত, তাঁকে অন্তরঙ্গ সখাও মনে হইত।

শৈশবে স্বকৃত দুটি লজ্জারাঙা আচরণ আমার মনে ছাঁকা দিয়া দিযাছিল। স্মৃতির গায়ে এখনও তাদের দাগ খুঁজিযা পাওয়া যায। আমাদের দলটির মধ্যে যিনি মেজো, তাঁকে আমি ভারি ভালবাসিতাম বলিযাছি। তিনি আমার প্রায সমবয়সী ছিলেন—অর্থাৎ দুই এক বৎসরের মাত্র বড়, (দলপতি-দিদিটি বছর চারেকের বড় ছিলেন) এঁরই সঙ্গে বেশী মিল ছিল। বাহির বাড়ীতে আমাদের পড়ার ঘর ও তাঁদের পড়ার ঘর পাশাপাশি ছিল, বাড়ীর ভিতরেও আমাদের ও তাঁদের মহল কাছাকাছি ছিল, তাঁর দাদারা আর আমার দাদা বয়স্য ছিলেন। আমরা অনেক সময় দাসীদের পাহারা এড়াইয়া এ-উহার ঘরে নিজেদের পাথরের রেকাবীভরা জলখাবার লইয়া গিযা খাইতাম। আমাদের আলুভাজির সহিত উহাঁদের আখের গুড়ের সম্মিলন হইলেই তবে রসনা বেশী তৃপ্তি লাভ করিত।

ভোর হইতে না হইতে সব ভাইবোনরা মিলিয়া ও-বাড়ীর বাগানে শিউলিফুল তুলিতে যাইতে হইবে। তাই যে যে-দিন আগে উঠিত সে অপরদের জাগাইয়া দিত। আমি এক দিন আগে উঠিয়া উহাদের তুলিতে গেলাম। লম্বা দুই তক্তপোষে উহাঁরা চারিটি ভাইবোনে শুইযা আছেন, মধ্যে মধ্যে একজন দাসী আছে। তখনও ঘর অন্ধকার, সকলে নিদ্রিত। আমি মশারি খুলিয়া, বিছানায় ঢুকিয়া আন্দাজে আন্দাজে দিদির দিক্‌টাতে গেলাম। মনে মনে মৎলব করিয়া আসিয়াছিলাম, দিদি যদি ঘুমাইয়া থাকেন, তাঁর গালে চুপিচুপি একটি চুমু খাইয়া তাঁকে জাগাইয়া দিব। অন্ধকারে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দিদিকে যখন পাইলাম, তাঁর গালে ধীরে ধীরে ভারি ভালবাসার সঙ্গে একটি চুমু খাইলাম।—"কে গা!—কে গা!"—ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ করিয়া একটা

আওয়াজ হইল। ওমা! আমি করিয়াছি কি? দিদি ভাবিয়া বুড়ী তিনকড়ি দাসীর কুঞ্চিতচর্ম্ম, বলিত, অপরিষ্কৃত গণ্ডে চুমু খাইয়াছি। সকলেই জাগিল, এবং সকলেই আমার এই কুকীর্ত্তি টের পাইয়া হাস্য করিয়া উঠিল। আমি যতটুকু ছিলাম লজ্জায় তার চেয়েও আরও ছোট হইয়া গেলাম। এমন গলদ! তিনকড়ি দাসীকে চুমু খাওয়া! সেই লোল শ্লথ মাংসপিণ্ডকে ভালবাসিয়া আদর করা! বৃদ্ধা অতিশয় কর্কশ প্রকৃতির ছিল, তাকে আমরা শিশুরা কেহই ভালবাসিতাম না। কিন্তু সেদিন একটি ক্ষুদ্র বালিকার ভুলকৃত স্নেহব্যবহারে তার প্রাণের কোন্ একটি তন্ত্রীতে বোধ হয় মুহূর্ত্তের জন্য ঘা পড়িল, সে আমাকে কোলে টানিয়া—"কে? তুমি? এস মা এস"—বলিয়া আদর করিতে গেল। আমি এই আদরের জ্বালায় সকলের বিদ্রূপ ভয়ে আরও অস্থির হইলাম। তার পর সকাল হইতে না হইতে সব দলের মধ্যে রটিয়া গেল আমি আজ ভোরে তিনকড়িকে চুমু খাইয়াছিলাম। দাদাদের দল আমার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, দিদিদের দল সময় অসময়ে তিনকড়িকে দেখাইয়া আমাকে ঠাট্টা করিতে লাগিলেন। আমি যে অনবধানতাবশতঃ কতবড় দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি হাড়ে হাড়ে বুঝিতে লাগিলাম। তার পর হইতে তিনকড়ি বুড়ীটার যাবজ্জীবন তাকে দেখিলেই আমার সর্ব্বাঙ্গ লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া যাইত।

আর একবার একটা গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম। তখনও মৃত্যুতত্ত্ব ভাল বুঝিতাম না। এই পর্য্যন্ত জানিতাম যে কারও বাপ মা মরিয়া যাওয়ার মানে এই যে সে বাপ মার কাছে না থাকিয়া আর কাহারও কাছে থাকে। তাই আমি এক দিন আমার প্রিয় সঙ্গিনীকে বলিলাম—"তোমার যদি ভাই বাপ মা মরে যান, আর তুমি আমাদের ঘরে সারাদিন থাক, সে বেশ হয়।"

আমাদের দলপতি-দিদির কর্ণকুহরে আমার এই নির্ব্বোধ মন্তব্যটি যেমন পহুঁছিল, তিনি হুঙ্কারিয়া উঠিলেন—"কি বলছিস্? দাঁড়া, বলে দিচ্ছি সবাইকে।"

তিনি করিলেন কি, তৎক্ষণাৎ গিয়া ঘরে ঘরে সব অভিভাবকদের জানাইয়া আসিলেন। ঘরে ঘরে বড়দের বিচারাসনের তলে আমার তলব পড়িল। সকলে আমাকে গঞ্জনা দিলেন, লজ্জা দিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন—এমন কথা মুখে আনে!—এমন দুষ্ট মেয়ে! আমি নিতান্ত লজ্জাপীড়িত ও মর্ম্মাহত হইলাম। শিশুর অস্ফুট মনের কাতরতা বড়রা বুঝিতে পারিলেন না। দিদিকে ভারি ভালবাসি, সেই কথাটি প্রকারান্তরে ব্যক্ত করিয়াছি মাত্র, তাহাতে অন্যায়টা কোথায় হইয়াছে তাহা ঠিক তলাইতে না পারিলেও, যখন ভর্ৎসিত হইতেছি তখন ভয়ানক একটা কিছু অন্যায যে নিশ্চয়ই করিয়াছি, তাহা বুঝিলাম। সেই পর্য্যন্ত নিজের অসাধুতা ও [illegible] সম্বন্ধে একটা তপ্ত জ্ঞানের অঙ্কুর বালিকার মনে উপ্ত হইয়া রহিল।

ভারতী, বৈশাখ ১৩১২

জন্মস্মর

সরলা দেবী চৌধুরানী

জন্মান্তর যে প্রামাণ্য, তাহা যে প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিষয় হইতে পারে, সাংখ্যকারিকায় বাচস্পতিমিশ্র তাহা অতি সংক্ষেপে একটি বাক্যেই নিষ্পন্ন করিয়া দিয়াছেন —"কপিলাদিবৎ"। কপিলাদি মুনিরা জন্মস্মর হইয়াছিলেন, সুতরাং জন্মান্তর আছে এবং তাঁহার স্মৃতিও অনুভবগম্য।

চল্লিশবৎসরের ভারতীর প্রথমসংখ্যাতেই নবীন সম্পাদকও তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। বৈশাখের ভারতীতে ভারতীর কাণ্ডারী-পরম্পরার জন্মস্মরতা প্রত্যক্ষ করিয়া আমার মত বিশ্বাসহীন ভূতপূর্ব্বের যৌগিক দৃষ্টিও অকস্মাৎ খুলিযা গেল। নতুবা চৈত্রে যখন "সম্পাদকীয় স্মৃতি"র জন্য প্রথম অনুরোধ আসিয়াছিল, একটা মস্ত ফাঁকায় মন ঠেকিয়া গিয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে সম্পাদকীয় জন্মের কোন স্মৃতি, কোন ছবি, কোন ঘটনায় সে ফাঁকা ভরিয়া উঠে নাই। তাই 'গোড়ায় গাফিলি' করিয়া ফাঁকি দিতে হইল।

'মানসী'র ঐতিহাসিকপ্রবর নাটোররাজ লিখিয়াছেন— "সেই সকল সুদিনে দুর্দ্দিনে দেবী স্বর্ণকুমারীর বিদুষী কন্যাদ্বয় (শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী) 'ভারতী'র প্রতি মাতার অক্লান্ত স্নেহ-পরিচর্য্যায় গুরুশ্রম লাঘব করিবার জন্য অনেক সাহায্য করিয়াছেন।" —ইহাতে যতটুকু ওজন আছে আমার দ্বাদশবর্ষব্যাপী সম্পাদন ঘটনা এর চেয়ে বেশী ওজন লইয়া আমার স্মৃতিকে ভারাক্রান্ত করে নাই। নাটোর-মহারাজের" ঐ ব্র্যাকেটটা ঠিক আমার মনের মাপেই কাটা। কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম সকলের স্মৃতির মাপ এক নয়। এই নববর্ষের 'ভারতী' ব্যক্ত করিতেছে আমি ভাবি আর নাই ভাবি, সময়ের ও সমসাময়িক অনেকের মনে একটা কুলুঙ্গী আমি দখল করিয়া আছি। তাই সম্পাদকের দৌরাত্ম্যে ব্র্যাকেট খুলিতে হইল, ব্র্যাকেটের বেণীবন্ধন মুক্ত করিয়া সনির্ব্বন্ধ মণিবন্ধনে ধরা দিতে হইল।

২

ভারতীর সঙ্গে আমার প্রথম প্রণয় সেই কোন্ শৈশবে, — দশ-এগারো বৎসর বয়সে। আহা, সে কি মধুময় সাহিত্য-রসাস্বাদের দিন গিয়াছে! মায়ের শেল্ফ্ হইতে

পুরান বাঁধান ভারতীগুলি লইয়া গ্রাস করিতাম—

শুধাই অয়ি গো ভারতি তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর মা বাজে না কেন ?

প্রথম ভারতীর এই প্রথম কবিতার তুলনা আমার কাছে আজ পর্য্যন্ত কোথাও নাই। যে সত্য চল্লিশ বৎসর আগে ইহার ভিতর কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সে সত্য আজও ভারত-প্রেমিকের বুকখানা টন্‌টনাইয়া দেয়। এই বছর চল্লিশের মধ্যে নানা কবি ও শিল্পীর হাতে ভারত-মাতার নানা রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে মধুরিমা, যে করুণিকা এই প্রথম মাতৃবন্দনায় বিকশিত হইয়াছিল তাহা নিরুপম। আমার দশ বৎসরের ছোট প্রাণখানি ইহাতে অভিষিক্ত হইয়া অলক্ষ্যে মাতৃভূমি-প্রেমে জাগিয়া উঠিল।

আর-একটি গান সেকালের ভারতীর কোন-এক পৃষ্ঠার পাদদেশে ছিল যেন মনে পড়ে—

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি প্রেমে এ আঁখি বরষিবে
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান।।
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্ব্বল
তোমারি কার্য্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে।।
যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না,
তবুও গো মাতা পারি তা' ঢালিতে
একতিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
নিভাতে তোমার যাতনা।।
যদিও জননি, যদিও আমার
এ বীণার কিছু নাহিক বল।
কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি উঠে শুনি এ বীণা-তান।।

কতবার আপনা-আপনি পিয়ানোর সাম্‌নে বসিয়া এই গানটি ভাবে ভোর হইয়া সাধনা করিতাম, কারো দেওয়া নয়—নিজেরই খুঁজে-পেতে লওয়া জপমন্ত্রের বীজ হইয়াছিল এ গানটি আমার। "বন্দেমাতরং" গানটি পড়িবার শুনিবার বা শিখিবার বহু পূর্ব্বেই রবি-মামার কতকগুলি কবিতায় ও গানে দেশের মাতৃরূপ আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় আরও অনেকের মনেও এইরূপ হইয়া থাকিবে। বঙ্কিমের আনন্দমঠের বহু পূর্ব্বেই রবিমামার এ সকল কবিতা রচিত হয়। সুতরাং দেশমাতৃপূজার প্রধান পূজারী তিনিই। আজ "বন্দেমাতরং" মন্ত্রের অতি ব্যবহার ও অপব্যবহারেব উপর রাগ করিয়া "ঘরে-বাইরে" গল্পে নিখিলেশের মুখে দেশকে মাতৃরূপে বন্দনার বিপক্ষে রবিমামা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু মন্ত্রের দোহাই দিয়া ছেলেরা যে-সব কুকর্ম্ম করিয়াছে তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বন্দেমাতরং গানটিকে দেশের অঙ্গ হইতে ছাঁটিয়া ফেলিতে হইলে রবিমামার জাতীয় বা দেশ-সঙ্গীত ও কবিতার অধিকাংশই ছাঁটিতে হয়। আমি ত তাহাতে রাজী নই।

প্রথম বা দ্বিতীয় খণ্ড ভারতীর আর একটি রচনা আমায় নিতান্ত পাইয়া বসিয়াছিল -- সে "সম্পাদকেব বৈঠক"-এর অন্তগর্ত "রামিয়াড", একটি ব্যঙ্গ নাটিকা, হাসিয়া হাসিয়া নাড়ী ছিঁড়িয়া যাইত। একলা হাসিয়া সুখ সম্পূর্ণ হইত না। তাই মাকে ও মামাদেব ধবিয়া ধবিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া আগাগোড়া সেটা পড়িয়া শুনাইতাম — "দেখ দেখ কি চমৎকার লেখা আগে বেরিয়েছিল। এখন কেন হয় না?" সেটা বড়মামাব লেখা কিম্বা জ্যোতিমামার, কি শুনিয়াছিলাম তখন, ঠিক মনে পড়ে না; ববিমামাব যে নয এটা মনে আছে। কিন্তু যাঁরই হোক্, এ তিনজনের কেহই আমার মুখে সেটাব আবৃত্তি শ্রবণ হইতে পরিত্রাণ পান নাই। হাস্য-সাহিত্যের সহিত আমার সেই প্রথম পবিচয, এবং পরিচয় হওয়া মাত্র সখ্য। সেই সখ্যবলেই দশবারো বৎসর পবে দ্বিজেন্দ্রলাল বায়ের "হাসির কবিতা"গুলিকে খাস্ মজ্‌লিসের কয়েদখানা হইতে মুক্ত কবিযা আমসাহিত্যের দরবারে অকুতোভয়ে পেশ করিয়া দিয়াছিলাম। পুরান ভারতী কাছে নাই, নযত আমার শিশুমনোহারী রত্নগুলি উদ্ধার করিয়া দেখাইতাম।

ভাবতীব সহিত দ্বিতীয় সম্বন্ধ আমার সেবক সম্বন্ধ। মায়ের সাহায্যের জন্য প্রথমে মাঝে মাঝে প্রবন্ধাদি লিখিতাম; ক্রমে অন্যের প্রবন্ধের উপর হাত চালাইতে লাগিলাম। প্রকাশ্যতঃ মা সম্পাদিকা থাকিলেও বস্তুতঃ আমিই সব করিতে আরম্ভ করিলাম। এই সময়ে জলধর সেনের হিমালয়-ভ্রমণবৃত্তান্তের পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসিয়া পড়ে। তাঁহার লেখায় খাঁটি সাহিত্যের রূপ দেখিয়া আমি আনন্দে ভরপূর হইয়া গেলাম। পাণ্ডুলিপি দীনেন্দ্রকুমার রায় অতি সভয়ে পাঠাইয়াছিলেন। যদি পছন্দ না

হয়, যদি প্রকাশযোগ্য মনে না করি, তবে তাঁর লাজুক বন্ধুর লেখা-কুমারীটি বন্ধুর বাক্সবন্দিনী করিয়া রাখিবার জন্য ফেরৎ পাঠানর কষ্ট স্বীকার করিব কিনা এই ধরণের সসঙ্কোচ অনুনয়ের উত্তরে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া লিখিলাম, এ দুর্লভ জিনিষ প্রত্যর্পণের যোগ্য নহে। খনিগর্ভের হীরাকে যতটুকু মাজিয়া ঘষিয়া তোলার আবশ্যক ছিল ততটুকু মাত্র কারিগরি করিয়া ভারতীর প্রদর্শনীতে সাজাইয়া দিলাম। আর প্রতি মাসে সেই খনি হইতে নূতন মাণিক্যের জন্য লোলুপ হইয়া রহিলাম। জানি না আর কাহার কত ভাল লাগিয়াছে, কিন্তু আমি ত জলধর সেনের দেরাদুন, সহস্রপাণি, টপকেশ্বর, কাকঝোড়া, এবং হৃষিকেশ হইতে বদ্রিনারায়ণ পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তাটুকুর বর্ণনায় তাঁর নিকট চির আনন্দ-ঋণে বাঁধা আছি।"[১]

"সাধনা" লইয়া রবিমামা যত মগ্ন হইতে লাগিলেন, মায়ের ভারতী সম্পাদন-কার্য্য যত দুরূহ হইতে লাগিল, আমাব ভারতী সেবাও তত প্রখর করিতে হইল। মায়ের শরীর একবার খারাপ বোধ হইতেছিল, আমি তাঁকে দিদির সঙ্গে দার্জ্জিলিঙে পাঠাইয়া একাই সম্পূর্ণ বোঝা নিজের ঘাড়ে লইলাম। দুই-তিন বৎসর এইরূপে সেবকভাবে পরোক্ষে ভারতী সম্পাদন করিযাছি।

৪

ইহার পর দিদির সঙ্গে যুক্তনামে প্রকাশ্য সম্পাদকও তিন বৎসর ছিলাম। কিন্তু ভাবতীর সাধক হইলাম ১৩০৬ সালে। তখন আমি মহীসূর-প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি। মহীসূর-প্রয়াণে ঘরের বাহিরে গিয়া ভারতবর্ষকে দেখিযাছি, হিন্দুজাতিকে দেখিয়াছি, হিন্দুসভ্যতা দেখিয়াছি। খাঁচার পাখীব ছটফটানি প্রশমিত হইয়াছে, বিশ্বরূপ দেখিয়া আসিয়াছি এবং আপনাকেও দেখিয়াছি। আত্মীয়স্বজনের স্নেহকোমল নীড়ে আপনার সহিত পরিচয় হয় না। আপনাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একবার সব বন্ধন হইতে দূরে সরিয়া যাইতে হয়। মহীসূরে প্রথম আত্মসন্দর্শন আজও মনে পড়ে।

প্রলয়ের ঝড় আজ বহিতেছে বেগে;
ভীষণ নিনাদে বজ্র হুঙ্কারে কঠিন;
গৃহভিত্তি উঠে কেঁপে; —আমি সঙ্গীহীন,
সারা গৃহে একা নারী বসে আছি জেগে।

কবাট অর্গল নাহি মানে, দুমদাম
উঠে পড়ে; দীপ নিভে; বাত্যা গৃহ ভরে;
বিদ্যুৎ ঝলসে আঁখি; —একা আমি ঘরে;
— বাহিরে প্রলয় মেঘ গর্জ্জে অবিশ্রাম

অজস্র প্রপাতে কভু বৃষ্টিধারা ঝুরে,
ভীমরবে তরুশাখা ভাঙ্গে দিশে দিশে;
একা আমি নারী হেথা বসি নির্ণিমিষে
— আঁধারে চৌদিকে শত বিভীষিকা ঘুরে।

একা আমি ভয়শীলা, কম্পিত, চকিত!
একা আমি ভয়হীনা, আত্মবলীয়ান!
একা আমি ক্ষুদ্রতম বৃহৎ-পীড়িত,
একা আমি বিশ্বকেন্দ্র, অতি সুমহান!

১৩০৫-এর শেষে রবিমামা বলিলেন —"তুই যদি নিস আমি আশ্বস্ত থাক্‌ব। আর কারো প্রতি বিশ্বাস নেই। তুই ঠিক চালাবি।"

তাঁহার বিশ্বাসে আমার বিশ্বাস বল পাইল, আমি মানিলাম। এবার শুধু ভারতীর প্রেমিক নয়, মালিক বনিতে হইবে, শুধু সেবক নয়, সাধক হইতে হইবে; — মায়ের অঞ্চলের আড়ালে নয়, দিদির হাত-ধরাধরি করিয়া নয়—একা বিশ্বের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে; উত্তাল তরঙ্গমুখে সমুদ্রে নৌকা ভাসাইতে হইবে, চালাইতে হইবে, গন্তব্যে পৌঁছাইতে হইবে — একলা। ভয় হইল, কিন্তু ভরসাও হইল। মন "আহিতাগ্নিকার" গীত গাহিয়া উঠিল :—

সর্ব্বদেব সাক্ষী করি এ কি ব্রত করিলে গ্রহণ!
পথ যে দুর্গম একায়ন!
সুতীব্র দিবস আর সুদীর্ঘ শর্ব্বরী,
অপ্রকম্প্য চিত্তে সর্ব্ব ভয় পরিহরি,
পারিবে কি যেতে? তুমি বিক্লববচনা!
অশ্রু-আবিললোচনা

দৃষ্টি-বিষ সর্প সেথা জাগে অতি ভীষণ আকার!
করে নিত্য গরল উদগার!
ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ক্রূর, হিংস্র পরাণী যতেক,
ফিরিছে গোপনে; আছে কণ্টক শতেক!
পারিবে সহিতে সব? রে সুখ-লালিতা!
দুরাশা-চালিতা!

উর্জ্জ্বল দ্বিজসম হইবে কি সত্যসঙ্গরা!
অতন্দ্রিতা! চিরলক্ষ্যপরা!
পারিবে সাধিতে শক্তি রিপুনিবর্হণা?
লোকহাস, ভয়লজ্জা, মিথ্যা বিগর্হনা
সহিবে প্রশান্তচিত্তে? হে আহিতাগ্নিকা!
অতি সাহসিকা!

যে অগ্নি জ্বালিলে আজি চিরদীপ্ত রহিবে কি তাহা!
উচ্চারিবে নিত্য স্বস্তি স্বাহা!
প্রাণাহুতি দিবে তায়! আত্মবিসর্জ্জন
নিয়ত হইবে তার সমিধ ইন্ধন!
সংকল্পে অটল রবে! হবে চিরধন্যা!
অয়ি বীরম্মন্যা!

পুষ্পবাসে গন্ধবহ যদি আনে মোহ অভিনব,
নিদাঘ সন্ধ্যায় উঠে বেণুবীণা রব,
ময়ূর-বিরুত-মধু বনভুবচ্ছায়,
পুলকসমুত্থ কম্প যদি শিহরায়,
রবে অকম্পিতা তুমি! হে আত্ম-ঈশানা!
চির-অতৃষাণা!

যদি ঝড় ঝঞ্ঝা উঠে, বক্ষ মাঝে অঞ্চল আবরি,
অগ্নি রাখি দিও জাগি, সারা বিভাবরী!
আর সব নারী ভবে প্রিয়-পরিজনা,
তুমি রহ শ্রেয়োনিষ্ঠ-ব্রতপরায়ণা!
অনাকুলা, অনলসা, সুকঠোরজপা!
দৃঢ় পরন্তপা!

এবারকার ভারতীর গন্তব্য মনে মনে নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম। সেই দিকে তরীর মুখ ফিরাইলাম, আর আমার হাতের প্রথম সংখ্যায় "মৃত্যুচর্চ্চায়" সকলকে আহ্বান করিলাম—

"হে সাহিত্যকর্ণধারগণ! বেলা হইয়াছে, জীবনের কূলে কূলে, সুখসেব্য সুগম তীর্থে তরী অনেকবার ভিড়িয়াছে, এবার বাহিয়া চল মৃত্যুসাগরসঙ্গমে, শুনাও সেখানকার জলদগম্ভীর সঙ্গীত, দেখাও সে রাজ্যের অভয় প্রতিষ্ঠা।"

দেশের নবযুগে যাহা ক্রমে ভৈরবরাগে নাদিত হওয়া নিরূপিত ছিল, কালের অলক্ষ্য নির্দ্দেশে আমারি অঙ্গুলিতে প্রথমে তাহা ললিতে বাজিল।

ওই সময়ে নিবেদিতা ও স্বামী বিবেকানন্দ আমাকে তাঁদের দলে টানিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা বুঝাইতে লাগিলেন আমি যদি হিন্দুনারীর প্রতিভূরূপে বিলাতে গিয়া লেক্‌চার দিই, অসাধ্য সাধন করিতে পারিব। আমি সে কথা বুঝিলাম না, ভারতীর সেবা ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলাম না, কিন্তু এই সূত্রে তাঁহাদের সঙ্গে মিত্রতা ও ভাবের বিনিময়ে লাভবান হইলাম। আবার এই সময় স্বামী শিবনারায়ণ পরমহংস 'ভারতী-মা'-র পুত্রী "সরলা-মা"র ভিতর হঠাৎ এমন কিছু দেখিতে পাইলেন যাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল, আমি যদি তাঁহার দলভুক্ত হইয়া সূর্য্যনারায়ণের উপাসক বনি ও নিত্য হোম করি তবে ভারতবর্ষকে হেলাইয়া দিব।

আমার কথাটা এই, একটা বেকার লোক দেখিয়া বেগার-খাটাইবার লোভ সকলেরই জাগিয়া উঠিল। আমি ভারতী-সেবাতেই তন্ময় রহিলাম।

কিন্তু যিনি নিজ হাতে এবার আমায় ব্রতদান করিয়াছিলেন এবং ব্রত-উদ্‌যাপনে সর্ব্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, ব্রতসাধনা করিতে করিতে তাঁহারই হাতে ধাক্কা খাইলাম। কোথাও কিছু নাই, অকস্মাৎ ভারতীর প্রতি স্নেহবিমুখ করিয়া শৈলেশ মজুমদার তাঁহাকে বঙ্গদর্শন-এর পুনরাবির্ভাবের প্রলোভনে ভুলাইল।

"কাঁহা যূসফ্, কাঁহা জুলেখা হ্যায়"! কোথায় বঙ্কিম, কোথায় তাঁহার বঙ্গদর্শন! নূতন বঙ্গদর্শন টিকিল না। শুধু আমার মামাটি

পরকে আপন করে'
আপনারে পর

আমার বুকের মধ্যে একটা মস্ত চিরা দিয়া দিলেন।

বাহিরের আঘাতে সাধনা ভঙ্গ হয় নাই, ঘরের লোকের ঘায়ে তপোশৈথিল্য হইল। তখন দীনেশ-সেনাদির তলব পড়িল। যখন অন্তরে উত্তাপের অভাব, তখন বাহিরে নানা কৃত্রিম উপায়ে উত্তাপের আয়োজন করিতে হয়, নয়ত শরীর রক্ষা হয় না। ভারতীর শরীর এইরূপে রক্ষা করিতে থাকিলাম।— আহিতাগ্নিকার অগ্নি না নিভিয়া যায়!

অনিয়মিত বাহির হওয়া সেকালের মাসিক পত্রের একটি প্রধান সংক্রামক রোগ ছিল। ভারতীও তাহাতে আক্রান্তা ছিলেন। সে রোগ দূর করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, কৃতকার্য্যও হইয়াছিলাম। সময়ের কাঁটা ঠিক রাখার

জন্য আড্ডির ছাপাখানার গলির সামনে, এমন কি আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটা গলির মোড়ে দপ্তরী মিঞার বাড়ীর সন্নিকটেও গাড়ীতে বসিয়া ধর্ন্না দেওয়া মাসের শেষ কটা দিন আমার একটা নিত্যনিয়মিত ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল।

'ভারতী'র ভাণ্ডার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার না হইলেও লেখকমাত্রকেই কিছু না কিছু প্রণামী বা আশীর্ব্বাদী নিবেদন করা আমার আর-একটি উচ্চ লক্ষ্য ছিল। যিনি কিছুই লইতে স্বীকৃত নন, তাঁকে অন্ততঃ একটি স্বর্ণলেখনীগ্রহণে বাধ্য করিতেও চেষ্টাব ক্রটী করিতাম না। ভারতী-সেবা স্মরণ কবিয়া ভাবি—

কত অজানারে জানাইলে তুমি
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু
পরকে করিলে ভাই!

যে মণিলাল আজ ভারতীর সম্পাদক হইয়া ভারতীকে নূতন আয়ুদান করিয়াছেন, তাঁর ভক্তি ও সেবায় ভারতী দুইবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন — আজ মা যখন ছাড়িয়া দিয়াছেন, আর দশ-এগার বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন না ছাড়িয়াও প্রায় ছাড়ি। বঙ্গবিভাগের দুর্য্যোগে স্বদেশী যখন বয়কটে বিষাক্ত হইয়া উঠে আমি তখন বঙ্গের বাহিরে। সেদিন আহিতাগ্নিকার অগ্নি এই বালক-ভক্তই প্রদীপ্ত রাখিয়াছিলেন।

ভাবতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

সেকালের ঢাকা শহর

সজলনয়না দেবী

১২৮২ সালে ঢাকা সূত্রাপুরে আমার মাতামহ ৺হরাণচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বাড়িতে আমার জন্ম হয়। বাড়িতে ছোট ছেলে ছিল না, সুতরাং আমি হওয়াতে বাড়ির সকলেই অত্যন্ত আহ্লাদিত হয়েছিলেন।

আমার পিত্রালয়ে বহু পরিবার। সেকালে গৃহস্থ পরিবারের মেয়েরা সংসারের কাজকর্ম করিতেন। আমার মাকে সংসারের অনেক পরিশ্রমের কাজ কর্‌তে হ'ত। তাতে শরীর অত্যন্ত খারাপ হ'ত, শেষে যখন আর খাট্‌বার অবস্থা থাকত না, তখন দাদামশায় জ্যেঠামশায়দের অনেক বলে-কয়ে মাকে ঢাকায় নিয়ে যেতেন, সেখানে কয়েক মাস থেকে শরীরের ভাল কিছু উন্নতি হলে আবার ফিরিয়ে আনতেন। সুতরাং আমি ছোটবেলায় ঢাকায় অনেকবার গিয়েছি। পঞ্চাশ কিম্বা বাহান্ন বছর পূর্বে ঢাকা শহরের যে স্মৃতি মনে অস্পষ্ট হয়ে জেগে রয়েছে তাই আজ লিখ্‌ছি।

তখন ঢাকার রাস্তায় ফুটপাথ ছিল না, গ্যাসের আলো ছিল না, কেরোসিনের আলো অবশ্য ছিল, বাড়িতে জলের কল ছিল না —সব বাড়িতে পাতকূয়া ছিল।

সব রকম জিনিসই খুব সস্তা ছিল, আমি তখন ছোট, সুতরাং কিসের কত দাম তা অবশ্য জানতাম না, তবে খুব যে সস্তা তা জানতাম। সোনা ষোল টাকা ভরি ছিল শুনেছি, রুপো ছিল এক টাকা ভরি। খাবার জিনিসের খুব বাহুল্য ছিল। পাত ক্ষীর (কলাপাতার উপর খোয়া চাপড়া করে দিয়ে তার উপর আর একটি পাতা চাপা দেওয়া) সানি ক্ষীর (হাঁড়ির ভিতর নালী ক্ষীর) ছাপার মাখন (খাঁটি মাখনের ছাপ দেওয়া) ইত্যাদি সমস্ত দিন ফেরিওয়ালারা বিক্রী করত। মাছও খুব সস্তা ছিল, খুব ছোট ছোট এক রকম মাছ পেতাম খুব আস্বাদী ; তার নাম সোনা খড়্‌কে। সব রকম ফল, বিশেষত কমলালেবু, আনারস, পেয়ারা, মাখ্‌না(দেখতে উপরে গোল, ভিতরে পদ্মচাকার মত ছোট ছোট ফল) এই সকল অপর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যেত।

ঢাকার মোরব্বা অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। শ্রীহট্ট থেকে মোরব্বা আমদানী হ'ত। কমলালেবু, নারেঙ্গালেবু, আমলকী, হরিতকী, শতমূল এই সব মোরব্বা ছিল আমাদের

অত্যন্ত প্রিয়। ঢাকায় এতদিন ছিলাম, কিন্তু গরিব ভিখারী একদিনও দেখি নি। সমস্ত শহরের বেশীর ভাগ লোকই সামান্য ক্রিয়াকর্মে আড়ম্বরটা খুব পছন্দ করত। বিবাহ ব্যাপারের ত কথাই নেই, বিবাহের উৎসব দশ দিন পর্যন্ত হবে আর গাড়ি বোঝাই লোক (এক গাড়িতে দশ-বারজন পর্যন্ত) কেবলই নিমন্ত্রণ খেতে যাবে। কুটুম্বর নাম হল ইষ্ট। বিয়ের সময় কনে নিজে "ফুল কোটা" নিয়ে বরকে বরণ করবে।('ফুল কোটা' এক রকম ক্রিয়া, ফুল নিয়ে বরের সম্মুখে নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করা; তা দেখতে বেশ সুন্দর)। তারপর তত্ত্ব পাঠানো। আজকালের মত থালায় করে সন্দেশ পাঠানো নয়, সমস্ত জিনিস বাঁকে করে আন্দাজ ত্রিশজন লোক নিয়ে যাবে, সঙ্গে বাজনা বাজতে বাজতে যাবে, সে এক বিরাট দৃশ্য। তত্ত্বর নাম ছিল হাড়ু।

আমার মাতামহ ফৌজদারীর সেরেস্তাদার ছিলেন। মাইনে পেতেন দু'শো টাকা। বড়লোক অবশ্য নন, কিন্তু উদার চরিত্র, সদালাপী, ধার্মিক, পরোপকারী ছিলেন। ঢাকার প্রায় সমস্ত বড়লোকের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল। তখন ঢাকার নবাব ছিলেন আবদুল গনি, তাঁকে সচরাচর লোকে গনি মিঞা বলত। আমার মাতামহ তাঁর বাড়িতেও মাঝে মাঝে যেতেন।

মামার বাড়িতে লোকজন কম ছিল। দাদামশায়, দিদিমা, বড়মামা ৺আশুতোষ সরকার (তখন ল কলেজে পড়তেন),মেজ-মামা ৺শ্রীশচন্দ্র সরকার (পরে কলিকাতায় ডাক্তারি পড়তেন), ছোটমামা নরেন্দ্রনাথ সরকার (স্কুলে পড়তেন)। ছোটমামার মুখে শুনেছি, একদিন তিনি স্কুলে পড়ছেন এমন সময় খবর এলো তাঁর একটি ভাগ্নি হয়েছে। খবর শুনেই তিনি দোয়াত কলম নিয়ে বাড়ির দিকে দৌড়লেন, কাপড়ে কালি লেগে একাকার হয়ে গেল, তাঁর সেদিকে হুঁস নেই। পাড়ার লোকেরা মামাদের বললে, "তোমাদের ভাগ্নি হয়েছে, আমাদের খাওয়াও।"তখনই কমলালেবু, সন্দেশ এনে সকলকে খাওয়ান হল।

সে সময় ঢাকায়, সনাতন, রূপ, রঘু তিন ভাই খুব বড়লোক ছিলেন, তাঁরা দাদামশায়কে খুব মান্য করতেন। রূপবাবুর স্ত্রী দিদিমাকে মা বলতেন। দিদিমার দুই বোন অল্প বয়সে বিধবা হয়ে সর্বত্যাগী হয়েছিলেন। দিদিমাও তাঁদের জন্য সর্বত্যাগী হয়েছিলেন, কেবল এয়োস্ত্রীর চিহ্নস্বরূপ মোটা লালপেড়ে কাপড় আর হাতে দুই গাছা বালা ছাড়া তিনি আর কোন গহনা পরতেন না। বড়লোকের বাড়ি নিমন্ত্রণ, তাও সেই বেশেই যেতেন, কিন্তু তাঁকে কেউ অনাদর করত না। ঢাকার মেয়েদের আবার তেমনি সাজ বাহারের ধুম ছিল, কি রাশিকৃত গহনা যে পরত তা বলে শেষ করতে পারি না। সব আমার মনে নেই, তবে যা মনে আছে বলছি। মাথায়

ফুল-চিরুণী, কানে কানবালা, চৌদানী, মাকড়ী, গলায় হাঁসুলী, আরও চার পাঁচটি কি ঠিক মনে নেই। উপর হাতে তাবিজ, যশম, অনন্ত, বাজু। নীচের হাতে পিন খাড়ু, চুড়ি, যবদানা, মরদানা, নারিকেল ফুল, পুঁইছে, বালা ইত্যাদি। কোমরে গোট, চন্দ্রহার। পায়ে গুজরী- পঞ্চম, পাঁছর, বাঁকমল, চরণপদ্ম। গায়েব কোন যাযগায ফাঁক থাক্‌ত না।

রঘুবাবুর মেয়ের ছেলের ষষ্ঠীপূজার সময় আমরা আমন্ত্রিত হযে গিযেছিলাম। ষষ্ঠীপূজায় এত ঘটা কখনও দেখি নি। ষষ্ঠীপূজার নাম হল থুযানি। বাই নাচ, সাহেব-বিবির নাচ, ইংরেজী বাজনা এসব ত হলই, আর কতলোক যে এসে খেয়ে গেল, তার সীমা-সংখ্যা নেই। ছেলের বাপের বাড়ি থেকে দোল্‌না খাট, বেনারসী মশারি, সোনার একটা গামলা ক'রে সোনাব খেল্‌না প্রভৃতি এসেছিল। তাবপর গহনা পোষাক ত আছেই।

রূপবাবুর ছেলের বিয়ের সময়েও আমরা গিয়েছিলাম। কনের বাড়ি আমাদের বাড়িরই কাছে ছিল। দিনেরবেলা রাস্তার দুধারে বড় বড বাজী পুঁতে দিযে গেল, রাত্রে বাজনা, আলো,সাজানো হাতী, ঘোঁড়া, শোলার পাহাড, সং ইত্যাদির সঙ্গে বর চতুর্দোলা চড়ে এলো। তখন সেই সব বাজীতে আগুন দেওয়া হল। রূপবাবুর ছেলের নাম ছিল রাধাবল্লভ। মেয়ের নাম নবেশ। তাব সঙ্গে আমার মাসীমার খুব ভাব ছিল, মাসীমার সঙ্গে সেখানে আরও একবার গিযেছি।

ঢাকায় বিয়ের আর একটা বিশেষত্ব —বাড়িতে যখন বিযে হবে মেয়েরা সমস্ত দিন চীৎকার ক'রে গান গাইবে। আবার তাদের ভাষা এমন যে আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না, শুনতেও বিশেষ ভাল লাগত না। তবে রূপবাবুরা অনেকটা মার্জিত রুচিসম্পন্ন হযেছিল। তাদের কথা পরিষ্কার, আর গহনার ভিতর যেগুলো নিতান্ত সেকেলে সেগুলো বাদ পড়েছিল।

ঢাকায় মেয়েদের আব্‌রু খুব বেশী ছিল। তখন মোটর,বাস ইত্যাদি হয় নি। যারা খুব বড়লোক তাদের বাড়িতে হাতী থাক্‌ত, হাতীর উপর হাওদা দিয়ে সকলে চড়্‌ত । সাধারণ লোকে ঘোড়া-গাড়ি ভাড়া করেই যাওয়া-আসা কর্‌ত। মেয়েরা যখন কোথাও যাবে বাড়ির ভিতর থেকে গাড়ি পর্যন্ত, দুদিকে দুখানা কাপড় কিম্বা চাদর দিয়ে আড়াল ক'রে রাখত, যাতে বাহিরের লোক না দেখে ফেলে। গরীব মুসলমানের মেয়েরা বোরখা পরে রাস্তায় বেরুত। ব্রাহ্মসমাজের ভিতরেও মেয়েরা চিকের আড়ালে থাক্‌তেন।

বিধবাদের অত্যন্ত শুচিবাই ছিল, ভাঁড়ার কিম্বা ঠাকুর ঘরে চূণকাম করবার দরকার হলে নিজেরাই কর্‌ত, মুসলমান রাজমিস্ত্রী যেতে দিত না।

ঢাকায় বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ প্রাধান্য ছিল। কার্তিক মাসে নিয়ম সেবার সময় ভাগবত পাঠ, কীর্তন প্রভৃতি বাড়ি বাড়ি হ'ত। রাস্তায় যখন কীর্তনের দল চলে যেত, তখন দু'পাশের বাড়ি থেকে খই বাতাসা প্রভৃতি ছড়ানো হ'ত। কীর্তনের পর সকলে সেই পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিত, এমন কি খুব বড়লোকেরাও পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিতেন।

হরির লুটের খুব ধূম ছিল। হরির লুটে বাতাসা, কদ্‌মা ও এলাচদানার লুট দেওয়া হ'ত। কোন কিছু বিষয় উপলক্ষ্য করেই হরির লুট মানা হ'ত। একজন বড়লোক (রূপবাবু কি রঘুবাবু তা মনে নেই) হরির লুট মেনেছিলেন, পাঁচশো টাকার। পাঁচশো টাকার লুট মেনে ভাবলেন, এত টাকার বাতাসা এলাচদানা কি হ'বে? এই চিন্তা তাঁর মনে হ'বামাত্র ভয় হ'ল এবং নিজের দুই কান মলে বললেন, "অপরাধ হয়েছে, জরিমানা পঞ্চাশ দিব।"সুতরাং তিনি পাঁচশো পঞ্চাশ টাকার হরির লুট দিলেন।

তখন ঢাকার বাসিন্দা প্রায় সকলেই সাহা ছিলেন। কায়স্থ ছিলেন আমার দাদামশায়, তাঁর জ্ঞাতি দুই ভাই আর আমার পিসেমশায় মতিলাল বক্সি। পিসিমার ছেলে তড়িৎকান্তি বক্সি আমারই বয়সী ছিলেন। আর আমার বড়মামার শ্বশুর বাড়ি ফুলবাড়িয়ায় (শহরের শেষে) ছিল। তাঁদের একটু ইতিহাস আছে। ✓গোপাললোচন মিত্রের পূর্বপুরুষ সিপাহী বিদ্রোহের সময় কতকগুলি ইংরেজকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, সেই জন্য গভর্নমেন্ট থেকে বংশপরাম্পরায় রায়বাহাদুর উপাধি, আর জায়গা জমিদারী অনেক দিয়েছিলেন। তাঁদের খুব প্রকাণ্ড বাড়ি —বড়লোকের বাড়ির মত সব ছিল, একটা ঘরে কেবল ঝাড় লণ্ঠনই বোঝাই ছিল, রূপার বাঁট দেওয়া বেনারসী ছাতা ইত্যাদি সমস্ত ছিল। গোপালবাবুর ভাইঝির সঙ্গে বড়মামার বিবাহ হয়। অল্প বয়সে বিয়ে হলে লেখাপড়া প্রায়ই হয় না, আমার বড়মামার কিন্তু এন্ট্রাস পাস করেই ষোল বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, তারপরে আরও চারটি পাস করে উকীল, পরে মুন্সেফ, পরে জজ হয়েছিলেন। গোপালবাবুর নিজের কোন সন্তানাদি হয় নি, তাঁর এক শ্যালকের মেয়েকে পোষ্য কন্যা নিয়েছিলেন, তাকে কিছু বিষয় দিয়েছিলেন, কলিকাতায় কালী মিত্রের এক নাতীর সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন। আর সমস্ত বিষয় বাড়ি বড়মামিমার ভায়েদের দিয়েছিলেন। শোভাবাজারের রাজা নীলকৃষ্ণের সঙ্গেও উহাদের কি একটা কুটুম্বিতা ছিল ঠিক মনে নেই। গোপালবাবুর বাড়ি তাঁর মা বোন, দূর সম্পর্কের মাসী, পিসী ইত্যাদি, বড়মামিমার মা এইরূপ অনেক বিধবা প্রতিপালিত হতেন। বড়মামিমার তিন ভাই আর এক মাস্তুতো ভাই ছিলেন। বড়মামিমার ভায়েরা অল্প বয়সে অভিভাবক শূন্য হয়ে অগাধ টাকা হাতে পেয়ে, চরিত্র ঠিক রাখ্‌তে পার্‌লেন না। মদ ও বারবনিতার পিছনে সমস্তই শেষ কর্‌লেন। বড় ভায়ের একমাত্র মেয়ে

অল্প বয়সে বিধবা হয়ে মারা গেল। মেজ ভাইয়ের দুই ছেলে দুই মেয়ে, মেয়েদের বিয়ে দিয়ে তারা শ্বশুর বাড়ি আছে। ছেলেরা বাপের চরিত্র দেখে দুঃখে ঘৃণায় কেউ বিয়ে করে নি।

আমার মাতামহের সূত্রাপুরে তিনটি ছোট ছোট বাড়ি ছিল, পরে তিনি পেন্‌সন নিয়ে বাঙলা ১২৯২ কিম্বা ৯৩ সালে কুমারখালী গ্রামে নিজের বাড়িতে আসেন। বাড়িগুলি ভাড়া দেওয়া ছিল, তারপর বিক্রয় করা হয়েছে, আর ঢাকার সঙ্গে কোনই সম্পর্ক নাই। কিন্তু ছোটবেলায় যখন ঢাকায় থাকিতাম দিনগুলি খুব সুখে শান্তিতে কেটেছে সেকথা এখনও মনে পড়ে।

দেশ, ১২ এপ্রিল ১৯৪১

পুরাতন কথা

সরোজকুমারী দেবী

ভারতীর সহিত আমার পরিচয়, সে ত আজিকার কথা নয়, সে যে বহুদিনের কথা—প্রায় ২৬ বৎসর।

ভারতীর অনেক পাতায় আমার হাতের ছাপ আছে—আমার হৃদয়ের অনেক ভাব সেখানে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ভারতী-সম্পাদিকার স্নেহ-সলিলে সিঞ্চিত হইয়া তবে সেই ভাবের মুকুল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। সেইজন্য তাঁহার স্নেহঋণে আমি চিরঋণী। আজ সেই পুরানো কথার আলোচনাতেও মনে আনন্দ জাগিয়া উঠিতেছে। এখন আর জীবনে সে চপলতা নাই, সে আশা উদ্যম, উৎসাহ নাই, সবই এখন স্থির, ধীর। তবুও সেই অতীতের কথা স্মরণ করিতে এখনো প্রাণে যেন সেই উৎসাহ ফিরিয়া আসে।

ভারতী-সম্পাদিকার সহিত আমার প্রথম দেখা সেই প্রথম সখি-সমিতির শিল্পমেলায়। তখন আমাদের বাড়িতে বিবাহের পর মেয়েদের বাহিরে যাইবার অনুমতি ছিল না। আমি বাল্যকালে বেথুন স্কুলে পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য বেথুন স্কুলে শিল্পমেলা হইবে শুনিয়া জিদ ধরিয়া বসিলাম, আমিও যাইব। আমার তখন বিবাহ হইয়াছে, কাজেই হুকুম পাইলাম না; কত দিন ধরিয়া সাধ্য-সাধনা চলিতে লাগিল। আমার মায়ের কোনো আপত্তি ছিল না; তিনি শিক্ষিতা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মতে কোন কার্য্যই হইত না। শেষে মুন্নি-দার (খুল্লতাত-পুত্র সিভিলিয়ান মাননীয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত) চেষ্টায় আমরা শিল্পমেলায় যাইতে পাইয়াছিলাম। সেজন্য উপরওয়ালাদের কত খোসামোদই না করিতে হইয়াছে!—কত আশা-নৈরাশ্যের তুফান বহিয়া গিয়াছে। শৈশবের সেই পাঠগৃহে প্রবেশ করিয়া আমার যে কি আনন্দ হইল তাহা বলিতে পারি না। গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়াই প্রবেশপথে মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীকে দেখিলাম, তিনি সকলকে অভ্যর্থনা করিতেছিলেন। বেথুনে পড়িতাম বলিয়া শ্রীমতী সরলা দেবীর সহিত পরিচয় ছিল;—কবি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের ভগিনী বলিয়া আমাকে তাঁহারা সকলেই জানিতেন। সেই সময়ে আবার আমার প্রথম কবিতাটি ভারতীতে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।[৭২] শ্রীমতী সরলা দেবী তাঁহার মায়ের সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন, আমার সেই

কবিতাটির কথাও উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না। এখনো বেশ মনে পড়ে, আমায় দেখিয়া সেদিন মাননীয়া ভারতী-সম্পাদিকা কিরূপ স্নেহের হাসি হাসিয়াছিলেন। সেদিন যে আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলাম, ইহজীবনে ভুলিব না। সেই মায়ার খেলা নাট্য অভিনয় এখনো যেন স্বপ্নের মত চোখে ভাসিতেছে। তখন ঠাকুর-বাড়ীর কাহারও সহিত পবিচয ছিল না। কাজেই কে কোন্ ভূমিকায অভিনয করিবেন, তাহা জানিতে ভারি ব্যস্ত হইযাছিলাম। আমার জীবনের প্রিয় বন্ধু শ্রীমতী প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীও[১৩] এই অভিনযেব মধ্যে ছিলেন। অবশ্য তখন তাঁহাকে জানিতাম না; পরে তাঁহার সহিত পরিচয হইযাছিল। সেই মায়া-কুমারীগণের গান এখনো যেন কানে লাগিয়া আছে। শ্রীমতী প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী ইন্দিবা দেবী, শ্রীমতী প্রিয়ম্বদা দেবী সকলেই অভিনয করিযাছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী শান্তা ও শ্রীমতী অভিজ্ঞা দেবী[১৪] প্রমদা সাজিযা তাঁহাদের সেই সুমিষ্ট কণ্ঠের গীত-ধারায সকলকে মোহিত করিযাছিলেন। সেরূপ সু'দর অভিনয আব যে কখনো দেখিযাছি, এমন মনে হয না। এখনো যেন সেই-সব দৃশ্য বিচিত্র চিত্রপটের মত মানসপটে চিত্রিত রহিযাছে। মায়ার খেলা নাট্য-অভিনযেব পব আমি গৃহে ফিরিবার পথে সোপান-শ্রেণীর নিকট দাঁড়াইযাছিলাম; ভারতী সম্পাদিকা আমায আসিযা জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কেমন দেখিলে, বেশ ভাল লাগিল?"

আমি এমন আশ্চর্য্য হইযা গেলাম! তিনি আমার সহিত কথা কহিলেন! তিনি ভারতীর সম্পাদিকা, কত তাঁর নাম, কত বড তিনি! আর আমি সামান্য বালিকা; আমার সহিত তাঁর আলাপের ইচ্ছা দেখিয়া আমি ত একেবারে অবাক! এই বিস্ময় ও তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের গর্ব্বের আনন্দ লইয়া সেদিন গৃহে ফিরিলাম।

আমাদের বাড়ীতে তখন চারিদিকে কবিতার উচ্ছ্বাস। সেই আবহাওয়ায় নবপ্রভাতের কাকলীর মত আমার হৃদয হইতেও কবিতার অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠিয়াছে; তারই উৎসাহে জীবন তখন চঞ্চল। যিনি লেখার সাধনা করিয়াছেন তিনিই জানেন যে এই প্রথম উচ্ছ্বাস জীবনে কি-প্রকার চঞ্চলতা আনিয়া দেয়;—সে কত আশা, কত উৎসাহ! কিছু হোক আর নাই হোক, সেই আকাশ-কুসুমের স্বপ্নেই সময় কাটিয়া যায়। তখন আমাদের মেজদাদা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের স্বপ্নসঙ্গীত থামিয়া গিয়া উপন্যাস আরম্ভ হইয়াছে। মাননীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রভাত-সঙ্গীত, সন্ধ্যা-সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস আমাদের বাটীতে যেমন বহিয়াছিল এমন বোধ হয় কোথাও নয়। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" কবিতা আমাকে যতবার আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করিতে হইয়াছে, বোধ হয় খুব কম লোকেই তত করিয়াছে। এই সেদিন আমার স্কুলের একটি মেয়েকে একটি কবিতা আবৃত্তি করিতে শিখাইতেছিলাম—"এত বড় এ ধরণী মহাসিন্ধু-ঘেরা দুলিতেছে আকাশ-সাগরে"। আমার এখনো

সমস্ত কবিতাটি কণ্ঠস্থ দেখিয়া মেয়েটি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। তখন প্রভাত-সঙ্গীত, সন্ধ্যা-সঙ্গীত, রাজা ও রাণী এবং কড়ি ও কোমল আমার আগাগোড়া কণ্ঠস্থ ছিল। বাল্যকালে আবৃত্তি করিবার ক্ষমতা ছিল বলিয়া, যখন শৈশবে বেথুন স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়িতাম, (আমার ঐ অবধি স্কুলের বিদ্যা), তখন উপর-ক্লাসের মেয়েরা আমায় কাছে ডাকিয়া কবিতা শুনিতেন। সেই উপলক্ষে শ্রীমতী সরলা দেবীর (তিনি প্রথম শ্রেণীতে পড়িতেন) সহিত পরিচয় হইয়াছিল।

১২৯৬ সালের বৈশাখ-সংখ্যা ভারতী যেদিন আমার হাতে আসিল, সেদিন আমার কি আনন্দ! আমার সেই ছেঁড়া খাতায় লেখা কবিতা ছাপার হরফে বাহির হইয়াছে—এ আনন্দ রাখিবার ঠাঁই নাই। মুন্নিদার সেদিনকার উৎসাহের কথা এখনো মনে হয়; তিনিই জোর করিয়া কবিতাটি ভারতীতে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই আমি লেখিকা বলিয়া পরিচিত হইলাম।

কয়েকদিন পরে হঠাৎ একদিন ষ্টার থিয়েটারে ভারতী-সম্পাদিকার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহাকে প্রথম দিন দেখিয়াই, মনে মনে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তখন আমরা যে-ভাবে থাকিতাম তাহাতে আমাদের নিজ-সমাজভুক্ত কয়েকটি পরিবার ব্যতীত অন্যত্র যাইবার কোনও সুযোগ ছিল না। সেইজন্য তাঁহার সহিত দেখাশুনা হইত না। সহসা সেদিন তাঁহাকে নিকটে পাইয়া আমার ভারি আনন্দ হইল। লৌহ ও চুম্বকের আকর্ষণশক্তি মনুষ্যের মধ্যেও আছে। নতুবা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা কেন এমন প্রবল হয়? সেদিন অভিনয়ের বিশেষ কিছুই দেখা হইল না; নানাপ্রকার গল্পগুজবে সময় কাটিয়া গেল।

একবৎসর পরে আমার আবাল্য বন্ধু শ্রীমতী হেমলতা দেবীর[৭৫] পিত্রালয়ে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে আমরা আবার মিলিত হইয়াছিলাম। তখন তাঁহার স্নেহলতা উপন্যাস ধারাবাহিকরূপে ভারতীতে বাহির হইতেছে।[৭৬] উপন্যাসের শেষটা কি হইবে তার আলোচনা হইল। তিনি বলিলেন—"শেষটা এখন বলিব না; দেখে নিজে বোলো কেমন হয়েছে।" সেদিন সেখানে তিনি নিজের রচিত দুইটি গান গাহিয়াছিলেন। তাঁহার গান যিনিই শুনিয়াছেন তিনিই জানেন তাঁহার গাহিবার ক্ষমতা সামান্য নহে।

ইহার পর আমরা বাঁকিপুরে চলিয়া যাই, সে সময় তাঁহার নিকট হইতে প্রায়ই পত্র পাইতাম। এই পত্র-ব্যবহারে আমাদের সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিল। এই পত্রের ভিতর কত মনের কথা, কত উপদেশ আশ্বাস, কত সান্ত্বনা সমবেদনা, কত সাহিত্য-আলোচনা থাকিত! সব উদ্ধৃত করা সম্ভবও নয় সঙ্গতও নয়, —কাজেই দুই-চারিখানির একটু-আধটু অংশ প্রকাশ করিলাম। একবার তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"আমায় কবিতা লিখতে বলেছ, আমার কি আর সেদিন আছে; এখন

গলাভাঙ্গা—কখনো কখনো কষ্টে এক-আধটা বার হয় বইতো নয়—

আমি নীরব বীণা
অতি দীনা
ভাঙ্গা হৃদয়খানি ;
আমার ছেঁড়া তার,
নাহি আর
মধুর বাণী।
প্রাণের কথা যত
আগে—গেযেছি ত
সকলি,
মনে নাহি যার
এখন—তারে আর
কি বলি ?
গান গাহে যারা
গাক্ তারা
জানাক ব্যথা,
আমার নাহি ভাষা
নাহি আশা
শুধু আকুলতা।
সবাই বোঝে হেথা
বলা কথা
কে বোঝে নীরব প্রাণে
কেহ কি বুঝিবে না, একো জনা ?
কে জানে ?"

"আমরা ইতিমধ্যে পুনা বেড়িয়ে এসেছি। পুনা আমার বড় ভাল লাগে। পুনার বাঁধের বাগানের মত সুন্দর জায়গা খুব কম দেখেছি। বাঁধ ডিঙ্গিয়ে প্রকাণ্ড জলোচ্ছ্বাস কল কল তানে নীচে পড়ছে। শতধারায় তরঙ্গভঙ্গে পাষাণ-বক্ষ দিয়ে এঁকে বেঁকে চলে যাচ্ছে। একপাশে পাহাড় আকাশের গায় উঁচু হয়ে রয়েছে। সম্মুখে বাগান, নানাবৃক্ষ নানারকমে সুশোভিত, মধ্যে ফোয়ারা খেলছে। সুন্দর সুন্দর পার্সি ছেলেমেয়েরা চারিদিকে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। গাছের ভিতর দিয়ে দিয়ে সুনীল আকাশ দেখা

যাচ্ছে—বড়ই সুন্দর। পুনায় আমরা একদিন রমাবাইয়ের সঙ্গে কাটিয়েছি। রমাবাই আমার অনেকদিনের বন্ধু[৭৭]— মানে এবারের শুধু আলাপী নন।"

"তোমার শেষ চিঠি পেয়ে যে কি কষ্ট হল, বলতে পারিনে। আহা, তোমার কোলের ছেলে তোমার কাছ থেকে চলে গেল। তোমার সেই বুকফাটা কষ্ট আমি বেশ বুঝতে পারছি। আমারো একটি ৬ বছরের মেয়ে মারা গিয়েছিল, সে আজ ১২ বছর, তবু যখন মনে পড়ে কি ভয়ানক কষ্ট হয়। তোমার এই প্রথম সন্তান, আর এমন সুস্থ, কখনো ওরূপ মনেও হয়নি, হঠাৎ কি হোল ? যাহোক সবি তাঁরি হাত, জীবন মৃত্যু আমরা কি কাউকে দিতে পারি ? আমাদের কেবল মনের ভ্রান্তি। ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে নিয়েছেন তিনি তোমায় সান্ত্বনা দিন, এই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি।"

কয়েকবৎসর পরে আমি কলিকাতায় যাই। সে সময় ভারতী-সম্পাদিকা কাশিয়াবাগানের বাগান-বাটীতে থাকিতেন। তিনি সংবাদ পাইয়া আমায় লইয়া যাইবার জন্য গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আমি সেবার প্রায় মাসখানেক কলিকাতায় ছিলাম। সপ্তাহে দুই-তিন বার তাঁহার সহিত দেখা হইত। দুপুরে গিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাঁহার কাছে থাকিতাম, অনেক উপদ্রব করিতাম, বড়বোনের মত তিনি আমার সব উপদ্রবই সহ্য করিতেন। তাঁর সেই ছাদটিতে বিকালে বসিয়া কত গল্প করিতাম, কত আবলতাবল বকিতাম। তারপর আমার 'হাসি ও অশ্রু'[৭৮] বই বাহির করিবার সময় তিনি আমায় সকল রকমে সাহায্য করিয়াছেন। আমি মোটেই প্রুফ দেখিতে জানিতাম না, তিনি নিজেই সব করিয়াছেন।

আবার আমাদের ছাড়াছাড়ি। কলিকাতায় গেলে কালেভদ্রে কখনো দেখা হয়। নইলে চিঠিতে আলাপ চলে। এই সময় তিনি দার্জ্জিলিং থেকে একবার লিখিয়াছিলেন—"আজ সকাল থেকে ঝমাঝম বৃষ্টি হচ্ছে, এ সময় একেলা কি-রকম লাগে। তুমি যদি এখানে থাকতে ত না জানি তোমার কিরূপ ভাব হত। ভাবতে ভাবতে একটা গান লিখলুম, দেখো-দেখি মনের মত হয়েছে কিনা—

এমন বারি ঝরে এমন থরে থরে
আকাশ ঘনঘোরে ছেয়েছে,
এমন বরষায়, সে মোর আজি হায়
কোথায় কোন্ দূরে রয়েছে।
নিঝর সচকিত মিলন জাগরিত
চমকি উথলিত পুলকে,
চাতক তৃষা ভরি অমিয়া পান করি

ভ্রমিছে ঘুরি ঘুরি দ্যুলোকে।
বনানী নুয়ে নুয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে
গাহিছে প্রাণ খুলে প্রেমগান,
ফুলের ॰ পরাশি উঠে হাসি
শুভ্র হিম-নীরে করি স্নান।
এ হেন বরষায় কাহার ভরসায়
দিবস যাপি,
কাহার কথা শুনে, কাহার প্রেমাগুনে
হৃদয় তাপি।
কাহার আঁখি-তারা মাতোয়ারা
করে এ প্রাণ মোর।
কাহার সুধা চুমে এক ঘুমে
জীবন করি ভোর।
কাহার প্রাণে গিয়ে লুকাইয়ে
জুড়াই সব ব্যথা,
এমন ঘন ঘটা এমন বারি-ছটা
ওগো সকলি বৃথা।"

এই রকম করিয়া চিঠিতে তিনি কত যে কবিতা, গান আমাকে পাঠাইতেন—আর আমার আনন্দ ধরিত না।

তাঁর পারিবারিক জীবনের সহিত আমি বিশেষভাবে পরিচিত। যখনই দেখিয়াছি, তাঁহাকে সর্ব্বসুখে-সুখী বলিয়াই মনে হইয়াছে। কোনও রমণীই স্বামীর ভালবাসা ভিন্ন এমন সুখী হইতে পারেন না। তাঁর প্রতি তাঁর স্বামীর ব্যবহার দেখিবার জিনিস ছিল বটে;—মনে হইত যেন পূজা করিতেছেন। একবার ভারতী-সম্পাদিকার অসুখের সময় গিয়াছিলাম, সেই সময় তাঁর স্বামীর সেবা বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যে স্বামী তাঁর জীবনের সকল উন্নতির মূল, যাঁর চেষ্টায় যত্নে তিনি বিদ্যাশিক্ষা লাভ করিয়া জীবনে এমন যশস্বিনী হইয়াছেন, সেই স্বামী হারাইয়া তাঁহার জীবন যে শূন্য হইয়া গিয়াছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। স্বামী-বিয়োগের পর তিনি আমায় লিখিয়াছিলেন :—

"তোমার চিঠিখানি পড়ে চোখের জল আর থামতে চায় না। কতদিন ধরে মনে করছি উত্তর দেব, পারিনি। সত্যি এমন স্বামী পাওয়া বহু পুণ্যের ফল; চিরদিন আমার সুখ কিসে হবে তাই দেখেছেন, মৃত্যুর সময়ও আমার কথা ভাবতে ভাবতেই গেছেন, ছেলে-মেয়ে আর কাউকে চাননি। এমন স্বামীকে কি-করে ভুলবো। তবুও

ত তাঁকে ছেড়ে বেঁচে আছি—আশ্চর্য্য বলেই মনে হয়!"

স্বামী-বিয়োগের পর তিনি যথার্থই পৃথিবীর সব কাজ থেকে বিদায় লইয়া একেবারে একাকিনী শূন্য-হৃদয়ে সেই অনন্তের পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন, তাঁর মুখের ভাব দেখিলে যেন তাই মনে হয়।

তাঁহার মস্ত গুণপণা—তাঁহার কন্যাদের জীবন এমন উজ্জ্বল করিয়া তোলা। তাঁহারই চেষ্টার ফলে আজ শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী স্ত্রী-জাতির উন্নতিকল্পে কত পরিশ্রম ও কত চেষ্টা করিতেছেন। শ্রীমতী সরলা দেবীর ভারত-স্ত্রী-মহামণ্ডল অন্তঃপুরে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করিয়া বঙ্গনারীকে কত উপকৃত করিতেছে, তাহা ক্রমশঃই সকলে বুঝিবেন। শ্রীমতী সরলা দেবী যে এই কার্য্যে অমূল্য সহায়রূপে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাসকে পাইয়াছেন তাহাও বঙ্গনারীর সৌভাগ্যের বিষয়। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর 'বিধবাশ্রম' তাঁহারই অশ্রান্ত পরিশ্রমের ফল। এই সকলের মূলমন্ত্র তাঁহারা ভারতী-সম্পাদিকার নিকটই পাইয়াছেন। ভারতী-সম্পাদিকা শুধু লেখার আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন নাই। তিনি মহিলাদিগের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সখি-সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া সকলকার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ আলাপ-পরিচযের পথ খুলিয়া দিয়াছেন।

যখন ভাবতী-সম্পাদিকা প্রথম গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, তখন বঙ্গদেশে এত স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ছিল না বা স্ত্রী-জাতির শিক্ষার এখনকার মত এমন উপায়ও ছিল না। তখন ত দূরের কথা,—আমাদেরই সময়ে ছিল না,— আমাদের জীবনেই তাহা দেখিয়াছি। আমাদের পরিবারের মধ্যে যখন প্রথম আমি ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করি তখন তাহাতে কত বাধা-বিঘ্ন পাইতে হইয়াছিল। ইংরাজী পড়িলেই খৃষ্টান বা মেম হইবার আতঙ্ক। আমার ঠাকুমা যে এ বিষয়ে কিরূপ প্রতিবন্ধক হইতেন এখনো তাহা বেশ মনে পড়ে। এখনো অধিকাংশ হিন্দু-পরিবারের মধ্যে দ্বাদশ বর্ষের মধ্যেই সব বিদ্যা শেষ হইয়া যায়। অথচ আমি দেখিতেছি, বঙ্গদেশের বালিকাদিগের জ্ঞানের পিপাসা এত অধিক, তাহারা এত বিদ্যানুরাগিনী যে বলা যায় না; শুধু উপায় নাই বলিয়াই কেহ শিখিবার সুযোগ পায় না। যে দেশের স্ত্রী-শিক্ষার এই অবস্থা এবং যে অবস্থা পূর্ব্বে আরো ভয়ঙ্কর ছিল, সেই দেশে সেই কালে স্বর্ণকুমারীর মত বিদুষী গড়িয়া-ওঠা বড় সোজা কথা নহে। এত লেখাপড়া জানিয়া, এত সুশিক্ষিতা ও অমন উচ্চবংশের কন্যা হইয়াও (পৃথিবীতে লোকে যাহা কিছু চায়,—বংশ রূপ গুণ কিছুরই অভাব তাঁর নাই) তাঁর স্বভাব কখনো গর্ব্বিত দেখি নাই, এইটেই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে। তিনি যখনি আমাদের বাটীতে আসিতেন, হিন্দু-বাড়ীর মেয়েরা সকলেই তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিত, তিনি সকলকার সহিত সমভাবে কথা কহিয়াছেন, যখনি কেহ গান গাহিতে অনুরোধ করিয়াছে, গান গাহিয়াছেন। আমার

সকল আত্মীয়েরাই তাঁহার মিষ্ট ব্যবহারে মোহিত হইয়াছেন, সকলেই বলিযাছেন এমন মেজাজ কখনো দেখি নাই। অমন করিয়া সকল পরিবারে না মিশিলে তিনি এমন অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিতেন না। সকল অবস্থার পরিবারের সঙ্গে এমন প্রাণ দিয়া মিলিতে-মিশিতে পারিতেন বলিয়াই তাঁর অঙ্কিত উপন্যাস-চিত্র এত জীবন্ত।

আমার লেখা যাহাতে ভাল হইয়া ওঠে তার জন্য তাঁহার কি আগ্রহ! তিনি আমায় সেই ছেলেবেলা হইতে কত উপদেশ, কত পরামর্শই না দিয়া আসিয়াছেন। কোথাও আমার প্রশংসা হইলে তাঁহার আনন্দ ধরে না। তাঁহার এ স্নেহ ভুলিবার নহে। কেবল আমারই প্রতি যে তাঁহার অনুগ্রহ তাহা নহে ; আমাদের দেশের মেয়েরা সাহিত্য-জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করুক, ইহা তাঁহার অন্তরের কামনা।

এই কয়েক মাস আগে একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। আর সে মূর্ত্তি নাই, সে শ্রী নাই, শোকে-দুঃখে তাঁর মুখে কি-এক বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে। ভাল অবস্থায সুখের সময়ও কখনো তাঁকে চঞ্চল দেখি নাই, কখনো বেশী কথা কহিতে দেখি নাই, আমি আপনার মনে বকিয়া গিয়াছি আর তাঁর সেই এক উত্তর : "তার পর!" এখনো তাঁর সামনে গেলে আমি যেন ছেলেমানুষের মত হইয়া যাই ;— কোথা হইতে সেই ছেলেবেলার চঞ্চলতা আসিয়া পড়ে।

এখন আর পূর্ব্বের মত চিঠি-পত্র দিতে পারি না, তবু তিনি যে আমার চির-শুভাকাঙ্ক্ষিনী তা বেশ বুঝিতে পারি। সেদিনও তাঁর চিঠিতে লিখিয়াছেন—

"অনেক দিন পরে তোমার চিঠি পেলুম বটে। যৌবনের সে উচ্ছ্বাস আমাদের চলে গেছে। বিরহ মিলনের সে হাসি কান্না মানাভিমান-স্রোত বন্ধ, কিন্তু তবুও বন্ধুত্ব কি আমাদের প্রাণ থেকে সরে পড়েছে? না, ভালবাসা এখন স্তব্ধ ভাব ধারণ করেছে। এ বয়সের ভালবাসার বোধ হয় ধর্ম্মই এই।"

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

কৃষ্ণভাবিনী দাস
সরোজকুমারী দেবী

১৯০৪ সালে কৃষ্ণভাবিনীর সহিত আমার প্রথম দেখা হয়। সে সময় আমি দার্জ্জিলিং-এ ছিলাম। Mall-এর বাগানের কাছেই আমার বাড়ী ছিল। প্রায় প্রত্যহ Mall-এ য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা একটী বঙ্গমহিলাকে দেখিতে পাইতাম। একটু আশ্চর্য্য হইয়া চাহিতাম, কারণ ইংরাজী পরিচ্ছদে সজ্জিতা হইলেও তাঁর মুখের ভাব কি নম্রতায় পূর্ণ ছিল! অমন নম্র মুখের ভাব সচরাচর চোখে পড়ে না। দুজনেই দুজনকে দেখিতাম, চাহিয়াও থাকিতাম, কিন্তু কখনো কথা কহিতে পারি নাই। একদিন Mall-এর বাগানের কাছ দিয়া একটি Funeral যাইতেছিল, Boscolo হোটেলে এক মেমের একটি শিশু সন্তান মারা যায়, শুনিয়াছিলাম। সেই সময় আমি ও কৃষ্ণভাবিনী পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিলাম। তার পর যে যার গন্তব্য পথে যাই। পুনরায় যখন সেই শোকার্ত্তা জননী গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন Mall-এর একটী দোকানের কাছে আমাদের দেখা হয়। ঘটনাক্রমে আমরা উভয়েই বেড়াইয়া সেই স্থানে আসিতেছিলাম। উভয়েই সেই শোকার্ত্তা জননীর সহিত কথা কহিতে অগ্রসর হই। সেই শোকের অশ্রুর সঙ্গে আমার কৃষ্ণভাবিনীর সহিত প্রথম পরিচয় হয়। তার পর প্রায় প্রত্যহ নিয়মিত Mall-এর বাগানে আমাদের দেখা হইত। সেই আমাদের আলাপ-পরিচয়ের সূত্রপাত; কিন্তু তখনো তাঁর মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পাই নাই। দার্জ্জিলিং হইতে আসার পর তাঁহার কথা বেশী মনেও হয় নাই। তবে মাসিক পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে তাঁহার লেখা দেখিতাম। তার কয়েক বৎসর পরে আমি বোলপুরে যাই।

একমাস বোলপুর ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের মধ্যেই বাস করি। সেখানে একদিন শুনিলাম যে দু-হপ্তার মধ্যে কৃষ্ণভাবিনী দাসের স্বামী ও কন্যা পরলোক গমন করিয়াছেন। শুনিয়া মন ব্যথিত হইয়াছিল। তার কয়েক বৎসর বাদে শ্রীমতী সরলা দেবী ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের কার্য্য আরম্ভ করেন, ও কৃষ্ণভাবিনী দাসকে তাঁর সহকারিনী করেন। ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল আরম্ভের পর ১৯১৪ সালে, কলিকাতায় আমার সহিত পুনরায় কৃষ্ণভাবিনীর সাক্ষাৎ। যদি পূর্ব্বে পত্রে জানা না থাকিত যে তিনি সেইদিন সেই সময় দেখা করিতে আসিবেন, তাহা হইলে আমি কোনমতেই তাঁহাকে চিনিতে

পারিতাম না। কোথায় সেই ইংরাজী পরিচ্ছদে সুসজ্জিতা মহিলা, আর এ একেবারে হিন্দু ঘরের বিধবার মত আসিয়া উপস্থিত! এখনো যেন চোখের সামনে তাঁহাকে দেখিতেছি। সেই দিন হইতে তাঁহার সহিত আমার যথার্থ পরিচয় হইল। তার পর তাঁর জীবনের সকল ঘটনার কথাই তিনি আমার সহিত আলোচনা করিয়াছেন। সেই সময় হইতে মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হইত। যখনি কলিকাতায় গিয়াছি, ছুটিয়া আসিয়াছেন। ক্রমে কি গভীর ভালবাসাই জন্মিয়াছিল! তিনি আমায় অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছিলেন, আমাকে দেখিলেই তাঁর মৃতা কন্যাকে মনে পড়ে। হয় ত সেই কারণে অত গভীর স্নেহ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, জীবনে কখনো তাঁর সঙ্গ বেশী ভোগ করিতে পারি নাই।

একবার সেই ১৯১৪ সালে জুলাই মাসে তাঁর সঙ্গে দুই দিনের জন্য বোলপুর গিয়াছিলাম। পথে কি যত্ন! সেদিন যাত্রার পথে ট্রেণে উভয়ের জীবনের ঘটনা উভয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলাম। " আপনার জীবন-কাহিনী আপনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখুন।" প্রথমে তিনি অস্বীকার করেন। পরে আমায় বলিয়াছিলেন যে, লিখিতেছি। একবার আমায় তাহা দেখাইয়াও ছিলেন।

আমরা সন্ধ্যার সময় বোলপুরে উপস্থিত হইলাম। যে দুই রাত্রি বোলপুরে ছিলাম, আমি শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর গৃহেই শয়ন করিয়াছিলাম। রাত্রে দুইজনে কত গল্প করিতাম! সেই দুই রাত্রে তিনি তাঁহার জীবনের সকল ঘটনা আমার নিকট মন খুলিয়া বলিয়াছিলেন।

আমি পৃথিবীতে অনেক বিদুষী মহিলা দেখিয়াছি, অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে, কিন্তু কৃষ্ণভাবিনীর মত স্বর্গীয় পবিত্র সরল মন অতি অল্প মহিলারই আমি দেখিয়াছি। পৃথিবীতে কোন মহিলাকে আমি এমন শ্রদ্ধা করিতে পারি নাই। তিনি পূজার যোগ্যই ছিলেন। নিজে তিনি নিজের কোনও গুণই জানিতেন না, বা সে বিষয়ে তাঁর কোনও আকর্ষণ ছিল না! বড় হইবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। মাটিতে মিশিয়া মাটি হইয়া তিনি কাজ করিতেন। তাঁহার সেই শুভ্র বিধবার বেশ মনে কেমন একটা শ্রদ্ধা-ভক্তি জাগাইয়া দিত। সেই সুন্দর মুখে সর্ব্বদা কেমন এক পবিত্র আলো জাগিয়া থাকিত। সেই জ্যোতিপূর্ণ চক্ষে কি নম্রতার ভাব ছিল, অত বয়স হইয়াছিল, কিন্তু একটু কোন প্রশংসার কথা বলিতে গেলেই লজ্জায় মুখ রাঙা হইয়া উঠিত। সকল সময়েই যেন সকলকে সঙ্কোচ! কতবার তাঁহাকে মর্ম্ম-বেদনায় নীরবে চোখের জল ফেলিতে দেখিয়াছি। কত অন্যায়ভাবে লোকে তাঁকে কত কথা শুনাইয়াছে। কখনো একটা কথার উত্তর দিতে দেখি নাই। আমি তাঁকে কতবার এজন্য কত কথা বলিয়াছি, এমন কি ধমকাইয়াছি, "কেন আপনি এত সহ্য করেন?" ভারত

স্ত্রী-মহামণ্ডলের মিটিং-এ মাঝে মাঝে তাঁকে কত কথাই শুনিতে হইত। তিনি কতবার চোখের জল মুছিতে মুছিতে বাড়ী ফিরিয়াছেন, তবু কখনো তাঁব দোষ নাই, এ সরল সত্য কথাটুকু বলিয়াও প্রতিবাদ করেন নাই। নীরবে কত কাজই করিয়াছেন, সে কাজের কি হিসাব আছে! তিনি নিগৃহীতা মেয়েদের উদ্ধার করিতে এমন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে, সেজন্য তাঁহাকে পুলিস কোর্টেও যাইতে হইয়াছে। আমি কতবার মানা করিয়াছি, কিন্তু তাঁর একাগ্রতা দেখিলে বাধা দেওয়া কঠিন হইত। সেই সব মেয়েদের লইয়া ভবানীপুরে যে বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে দু'বার সেখানেও গিয়াছিলাম। কোথায় অনাথ আশ্রম, কোথায় নিবেদিতার স্কুল, কোথায় কার বাড়ী, সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছি। তাঁর সঙ্গে ঘুরিতে কি ভালই লাগিত! মনে হইত, কত শিখিবার আছে। অনেক সৌভাগ্যে তাঁর মত বন্ধু লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু বেশী দিন তাঁর সঙ্গ পাই নাই।

তাঁর 'জীবনের দৃশ্যমালা'[৭৯] যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি জানিবেন, সেই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাঁর জীবনী কিরূপ সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হইয়াছে। তিনি শৈশবেই বিবাহিতা হন, ও সেই সময় হইতে স্বামীর প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় প্রণয়ে তাঁর হৃদয় বিকশিত হয়। উপযুক্ত স্বামীর হাতে পড়িলে স্ত্রীর জীবনের কিরূপ বিকাশ হয়, তাহা আমার বিশেষভাবে জানা আছে বলিয়াই শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীব হৃদয়ের সহিত আমার যেমন গভীরভাবে পরিচয় হইয়াছিল, তেমন খুব কম লোকেরই হইতে পারে।

শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীর জন্ম অনুমান ১৮৬৪ সালে। তিনি বহরমপুরের অন্তর্গত 'কাজলা' গ্রামে কোনও জমীদারের গৃহে জন্মিয়াছিলেন। দশ বৎসর বয়সে কলিকাতার বৌবাজার-নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাসের পুত্র স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ দাসের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার বিবাহের দুই বৎসর বাদে দেবেন্দ্রনাথ বিলাত গমন করেন। তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার একমাত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করে। ছয় বৎসর বাদে তাঁহার স্বামী যখন বিলাত হইতে প্রত্যাগত হন, তখন তাঁহার শ্বশুর-মহাশয়, তাঁহার জননী সকলেই সেই ইংলণ্ড-প্রত্যাগতকে সমাজে লইতে চাহিলেন না, এবং কৃষ্ণভাবিনীকে স্বামী ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন; বলিলেন, তবুও তিনি যদি স্বামীর সহিত যান, তাহা হইলে সমাজের বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে। তখন তাঁহার শিশু কন্যার বয়স পাঁচ বৎসরের একটু উপর হইয়াছিল। সমাজের ও নিষ্ঠুর আত্মীয়দিগের কঠিন শাসনে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সীতার ন্যায় স্বামীর অনুগামিনী হইলেন।

যখন তিনি স্বামীর সহিত গমন করিলেন, তখন শিশু কন্যাকে শ্বশুর মহাশয়ের নিকট রাখিয়া গেলেন। কারণ তিনি স্বামীর সহিত ইংলণ্ডে যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

অর্থাভাবে কন্যাকে সঙ্গে লইতে পারিলেন না। যখন পুনরায় দুই মাস পরে তাঁহার স্বামী ইংলণ্ডে যাইবার সময় তাঁহাকে লইয়া যাইতে মনস্থ করিলেন, তখন মায়ের নিষেধ, শ্বশুর-মহাশয়ের আদেশ, কন্যার স্নেহ কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি এ সকল ত্যাগ করিয়া গেলেন! কিন্তু তাঁহার প্রাণ কাঁদিতে লাগিল। তখন ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বাঙ্গালীদের সমাজে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। কাজেই ইংলণ্ড-প্রত্যাগত পুত্রকে পিতা পরিত্যাগ করিলেন ; অর্থসাহায্যেও বঞ্চিত করিলেন। সেজন্য কৃষ্ণভাবিনী শিশু কন্যার মঙ্গলের জন্য তাহাকে শ্বশুর মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া গেলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সেই কন্যার স্নেহ বন্ধনে উভয় পক্ষের মঙ্গলই হইবে। তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ও কন্যাটিকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। যখন পতিপ্রাণা সতী স্বামীর সহিত চলিলেন, তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া বলিল, (*জীবনের দৃশ্যমালা*)

যাই যদি সব ত্যজি স্বামীর সদনে,
তাহলে ছাড়িতে হবে আত্মীয়-স্বজনে।
হায়রে নিষ্ঠুর নর এমন আচারে
কেমনে সৃজিলি তুই ভারত-মাঝারে ;
আজ যে প্রভাবে তোর ভাঙ্গিছে আমার প্রাণ
কবে তোর তেজ হবে এ দেশেতে অবসান ?

তাঁহার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, এখন আর সমাজের সে কঠিন শাসন নাই! এখন ইংলণ্ড-প্রত্যাগত বাঙ্গালীকে সমাজ সকল শ্রেণীতেই স্থান দিতেছে। অর্থের দ্বারা এখন সকলই সম্ভব হইয়াছে।

বিদায়-গ্রহণের সময় তিনি কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া দেখেন, তাঁর জননীকে ভাই-বোনে সান্ত্বনা দিতেছে। কন্যাকে আদর করিয়া অন্যে কোলে লইতেছে। দূরে স্বামী দাঁড়াইয়া আছেন, দেখিতেছেন, স্ত্রী কি করেন! কৃষ্ণভাবিনীর হৃদয় ফাটিয়া গেল, তবু কর্ত্তব্যে অটল হইয়া বলিলেন, (*জীবনের দৃশ্যমালা*)

দাঁড়াও ক্ষণেক নাথ,
করি শেষ প্রণিপাত,
মাতার চরণে মম, কন্যারে চুম্বন,
বেঁধেছি হৃদয় দেখ, কেটেছি বন্ধন।
ফিরিব তোমার সনে।

যথা যাবে মাঠে বনে,
স্বজন সমাজ তোমা ত্যজিল বলিয়া
ভেবো না ভার্য্যার প্রেম এ জগতে মায়া।

তারপর সেই স্বদেশ ছাড়িয়া বাঙ্গালীর কুলবধূ, ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ নারী বিদেশে স্বামীর সহিত যাইবার পথে সমুদ্র দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কার্য্যের বাসনায় মন পূর্ণ হইল। সেই স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা দেখিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইল।

ইংলণ্ডে গিয়াও তিনি নিজের সাধ্যমত স্বামীর সকল বাসনা পূর্ণ করিতে যত্নবতী ছিলেন। তাঁহার চাল-চলন, রীতি-নীতি, মনের আদর্শ, ভাব, পুরাকালের সাধ্বী সতী নারীর মতই ছিল। তাঁর জীবনের কামনাও ছিল তাই।

সে সাধ তাঁর পূর্ণ হইয়াছে। সাধ্বী কৃষ্ণভাবিনী স্বামীর জন্য জগতেব সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া সুদীর্ঘ আট বৎসর কাল ইংলণ্ডে যখন ছিলেন, তখন অশেষ পরীক্ষার মধ্য দিয়াই তাঁহার সময় গিয়াছে। একে অনভিজ্ঞা বঙ্গরমণী, তাঁর পক্ষে বিদেশীয় আচার, ব্যবহার, ভাষা, রীতি, নীতি, শিক্ষা কতদূর কঠিন হইয়াছিল, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেই সময় আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদে, কন্যার বিরহে তিনি বলিযাছেন :—

কেন না করিলে পিতঃ পাষাণ হৃদয়
অবস্থা যেমন,
কেন এ মায়ের হৃদে করিয়াছ দান
স্নেহ প্রস্রবণ ?

বিলাতের শত চাকচিক্যময় বাহিরের দৃশ্যে কিন্তু তাঁর মন ভোলে নাই। বঙ্গের জন্য তাঁর প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে; তিনি তাই নিজের ভাষায় বলিয়াছেন :

কে বলে বিলাতে এসে মন ভুলে যায় ?
বঙ্গ প্রাণ মুগ্ধ হয় মোহিনী মায়ায় !
মন যদি ভুলে যায়,
তবে কেন এ হৃদয়
হয়েছে ব্যাকুল মা তোমার তরে
দেখিতে সে জন্মভূমি বহুদিন পরে।

তবু তিনি নীরবে সকলি সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু সহসা তিনি সংবাদ পাইলেন, তাঁহার নবম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। তাঁর শ্বশুর মহাশয় নবম বর্ষে গৌরীদানের

ফল লাভ করিয়া এক ধনী-গৃহে কন্যাকে সমর্পণ করিলেন। পাত্র সুরূপ, কিন্তু সুপাত্র নহেন। সেই সংবাদ বজ্রাঘাতের মত তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। সে দুঃখ জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁর যায় নাই, সে কথা একদিনও তিনি ভুলিতে পারেন নাই। তিনি ক্রমাগত বলিতেন, কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য তিনি পালন করেন নাই বলিয়াই জীবনে এত পরীক্ষা এত কষ্ট সহিয়াছেন। সেই সংবাদ পাইয়া লেখেন—

সহসা বিদেশে আজ কি শুনিনু হায়
ভাবিতে যে সংবাদ প্রাণ ফেটে যায়।
সংসার-তুফান হতে বাঁচাবার আশে,
রেখেছিনু কন্যা মোর পিতার সকাশে।
হায সে প্রাচীন পিতা, অবহেলি ভাল কথা,
ভাসাছেন সে তনয়া অপাত্র-সাগরে,—
এ হেন বারতা কি গো সত্য হতে পারে?

এই কবিতাতেই তিনি লিখিয়াছেন, যদি আগে জানিতেন তাহা হইলে মেয়েকে জলে ভাসাইযা দিতেন, এ কষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিতেন। মেয়ের প্রাণের ব্যথায় তাঁর মর্ম্মস্থল পুড়িয়া গিযাছিল, তাই তিনি অমন করিয়া অন্তঃপুর-শিক্ষার কাজ করিতে পারিয়াছিলেন। সে কাজে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন, পরের মেয়েদের যাতনায় তাঁর প্রাণ যে কি অধীর হইত, আমি তা দেখিয়াছি, আমি তা জানি, তাই আজ তাঁর কথা এমন করিয়া লিখিতে পারিলাম। তিনি সকল বেদনাই নীরবে সহ্য করিতেন। সমুদ্রের গভীর জলের মত তাঁর মন স্থির ছিল, তাঁর গভীর বেদনা ভাষায় ফুটিত না। এই সহিষ্ণুতা-গুণ তাঁর জীবনে কি বেশীই ছিল!

ইংলণ্ডে অবস্থান-কালে তাঁহার জীবনের উপর দিয়া অনেক পরীক্ষাই গিয়াছে। অবশেষে সেই বিদেশে স্বামীর কঠিন পীড়ার সময় তিনি কাতর হইয়া বলিলেন,

নাহি পিতা লোক-বল নাহি বেশী অর্থ-সম্বল
একা আমি সাহস বা কত?
কর পিতা দয়াদান, বাঁচাব তাঁহার প্রাণ
চলে যাই স্বদেশে আবার।

ঈশ্বর তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন। ১৮৮২ সালে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন; ১৮৯০ সালে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

সেখানকার শিল্প, স্বাধীন তনয় ও তনয়া সব দেখিয়া তৃপ্তি পাইলেও তাঁর মনের অভাব ঘোচে নাই!

স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া তিনি স্বদেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। স্বদেশের দুঃখ দেখিয়া তাঁর প্রাণ বিগলিত হইয়াছিল, তিনি তাই বলিয়াছেন,

যদি প্রাণ দিয়া ওই দুঃখরাশি,
এক বিন্দু মাগো ঘুচাতে পারি।
করিব তা আমি সুখে-দুঃখে ভাসি
ব্যঙ্গ-উপহাসে ভয় না করি।

দেশে আসিয়া যদিও দূরে থাকিতেন, তবু জননীর স্নেহ ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু কন্যার সঙ্গে আর সম্বন্ধ রহিল না। কন্যাকে তাঁহার নিকট কেহ পাঠাইল না। দূর হইতে একবার দেখিতে চাহিলেও, কন্যার শ্বশুর বা জামাতা কেহ তাহাকে দেখিতে দিল না।

এই অপমানে তাঁর জীবন জ্বলিয়া গিয়াছিল। শুধু কি তাঁরই এই যাতনা! কত ঘরে এই প্রকারে নিষ্ঠুরতার দাহনে কত শত মায়ের প্রাণ জ্বলিয়া যাইতেছে, তার ঠিকানা কোথায়? ধরিয়া বাঁধিয়া নিষ্ঠুর দেশাচারের নামে জাতি বাঁচাইবার জন্য বিবাহ দিয়া কত স্থানে কত কুফল ফলিতেছে, তাহার হিসাব কোথায়?

তিনি স্বামীর প্রণয়ে স্বর্গ-সুখে সুখী হইলেও, আর পুত্র-কন্যা না হওয়ায় মনের দুঃখে ছিলেন। সকল সময়েই তাঁহার মনে হইত যে, তিনি কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেন নাই, অন্য সন্তান হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাই লিখিয়াছেন—

আমি ত স্নেহের ভরে পরশিতে বুকে ধরে
শীতল করিতে চাই হৃদয় আমার।
জীবন ঘটনা বলে, তাহাতেও বাধা পড়ে
শোভিবে না কভু এ শূন্য সংসার?
সংসারের অভিজ্ঞতা বুঝিবার আগে পিতা
রাখিয়াছিলাম দূরে সন্তান আমার,
সে পাপের প্রতিফল এই কি উচিত ফল
দিতেছ জীবনে মম করুণা-আধার!

সেই একমাত্র কন্যা যদি সুখী হইত তাহা হইলে মাতৃবক্ষে এরূপ শেল বিঁধিত না। কন্যা জন্মদুঃখিনী হইল। ঐশ্বর্য্যশালীর পুত্রবধূ হইয়াও কন্যা চিরদিন স্বামীর প্রণয়ে বঞ্চিতা ছিল। কন্যাও চিরকাল পিতার ভালবাসা কিরূপ জানিত না। যখন মিঃ দাস বিলাতে ছিলেন তখন কন্যার জন্ম হয় কন্যার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে তিনি দেশে প্রত্যাগত হন। তাহার পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে, পিতা মাতা দুজনেই ইংলণ্ডে

ফিরিয়া গেল। যখন ফিরিয়া আসেন, সে তখন বিবাহিতা, মাতা গিয়াও দর্শন পান নাই।

তারপর তিনি ও মিঃ দাস যখন সেণ্টুরী কলেজ স্থাপন করেন, তখন সেই ছেলেদের দেখিয়া তাঁহার মনে হইত যে কি পাপে তাঁর এই দশা হইল, তাঁর গৃহ কলরব-শূন্য হইল! শিশুহীন ঘরের শূন্যতায় প্রাণে ওই কথাই জাগিয়া উঠিত। শিশুহীন গৃহ বড় নিরানন্দময়, বড় জীবনশূন্য মনে হয়।

তার পরে তিনি অনেকগুলি শোকের আঘাতে কাতর হইয়াছেন। মাতৃশোক, ভ্রাতৃশোক, আর নানা আত্মীয়-বিয়োগে হৃদয়ে অনেক আঘাত পাইয়াছেন; স্বামীর মুখ চাহিয়া কিন্তু সব সহিয়াছিলেন।

স্বামীর অসুখের সময় তাঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছে। সকল কাজ নিজের হাতে করিয়া পথ্য রাঁধিয়া যে প্রকারে পারিয়াছেন, নিজে সব করিয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই স্বামীকে বাঁচাইতে পারিলেন না। তাঁর মত সতী সাধ্বীর এই যে যন্ত্রণা, ইহা বড়ই হৃদয়ভেদী! স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সকল সুখ-সাধ তিনি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। স্বামী-কন্যাকে একসঙ্গে হারাইয়া কি যন্ত্রণাই পাইয়াছেন! তিনি বলিয়াছিলেন, একবারও ভাবি নাই যে আবার উঠিতে পারিব। কন্যা শ্বশুরালয়ে নানা প্রকারে নিগৃহীতা হইয়া তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন, আসিয়াও তিনি জুড়াইতে পারিলেন না। মরণ আসিয়া তাঁহার সকল দুঃখ দূর করিয়া সেই অমৃতধামে লইয়া গেল। স্বামীর উদ্দেশে লিখিয়াছিলেন—

জীবনের সর্ব্বসুখ সংসারের সার
দিবা-রাত্রি পূর্ণরূপে হৃদয়ে আমার
রয়েছ জীবিত তুমি—আগেতে যেমন
পূজেছি তোমায় নাথ! ভরিয়া জীবন
তোমারি স্মৃতির ধ্যান করিব এখন।

বিধবা হইয়া তিনি সকল প্রকার আরাম ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার শয়ন-কক্ষে তাঁর খাটে কখনো শয়ন করেন নাই, ভূমিতলে শয্যা পাতিয়া শুইতেন। কখনো ভাল দ্রব্য বা ভাল ফল ও মিষ্টান্ন খান নাই; সব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে কতবার বলিয়াছি, এরূপে শরীর থাকিবে কেন? মৃত্যুর বৎসর দুই পূর্ব্ব হইতে তাঁহার মাথা ঘুরিত, কতবার একটু মাখন মিছরী, একটু ডাবের জল খাইতে বলিয়াছি, তিনি হাসিতেন।

ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের জন্য তিনি কি অশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, কত দীন-দুঃখী বিধবার অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সকল বাটীতেই তাঁর অবারিত দ্বার। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের জন্য যখন শ্রীমতী সরলা দেবী 'সাত ভাই চম্পা'র অভিনয় করান, তখন তাঁহাকে সেজন্য কি রকম খাটিতেই

হইয়াছিল। অথচ কখনো কোথাও বাহবা লইবার জন্য তাঁহাকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখি নাই, সকলের পিছনে লুকাইয়া কাজ করিয়া যাইতেছেন। যেখানে একটু কঠিন হইতে হইবে, সেখানেই আমার নিকট আসিয়া বলিতেন, 'আমার সঙ্গে চলুন।' চারিদিকে কাজ করিয়া ক্লান্ত হইয়া মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিতেন, এক পেয়ালা চা আমি প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম, কি তৃপ্তি কি আনন্দেই তাহা পান করিতেন। বলিতেন, সব ছাড়িয়াছি, এইটি পারি নাই।

আমার সহিত শেষ-দেখা তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে। জুলাই মাসে আমি পৃষ্ঠে Curbuncle লইয়া ডাঃ মিত্রের বাড়ীতে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে শয্যাগত ছিলাম, সেই সময় দুইদিন আমায় দেখিতে আসিয়াছিলেন। তখন কি জানিতাম যে সেই শেষ দেখা! তাঁহার মৃত্যু হয় ১৯১৯ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে।

তিনি এত লেখাপড়া জানিতেন, কেহ তাহা বুঝিতেও পারিত না। আট বৎসর একাদিক্রমে বিলাতে ছিলেন, তবু তাঁর কোন পরিবর্ত্তন দেখি নাই। ভাসুর ও বড় যা'কে যথেষ্ট মানিয়া চলিতেন। কি সেবাই করিতেন! সেবা যেন তাঁর জীবনের প্রধান কাজ ছিল। কত কাজই তিনি করিতেন, কখনো ক্লান্তি বোধ করিতেন না। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ও অল্পাহারেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

বাঙলার এ দুর্দ্দিনে কৃষ্ণভাবিনীর মত একজন সেবাপরায়ণা কর্ম্মশীলা নারীকে হারাইয়া আমরা যে কতখানি হীনবল হইয়াছি, তাহা ভাষায় প্রকাশ হয় না।

ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩২৯

ভারতী-স্মৃতি

অনুরূপা দেবী

আমার বয়স তখন বছর চৌদ্দর অনধিক। বিবাহের পর সেই প্রথমবার শ্বশুরবাড়ী গিয়া দুই মাস বাস করিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছি। কর্ত্তৃপক্ষের মত নয় যে, এত শীঘ্র বাপের বাড়ী ফিরিয়া যাই! তাঁরা বলিতেছেন, 'এই তো মোটে দুটীমাস আসিয়াছে, এত শীঘ্র বাপের বাড়ী গেলে আমাদের পোষ মানিবে কেন?' একেই তো আমার দাদাবাবুর সর্ত্তমত বিবাহের পর তিনটি বৎসর ফাঁকি দিয়া কাটানো গিয়াছিল। তার উপর গত বৎসর শ্বশুরবাড়ী আসার সাতটি দিন পরেই বাপের বাড়ী যাওয়ার চিঠি আসাতে, এ-বাড়ীর কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া অনেকগুলি কড়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তার মধ্যে একটী এই যে ও-সব বড়-মানুষের মেয়েদের তোলা-বৌ করে রেখে আমরা না-হয় এবার গরীবের-মেয়ে দেখে বারোমেসে ঘর করা একটি বৌ নিয়ে আসবো। না হলে তো চলবে না।

কথাটা শুনিয়া আনন্দ হইয়াছিল। মনে মনে বলিয়াছিলাম, তাই আনো বাপু, আমিও তাহলে মা-বাপের মেয়ে মা-বাপের কাছে গিয়া বর্ত্তাইয়া যাই!

কিন্তু সেবার আমার স্বামীই, তাঁর এম.এ একজামিনের বছর, এই ওজোর তুলিয়া আমায় পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। ফলে আর একটী আটপৌরে-স্ত্রী তাঁর লাভ হয় নাই! মাত্র সেই সর্ব্বপ্রথম আমার কাছে একটু কৃতজ্ঞতার ধন্যবাদ লাভ করিয়াই তাঁকে সুখী থাকিতে হইয়াছিল। অবশ্য সে-যুগে এ-জিনিষটা তাঁর পক্ষে দুর্লভ বস্তুরই সামিল ছিল কি না, তাই ঐটুকুতেই নিজের পক্ষে খুব বেশী লোকসান বোধ করেন নাই!

কিন্তু এবার আর সে সুযোগ ছিল না। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ পরীক্ষার মাসখানেক আগে শারীরিক বিশেষ অসুস্থতাহেতু পরীক্ষা না দিয়াই তাঁকে 'চেঞ্জে' যাইতে হয়। বহুকাল পরে ফিরিয়াছেন, কৃতজ্ঞতা পাওয়ার লোভ হয়তো আর তেমন বেশী প্রবলও নাই! অগত্যা উপায়ান্তরের চেষ্টা করিতে হইল।

বাবা[৮০] তখন শ্রীরামপুরের সব-ডিবিশনাল অফিসার। চিঠি লিখিলাম, অনেকদিন দেখি নাই, একদিন আসিতে হইবে।

বাবা আসিলেন; আমারই ফরমাসমত আমার দুই বৎসরের ছোট বোনটীকে সঙ্গে

আনিয়াছিলেন, বলিলাম,বাবা,আমি আপনার সঙ্গে যাব!

বাবা বলিলেন, চৈত্র মাসে তোকে এঁরা পাঠাবেন কি?

আমি বলিলাম, আপনি বল্‌লে কি না বলতে পারবেন? আপনি বলুন না।

বাবা হাসিয়া বলিলেন, সেই জন্যই তো বলতে ভরসা হচ্ছে না। যদিই না বলে ফেলেন! এ-মাসটা থাক্, তোর দাদাশ্বশুর এ-সব বড্ড বেশী মানেন, কাজ কি! বৈশাখ মাসের দোসরা তোকে নিতে পাঠাবো। কেমন?

আমি সজোরে মাথা নাড়িলাম—না। চোখে জল আসিল, বাবা বিপদে পড়িলেন। বলিলেন, ঐ জন্যেই তো আসতে চাই না রে! এক তো নিজের মেয়েকে পরের বাড়ী পরের মতন দেখতে ভাল লাগে না; তারপর তুই যদি কাঁদিস্ তা'হলে আমি তোকে কেমন কবে রেখে যাব?

আমি কাঁদিয়া বলিলাম, নিযে চলুন, তাহলে—

দাদাশ্বশুরকে বাবা সে কথা বলিলেন। কিন্তু তিনি এসব খুঁটিনাটী অত্যন্ত খুঁটিয়া জানিতেন, রাজী হইলেন না; বলিলেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাবেলা, ঘরের লক্ষ্মী বউ, তাকে কি পাঠাতে পারি? সেদিন যে আবার বৃহস্পতিবার, তাও মনে ছিল না! তথাপি যথাসাধ্য কান্নাকাটী করিযা দেখিলাম। কিন্তু তিনি কাহারও খাতিরে নিজের মত ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও তেজস্বী ব্রাহ্মণ! সেজন্য আমার বাবাও তাঁকে বেশী খাতির করিতেন।

শেষটা আমার ও বাবার খাতিরে এই পর্য্যন্ত হইল যে পরদিন প্রাতে আমি বাপের বাড়ী যাইতে পাইব; কিন্তু চৈত্র মাসের সংক্রান্তির পূর্ব্বদিনে যেন নিশ্চিতরূপে ফিরিয়া পাঠানো হয়, এ কথাও বলিয়া দিলেন।

প্রতিশ্রুতি দিয়া বাবা চলিয়া গেলেন। পাছে এঁদেব মত বদল হয়, সেই ভয়ে নিজের ছোট বোনটীকে সে রাত্রে আটকাইয়া রাখিলাম। কিছুতেই য'ইতে দিলাম না।

এত কাণ্ড করিয়া মাত্র দিন দশেকের জন্য যাওয়া ঘটিল। তখন অবশ্য জানিতে পারি নাই যে এই যাওযাব সঙ্গে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের কত বড় একটা যোগসূত্র গ্রথিত রহিয়াছিল! বহুকাল পরে সে কথা মনে হইয়াছে।

তখন আমরা চুঁচুড়ার ভূদেব ভবনেই বাস করি। দাদাবাবু, জ্যেঠামহাশয় ও বড়মার মৃত্যু প্রায় তেরো মাসের মধ্যেই উপর্য্যুপরি ঘটিয়া গিয়া সংসারে মহা-বিপ্লব ঘটাইয়া দিয়াছিল। অনেক কষ্টে তার প্রথম ধাক্কাটা মাত্র এ দুই বৎসরে সামলাইয়া আসিতেছে। বড় বড় দুইটা বাড়ীর আর দরকার হয় না; গঙ্গার ধারের বাড়ীতে আমরা থাকি। রাস্তা-পারের বাড়ীতে কখনো কোন সবজজ বা সিনিয়র ডেপুটি ভাড়া আসেন। নতুবা সে বাড়ী পড়িয়া থাকে। প্রকাণ্ড তিন-মহল বাড়ী, ভাড়া লওয়ার মত লোকও

সব সময় মেলে না।

এক আত্মীয়া-সম্পর্কের মেয়ের শ্বশুর অল্পদিনের জন্য ঐ বাড়ী ভাড়া লইয়াছিলেন, পরে উঠিয়া আমাদের বাড়ীর খানকয়েক বাড়ী পরে মিষ্টার পি মুখার্জ্জির (ফণী মুখার্জ্জির) বাড়ীর পাশের বাড়ীতে উঠিয়া যান। একদিন তাঁরা আমাদের বাড়ী বেড়াইতে আসিয়া নিজের পুত্রবধূ সম্বন্ধে অনেক নিন্দা প্রচার করিতে লাগিলেন। সেই সকল আলোচনার মধ্য হইতে আবিষ্কার করা গেল, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ও শ্রীমতী সরলা দেবী সে সময়ে শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবীর গৃহে আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

ইঁহারা চলিয়া গেলে আমার মা বাবার কাছে বলিলেন, ...র শাশুড়ীর কাছে শুনলুম, স্বর্ণকুমারী দেবীরা পি মুখুজ্জের বাড়ী এসেছেন, কাল তাঁদের আসতে বলবো ?

বাবা বলিলেন, বল।

সকালে লোক পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করা হইল।

এইখানে পুর্ব্বের একটু ইতিহাস জানাইয়া রাখা আবশ্যক। আমাদের চুঁচুড়ার গঙ্গার ধারের বাড়ীর ঠিক ডানহাতি বাড়ীখানিতে এক সময়ে মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কয়েক বৎসর যাবৎ বাস করিয়াছিলেন। সে অবশ্য অনেক দিনের কথা। আমরা সে-সময় নিতান্ত শিশু। সে-সময়কার কোন স্মৃতিই আমার মনে আসে না, তবে মায়েদের মুখে অনেক গল্প শুনিয়াছি। একেবারে পাশাপাশি বাড়ী ! দু'বাড়ীতে আসা-যাওয়া খুবই ঘটিয়াছিল। ঠাকুর পরিবারের সহিত সেই হইতেই আমাদের বাড়ীর ঘনিষ্ঠতা। সে-সময় ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ ৺সুশীলা দেবীই প্রধানতঃ সেখানে বাস করিতেন। তাঁর সঙ্গে আমার মায়ের খুব স্নেহ-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল, প্রত্যহ দু'জনে দু'জনের কাছে যাতায়াত ও বিদ্যা-বিনিময় করিতেন। মা তাঁর কাছে বাজনা শিখিতেন, তিনি মায়ের কাছে শিল্প-শিক্ষা করিতেন, সকল প্রকার শিল্প-বিদ্যায় মায়ের পারদর্শিতা নিতান্ত অল্প বয়স হইতেই। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নলিনী দেবী আমাদের ক্রীড়া-সঙ্গী ছিলেন।

ওই কয় বৎসরের মধ্যে মহর্ষির পরিবারবর্গ যাঁহারা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, সবার সঙ্গেই অল্প-বিস্তর পরিচয় ঘটিয়াছিল। মাননীয়া শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী আসিলেই আমার পিতামহ-দেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন, তাই তাঁর সঙ্গেও পরিচয় ছিল।

যেদিন তাঁদের আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করা হইল, সেদিন আমার নিজেরও অন্যত্র নিমন্ত্রণ ছিল। সে নিমন্ত্রণ আমার দিদির শ্বশুর-বাড়ীতে। আমার দিদির শ্বশুর স্বনামধন্য ৺শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হুগলি কোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। তাঁর বাড়ীতে আমাদের সর্ব্বদাই আসা-যাওয়া চলিত; তবে এ'দিন শুধু মহিলাদের

নিমন্ত্রণ নয়, সেই সময়ে দেশে 'সই' পাতানোর একটা হুজুগ লাগিয়াছিল। বিস্তর মেয়ে সই পাতাইতেছিল দেখিয়া আমাদেরও সাধ হইল। দিদির সেজ ননদ নীলনলিনী দেবীর সহিত সেদিন আমার সই পাতানোর বন্দোবস্ত ছিল, কাজেই যাইতে হইল। কিন্তু দুর্লভ-দর্শনদের দেখিবার জন্য মন উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হইয়া রহিল। সখীত্বের সখ্যরস কিছুই উপলব্ধি করিতে পারা গেল না! যত শীঘ্র সম্ভব ফিরিয়া আসিলাম, সঙ্গে আসিলেন সখী। দেশ-বিখ্যাত সরলা দেবী বি. এ-কে কাছে হইতে না জানি কেমন দেখাইবে, এই সন্দেহে ও ভাবনায় আমার বুক টিপ টিপ করিতে লাগিল। আবার যাঁর অতগুলি বই ছাপার অক্ষরে বাহির হইয়াছে, চুরি করিয়া খানকয়েক পড়িয়াও শেষ করিয়াছি, সেই মানুষই বা আমাদের দেখিয়া কি মনে করিবেন!

আসিয়া দেখিলাম, মার ঘরের খাটে তাঁরা তিনজনে শুইয়া বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, গল্প-সল্প হাসিখুসী বেশ সহজভাবেই চলিতেছে। দেখিয়া বিস্মিত ও আশ্বস্ত হইলাম। তবে বি-এ পাশ করিলে মেয়েরা একটা অদ্ভুত কিছু হয় না! বই লিখিয়া তা' ছাপাইলেও না! (এখানে বলা ভাল, বই অর্থাৎ উপন্যাস আমার দিদি তখনই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আমিও তাঁর দেখাদেখি দু'একটা গল্প লিখিয়া খুব লুকাইয়া বাক্সর টানার ভিতর রাখিয়া দি,—আমার স্বামী অনেক চেষ্টা করিয়াও সেগুলাকে বাহির করিয়া দেখিতে পারেন নাই। কিন্তু ভরসা করিয়া বই ছাপানো আর তেমন করিয়া খাতায় লেখা, সে যে ঢের তফাৎ!)

যাহোক ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া ভরসা বাড়িল। শেষে দু'একটা গানের ফরমাসও করিয়া বসিলাম। তার মধ্যে দু'একটার সুরের রেশ আজও কানে লাগিয়া আছে। "অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী—" এ গানটি তো আর কাহারও গলায় আমার ভালই লাগে নাই—যেমন সেদিন সরলাদিদির মুখে শুনিয়াছিলাম!

এই আলাপ-পরিচয়ের পর কিছুদিন চিঠিপত্র লেখালেখি চলিয়াছিল। তারপর সেবার আশ্বিন মাসে—বাবা তখন হাবড়ায় বদলি হইয়াছেন, পূজার বন্ধের ঠিক পূর্ব্বে কলিকাতায় মার মেজকাকা কর্নেল এইচ্ সি ব্যানার্জ্জী (৺হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) সুদীর্ঘকাল পরে সীলেট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। মা তাঁর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে কয়েক দিনের জন্য বাবার হাবড়ার বাসায় আমাদের সঙ্গে লইয়া আসিলেন। আসিয়াই তিনি সেই রাত্রে ঘোর অসুস্থ হইয়া পড়ায় কয়েক দিন ক্রমশঃ কয়েক মাসে পরিণত হইয়া পড়িল।

ইহার মধ্যে একটু ভালো থাকার সময় কার্ত্তিকের শেষে দিন-কয়েকের জন্য ভবানীপুরে দিদিমার বাড়ী আসা গেল। রাস-পূর্ণিমায় দিদিমার সেবার রাস হইতেছে। বেশ একটু সমারোহ করিয়াই করিলেন। আমরা দিন পাঁচ-ছয় রহিয়া গেলাম।

হঠাৎ একদিন একটা মতলব স্থির করিয়া ফেলিলাম। আমার মাসিমা খুব অল্প

বয়সেই বিধবা হইয়া দিদিমার কাছে থাকিতেন, আমরা তাঁকে মার মতই ভালবাসিতাম। তিনিও ঠিক মায়ের মতই মাসি ছিলেন। রোগে-ভোগে কত রকমেই সেবা-যত্ন করিয়াছেন। আবার বন্ধুর মত তাঁকে সব কথা বলাও চলিত। মা বা মাসিমাকে আমরা তো কোনদিনই ভয় করিতাম না। মাসিমাকে গিয়া বলিলাম, বালিগঞ্জ তো এই দিকেই! একদিন সরলা দেবীর বাড়ী গেলে হয় না? চলো না মাসিমা, যাই।

মাসিমার মত হইল, মার দিদিমারও আপত্তি ছিল না। এখন ভাবনা হইল, সঙ্গে লওয়া যায় কাকে? বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক তো তেমন কেহ নাই! এক সৌরীন! সে এই বছর বারো পূর্ণ হইয়া তেরোয় পা দিয়াছে। তা কি আর হইবে? তাকেই সঙ্গী করা গেল। সে কি যাইতে রাজী হয়! কিছুতেই তার মত হয় না, বোধ হয় ভয় করিতেছিল! শেষটা কোন গতিকে বুঝাইয়া সম্‌জাইয়া তাকে রাজী করা গেল। সকলে বালিগঞ্জে গেলাম।

গিয়া কিন্তু মনটা কিছু দমিয়া গেল। চুঁচুড়ায় থাকিয়া হিরণ্ময়ী দেবীর ম্যালেরিয়া ধরিয়াছিল, তারই জের চলিতেছে; খুব জ্বর আসিয়াছে। সরলা দেবীর কোথায় একটা নিমন্ত্রণ আছে, তিনি কাপড় পরিতেছিলেন, ঘরে আসিয়া একটু বসিতে না বসিতেই বিবি-দিদি অর্থাৎ (তখনকার কেবলমাত্র) শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী আসিয়া ডাক দিলেন এবং তিনি আমাদের কাছে বিদায় লইলেন। যাহোক, তাহা হইলেও গৃহকর্ত্রী মাননীয়া স্বর্ণকুমারী দেবী আদর-আপ্যায়নে কোন ত্রুটিই ঘটিতে দিলেন না।

গাড়ীতে উঠিয়া সৌরীন বলিল, এঁরা তো চমৎকার লোক! এমন জান্‌লে আমি কি আস্‌তে চাইতুম না! স্বর্ণকুমারী দেবী আমায় আদর করে একরাশ বই পড়তে দিলেন। বললেন, তুমি বাংলা লিখতে চেষ্টা কর—একদিন ভারতীতে তোমার লেখা ছাপা হবে!

ইহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া আর দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নাই। সেই বৎসরই আমার মায়ের অসুখের সময় হ্যারিসন রোডের বাড়ীতে তাঁরা বার কয়েক আসিয়াছিলেন, সরলাদি'র গান শুনিতে রাস্তায় লোকের ভিড় জমিয়া যাইত, এ-সব গল্প দিদির মুখে শুনিতাম, কিন্তু সে সময়ে আমার শ্বশুর-বাড়ী দুটী দুর্ঘটনা ঘটায় আমি সেখানে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। সে সময়ে আমার একটী ননদ বাল-বিধবা হইয়া আসিয়াছিলেন।

জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া বৎসরের পর বৎসর-চক্র ঘুরিয়া গেল। জীবনের প্রথম প্রভাতে জীবন-বৃক্ষে যে মুকুলগুলি দেখা দিয়াছিল, ক্রমে মধ্যাহ্নের দিক ঘেঁষিয়া তাহা উন্মেষিত হইতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বেই ছোটগল্প দু-একটা, তারপর একখানা বৃহদায়তন উপন্যাস, নাম মিবারেশ্বর, (সেখানা টডের রাজস্থানেরই একটা দ্বিতীয় সংস্করণ বিশেষ) পাঁচখানা চার পয়সা দামের এক্সারসাইজ বুক জুড়িয়া লেখা

হইয়াছিল। সে উপন্যাসের সম্বন্ধে এখন আর কিছু বড় বেশী মনে নাই, শুধু কতকগুলি নাম মনে আছে। বিজলী সিংহ, লাবণ্য সিংহ, অনুপম সিংহ, রেবা, দীপ্তি, আশা, শুভ্রা, শুক্লা ইত্যাদি—খুব পছন্দসই নামগুলি ঐতিহাসিক স্ত্রী-পুরুষদের ঘাড়ে চাপাইয়া তাদের মনের মত করিয়া লওয়া গিয়াছিল। একদিন আমার স্বামী সে খাতা দেখিবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করায় রাগ করিয়া তাদের জলে ভাসাইয়া দিই। আমাদের নীচের বারান্দা হইতে ছুঁড়িয়া ফেলিলেই যে-কোন বস্তুকে গঙ্গার জলে ফেলা চলিত। কাজেই ফেলিবার সম্বন্ধে মত-পরিবর্ত্তনেরও অবসর পাওয়া যায় নাই। শেষকালে অনুতাপে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। এম্‌নি করিয়া দিন চলিয়াছে। ইতিমধ্যে আরও কয়খানা উপন্যাস লিখিয়াছি। 'সুহার', 'লীলা', 'প্রতিশোধ', 'ঋণশোধ', 'বনফুল' ইত্যাদি। এই রচনাগুলি আমার জীবন-পথের চির-আদর্শ, চির স্নেহময়ী জীবন-সঙ্গিনী দিদি ভিন্ন আর কেহ দেখিতে পায় নাই। ইহাদের ভিতর হইতে উত্তরকালেও বড় একটা সারোদ্ধার করিতে পারা যায় নাই। এম্‌নি তাদের অদ্ভুত রকম প্লট! তবে ঠিক এইগুলির পরেই লেখা একখানি অসমাপ্ত উপন্যাস—তখনও তার নামকরণ হয় নাই, সেইখানির মাল-মসলায় রামগড় উপন্যাসখানি[৮১] লিখিত হইয়াছিল।

তারপর বছর দুই চুপচাপ কাটিল। এই সময় ভাগলপুরে আসিলাম এবং আমার মেয়ে কল্পনার জন্মের পরেই আমি সূতিকা-গৃহ হইতে কঠিন রোগে শয্যা লইলাম। মাস কয়েক পরে বাড়ার ভাগটা গেল বটে, তথাপি একটা ঘুষঘুষে অসুখ বৎসরের পর বৎসর লাগিয়াই রহিল। এই অবস্থার সুযোগে পড়াশুনায় খুব মন দেওয়া গেল। বন্ধু নিরুপমা দেবীও এই সময়ে ভাগলপুরে তাঁর পিতার নিকট বাস করিতেছিলেন। বালবৈধব্যের অসহ্য দুঃখ সাহিত্যের ভাব-গঙ্গায় নিমজ্জিত করিয়া সেও পদ্য-গদ্য লিখিতেছিল, পড়াশুনা লইয়াই দিন কাটাইতেছিল।

এই অবস্থায় আমি টিলাকুঠি ও সাজঙ্গী লিখি। টিলাকুঠি পড়িয়া আমার পাঠকরা আমায় বেশ ভাল রকম সার্টিফিকেট দিলেন। পাঠক মানে, দিদি, নিরুপমা আর সৌরীন। মনের উচ্ছ্বাসে দিদি একটা এবং সৌরীন দুইটা বড় বড় পদ্যই লিখিয়া ফেলিল, ইহার নায়ক নায়িকার উদ্দেশে। তাদের নাম ছিল, অগষ্টস ক্লিবল্যাণ্ড ও ইজাবেলা। ভাগলপুরের বিখ্যাত ক্লিবল্যাণ্ড মেমোরিয়াল, টিলাকুঠি নামক অট্টালিকাই এ উপন্যাসের উপাদান।[৮২] এই উপন্যাসখানি বৎসর কয়েক পরে নবনূর কাগজে বাহির হইতে হইতে কাগজখানি উঠিয়া যাওয়ায় তাহার সহিত পাণ্ডুলিপিও নষ্ট হইয়া অসমাপ্ত থাকে। তার অনেক পরে ইহার সমস্ত নাম-ধাম বদলাইয়া ইহাকেই সোনার খনিতে পরিণত করা হইয়াছে। এই সময় একদিন সৌরীনের[৮৩] সঙ্গে দেখা হইলে সে বলিল, আরও একটা কিছু লিখুন না, আপনার টিলাকুঠি তো খুব ভাল হইয়াছে।

আমি বলিলাম, তুমিও গল্প লিখিতে আরম্ভ করো—শুধু পদ্য লিখে কি হবে? গল্প লেখো।

সৌরীন বলিল—ইচ্ছে ত করে, কিন্তু হয় কৈ? আচ্ছা, কি করে প্লট ঠিক করে নেন, বলুন তো?

ঠিক কি বলিয়াছিলাম, মনে পড়ে না। তবে দু'একদিন পরেই সৌরীন 'টিনের পুতুলের আত্মকথা' নাম দিয়া একটা গল্প লিখিয়া আমায় দেখাইল। গল্পটা মন্দ হয় নাই।

একখানা বাঁধানো খাতা কিনিয়া নবোৎসাহে একখানা উপন্যাস ধরিলাম। নাম দিলাম তার টিউটর। তখন সৌরীন বাঁকিপুরে আসিয়াছিল, খানিকটা পডিয়া পড়িয়া সে বলিল, —বা! সুন্দর লেখা হচ্ছে! আর এমন ভাল খাতা! এ'তে আর লেখা ভাল হবে না!

এই সময় আমার ছোট পিসিমা আসিয়াছিলেন। তিনিও আমাদের দলের একজন। যেমন পড়িতে, তেমনি পডাইতে ও লেখাইতে। নিজেও কতকগুলি ইংরাজীর অনুবাদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। চারিদিকে উৎসাহ পাইয়া উপন্যাসখানি শেষ হইয়া "উল্কা"র পত্তন পড়িল। এই টিউটরই কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে হারানো খাতার মূর্ত্তিতে স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ রমাপ্রসাদের অনুরোধে বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়।[৮৪] পরে পুস্তকাকারে ছাপা হইয়াছে।

পোষ্যপুত্র উপন্যাস,[৮৫] কন্যাহারা হইয়া আমার ছোট পিসিমা যখন বাবার বাঁকিপুরের বাসায় আসেন, তখন তাঁরই ইচ্ছায় লিখিতে আরম্ভ করি। এর ভিতর অনেকগুলা ছোটগল্প লেখা হইয়া গিয়াছিল। তার মধ্যে দু'তিনটা দিয়া কুন্তলীন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইয়াছিলাম, কিন্তু ৫ টাকার বেশী উঁচুতে তারা উঠিতে পারে নাই।

মজঃফরপুরে ফিরিতেছি, ছোট পিসিমা বলিলেন, —এবার যখন আসবি, একখানা বড় উপন্যাস লিখে নিয়ে আসবি, কেমন? কি সব ছোট-খাটো লিখিস্, পড়তে না পডতেই ফুরিয়ে যায়। দু'তিন দিন ধরে পড়বো, তবে না!

আমি কথা দিলাম,—আচ্ছা, সেই রকমই হবে।

ভারতী তখন কর্ণধার-বিহীন তরণীর মত হাবুডুবু খাইতেছিল। সৌরীন ভারতী দেখে। সে লিখিল—আপনার একটা ছোটগল্প দেবেন, ভারতীতে ছাপব।

পরাজয় গল্পটা তখন বামাবোধিনীকে দিয়া উত্তর-প্রত্যাশায় হতাশ হইয়াছিলাম। তখন অবশ্য কাপি রাখিয়া লেখা পাঠাইতাম। তাড়াতাড়ি রেজেষ্ট্রী ডাকে সৌরীনকে সেটা পাঠাইয়া দিলাম।

গল্পটী বড়; ভারতীর দুই সংখ্যায় বাহির হইল।[৮৬] এক সংখ্যা বাহির হওয়ার

পর ভবানীপুরে গিয়াছি, সৌরীন বলিল,—স্বর্ণকুমারী দেবী আপনার লেখার খুব সুখ্যাতি করে বললেন, 'অনুপমা' নাম কেন দেয় ? আমি অনুরূপা নামেই ছাপবো। কেন লেখাটা কি মন্দ কাজ যে নাম লুকিয়ে রাখতে হয় ! আপনাদের একদিন যেতে বলেছেন, চলুন।

দিদি আমি আর সৌরীন তিনজনে গেলাম।

তিনি ঐ কথাই বলিলেন, আরও বলিলেন যে এমন শক্তি রয়েছে, নষ্ট করছো কেন ? বেশী করে লেখো, আমার হাতেই তো আবার ভারতীর ভার পড়লো—এর প্রতি সংখ্যাতেই কিছু কিছু লেখা দাও।

দিদি বলিল,—ওর অনেক গল্প লেখা আছে। উপন্যাসও একখানা আছে। বেশ হয়েছে।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—সে কী ভারতীতে দেবার যোগ্য ?

মাননীয়া সম্পাদিকা দেবী কহিলেন,—তুমি নিজেই যে নিজের লেখার সমালোচক হলে, দেখচি। যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচারের ভারটা আমায় দিয়ে লেখাগুলো সব পাঠিয়ো দেখি !

আদেশ পালন করিলাম। কিন্তু মনে একটা কাঁটা ফুটিয়া রহিল, পাছে লেখাটা ফেরৎ আসে ! কিন্তু তা আসিল না। তার পরিবর্ত্তে উত্তর আসিল—

"স্নেহের অনুরূপা,

তোমার সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না। তোমার উপন্যাস আমার ভাল লাগিতেছে। যতটা দিয়াছ, তাহা হইতেই জিনিষটাকে জানা যাইতেছে। এই একখানা উপন্যাসেই তুমি নাম করিতে পারিবে, দেখিও !"

এই ঘটনা হইতেই সর্ব্বদা চিঠিপত্র লেখা চলে। প্রথম বৎসর গোটাকতক ছোট ছোট গল্প ও পরে দু'বৎসর ধরিয়া পোষ্যপুত্র ধারাবাহিকভাবে ভারতীতে বাহির হইতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে কলিকাতায় গেলেই বালিগঞ্জে বারকতক করিয়া না গেলে মনস্তৃপ্তি ঘটে না। তিনিও পটলডাঙ্গায় ও ভবানীপুরে নিজে আসিয়া দেখা করিয়াছেন, আমার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু—বেলার সম্পর্কে তখন হইতে আমি তাঁহাকে পিসিমা-ই বলি। যখন গিয়াছি, কত স্নেহ আদর উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছি। তাঁর কাছে অত উৎসাহ না পাইলে হয়ত সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন সাহসের সহিত নামিতে পারিতাম না।

পোষ্যপুত্র নামটিও তাঁহারই দেওয়া।

পোষ্যপুত্র শেষ হইলে আমায় আবার একটা উপন্যাস দিতে বলিলেন। আমি আমার প্রিয়বন্ধু নিরুপমা দেবীর "অন্নপূর্ণার মন্দির"[৮৭] লইতে বলিয়া লিখিলাম,—পাঠকদের এক লেখকের লেখা ক্রমান্বয়ে পড়া তেমন আরামের হবে কি ?

বৎসরখানেক পরে "অন্নপূর্ণার মন্দির" শেষ হইলে আবার আমায় লিখিবার জন্য তাগিদ দিলেন। এবার অপরের লেখা খুব প্রসিদ্ধ(উত্তরকালে) উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াও নিস্তার পাইলাম না। ফেরৎ দিয়া লিখিলেন,

"ও-সব ফাঁকি চলিবে না। আমি তোমার লেখা ভালবাসি। পোষ্যপুত্রের মত আর একখানি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করো। আমায় মাসে মাসে পাঠাইলেই চলিবে। বেশ ঘরকরণার কথা লইয়াই ওই ভাবে লিখিবে।"

এমন করিয়া কয়জন সম্পাদক নূতন লেখককে উৎসাহ দিতে জানে? এই সহানুভূতিতে গলিয়া গিয়া "বাগ্‌দত্তা"[৮৮] আরম্ভ করিলাম এবং সেই হইতে মাসে মাসে লিখিয়া দেওয়ার রীতিটী আমার কায়েমী হইয়া গেল। এখন অনেকেই এই পথে চলিতেছেন, শুনিয়াছি। এই শিক্ষাটুকু না পাইলে হয়তো আর একখানা উপন্যাসও লিখিয়া উঠিতে পারিতাম না।

"বাগদত্তা" প্রকাশ-কালেও কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ ঘটিয়াছে। গেলেই এ লইয়া আরও নানা বিষয়ে কথা হইত। একবার বলিলেন–

অনুরূপা, তুমি অমন করালীচরণটীকে কোথায় পেলে? আমি বোধ হয় ও-চিত্র আঁকিতে পারিতাম না। বাস্তবিক চরিত্র-চিত্রণ বিষয়ে তোমার শক্তিটা খুব সামান্য নয়। এত কম বয়সে তুমি কিন্তু অনেক দেখেছ ও বুঝেছ তো!

লেখার সম্বন্ধে এত বড় একটা মত পাইলে সে বয়সে সে কি কম আনন্দ, কম উৎসাহ পাওয়া যায়! বিশেষ, উপযুক্ত স্থান হইতে! নতুবা এমনি তো অনেকেই বাহবা দিতে পারে এবং দিয়াও থাকে, তার দাম কতটুকু?

সরলাদিদির সঙ্গে বহুদিন সাক্ষাৎ ঘটে নাই, কিন্তু যখনই তাঁর পরিচিত কাহারও সঙ্গে দেখা হইয়াছে, খবর লইয়াছি। তাঁদের সঙ্গে আমার কেমন যেন একটা প্রাণের যোগ হইয়া গিয়াছিল। অথচ আমি যখন কলিকাতায় গিয়াছি, বালিগঞ্জ গেলেই শুনিয়াছি, এই সেদিন মাত্র তিনি লাহোরে ফিরিয়া গিয়াছেন, দেখা করিবার ইচ্ছা প্রবলভাবেই ছিল, কিন্তু সুযোগ ঘটে নাই। আবার এতদিন পরে তাঁহাকে তাঁর নূতন অবস্থায় ও নূতন মূর্ত্তিতে সে দিন দেখিয়া আসিলাম। একটা যুগান্তরের পর এ দেখা! দুজনে হঠাৎ কোনখানে দেখা হইলে হয়ত কেহ কাহাকে চিনিতে পারিতাম না। অথচ দুজনেই দুজনের সব খবর রাখিয়া আসিয়াছি দেখিলাম, আমার মত তিনিও আমার সহিত সাক্ষাতে সমুৎসুক রহিয়াছেন।

দেখা হইতেই বলিলেন,—আবার তো ভারতীকে হাতে নিয়েছি। তার পূর্ব্ব-গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে। লেখা দাও।

লিখিবার অক্ষমতা ইত্যাদি কোন ওজোরই তিনি শুনিতে রাজী নহেন। সে দিন একটা ক্ষুদ্র নাটিকা মাননীয়া মিসেস্ পি কে রায়ের অনুরোধে তাঁর স্কুলের মেয়েদের

অভিনয়ের জন্য লিখিয়াছিলাম। সে লেখাটা হাতেই ছিল। বলিলেন—ওটা দিয়ে যাও, ছাপা হলে তো আর অভিনয়ের ব্যাঘাত হবে না। আর কিছু থাকে তো পাঠিয়ে দিও। লোক পাঠাবো কাল। কখন পাঠাবো, বলো দেখি।

জুলুম দেখিয়া হাসিলাম। অথচ ভারতীর কাছে ঋণও তো কম নয়! কাজেই হাতড়াইয়া-পাতড়াইয়া একটা অর্দ্ধ-পরিত্যক্ত নাটকের কথা মনে পড়িয়া গেল। 'কালিদাস' সম্বন্ধে একখানা বড় নাটক লেখার সাধ ছিল। তার জন্য প্রথম অংশটা প্রায় দশ-এগারো বৎসর পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম, তারপর আর লেখা ঘটিয়া উঠে নাই। তা ভিন্ন আমার 'বিদ্যারত্ন' 'কুমারিল ভট্ট' নাটক দুখানার প্রতি থিয়েটারের অগ্রাহ্য দেখিয়া নাটক লেখার সাধও কমিয়া গিয়াছিল, সেইখানাকে "বিদ্যোত্তমা" নাম দিয়া ভারতীর জন্য পাঠাইয়া দিলাম।[৮৯]

আবার এই নববর্ষে নূতন অনুরোধ আসিয়াছে।

ভারতী, স্বর্ণকুমারী পিসিমা, হিরণদিদি, সরলাদিদি—এঁদের সঙ্গে আমার জীবনের কতখানিই যে জড়াইয়া রহিয়াছে! এঁদের কথায় কত অতীত গল্পই যে মনে পড়িয়া যায়! কত সুখের স্মৃতিই মনে জাগে! আমার দিদিকে হারাইয়া আমার জীবন কি যে শূন্য, কি অন্ধকার হইয়া গিয়াছে তার খানিকটা যেন এই আলোয় স্পষ্ট হইয়া ওঠে! আর একটীকেও মনে পড়ে, সে সেই সব দিনের বালিগঞ্জে যাওয়া-আসার স্মৃতির সঙ্গে বিজড়িত, সে সৌরীনের স্ত্রী—আমার বড় স্নেহের তরু! তারপর বেলা! তার যে-স্মৃতি আজ কালের হাতে ম্লান হইয়া আসিতেছে, সেও হঠাৎ উজ্জ্বল হইয়া দেখা দেয়! এ সব কি ভুলিবার! না, ভারতী-সম্পাদিকারা আমার জীবনে শুধু সাহিত্যের আত্মীয়তার নিকটতম সূত্রেই তাঁরা যে চিরসম্বন্ধ গাঁথা হইয়া রহিয়াছেন! এ বন্ধন কখনো ছিন্ন হইবার নয়!

ভারতীর পুনরুজ্জীবন অন্তরের সহিত কামনা করি। আমরা যখন বালক-বালিকা, তখন হইতেই ভারতী ও বালকের সহিত পরিচিত হইয়াছিলাম। গল্প পড়িয়া মাথা-মুণ্ডু কিছু বুঝিতাম না, তবু 'স্নেহলতা'[৯০] পড়িয়া চমৎকৃত হইয়া ভাবিয়াছি, ঘরের কথা লইয়াও এমন বই লেখা যায়! ইয়ুরোপ-যাত্রীর ডায়েরী পড়িয়া কতই না বিস্মিত হইয়াছি! আবার পুরাতন ভারতী হইতে মেঘদূতের অনুবাদ মুখস্থ করিতাম।

ভারতী আমার চেয়ে বয়োবৃদ্ধ, আমার পরেও তাঁর দীর্ঘজীবন অন্তরের সহিত কামনা করি।

ভারতী, বৈশাখ ১৩৩৩

"ভারতী স্মৃতি"

নিরুপমা দেবী

মাননীয়া শ্রীযুক্তা 'ভারতী' সম্পাদিকা মহাশযা 'ভারতীর' জুবিলি উপলক্ষে একটু অসময়েই আমাদের স্মরণ করিয়াছেন। তথাপি এই আনন্দ-নিবেদনের নিমন্ত্রণে আমাদের যোগ দিতেই হইবে, নহিলে অকৃতজ্ঞতার দোষস্পর্শে, তবে পথের এই বিলম্বটুকুর ভরও সহিবে কিনা ইহাই সন্দেহ, কেননা উৎসব দিনের আর দেরী নাই। তবুও নিজের অন্তরের জবাবদিহির নিকট খালাস পাইবার নিমিত্ত আমাদের এই চেষ্টাটুকু ভারতী অফিসে পৌঁছিলেও অনেক শান্তি পাওয়া যাইবে!

"ভারতীর জুবিলি"— দেশের সাহিত্যিক জীবনের জুবিলি একথা যে আমাদের মত বাংলার স্বল্পপ্রাণ গল্পলেখকের নিজেদের অস্থি মজ্জায় স্বীকার করিবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। তরুণ সাহিত্য-সেবীদের উৎসাহ দিয়া তাহাদের রচনা প্রকাশ করিতে এবং তাহাদের নবীন প্রাণের শত-ক্রটী-সম্বলিত সলজ্জ সঙ্কুচিত নব কল্পনা-লতার মূলে জল সেচন করিয়া তাহাদের ফলে ফুলে শোভিত করিতে আমাদের যুগে তখন 'ভারতী' ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ ছিল না। আমাদের সেদিনে 'ভারতীর' পালয়িত্রী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর রচিত এবং ভবিষ্যত 'ভারতীতে' প্রকাশিত সেই প্রসিদ্ধ সঙ্গীতটী (তখন কাহারো জানা না থাকিলেও) যেন জীবন্তভাবে এই 'ভারতী' পত্রিকার প্রতিই প্রযুজ্য ছিল।

ওগো কমল-আসনা, রঞ্জিনী বীণাপাণি
মোরা কাহারেও আর জানি না ভারতী
তোমারেই শুধু জানি!
ওগো মধুর-ছন্দা হৃদয়ানন্দা
জানি না প্রভাত না জানি সন্ধ্যা—
তোমারি পূজার অর্ঘ্য রচিয়া
জীবন ধন্য মানি।
মোরা জানি না ত তাহা ভাল কি মন্দ
বাসহীন কিবা মধুর গন্ধ
শুধু প্রীতি-পূরিত পরমানন্দ
তোমার চরণে দানি!

আমাদের সেই ভাল কি মন্দ সংশয়-পূরিত অন্তরের পরমান্ন তখন এই ভারতী দেবীই ভোগ করিয়া আমাদের সাফল্যের আনন্দ-প্রসাদটুকু নিঃশব্দে বিতরণ করিতেন। এখানে আমাদের দলের সম-সাহিত্য-সেবিকা কয়েকজনেরই কথা মনে হইতেছে। জ্যেষ্ঠা-ভগিনী-কল্পা ৺ইন্দিরা দেবী[১] এবং বাল্যসখী শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর কথা এখনকার বাঙ্গলা উপন্যাস-পাঠকমাত্রেই জানেন, তাঁহাদের সহিত ভারতীর সম্বন্ধ অধিকতর ঘনিষ্ঠ, শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী এ উৎসবে নিশ্চয়ই নিজের স্থান অধিকার করিবেন কিন্তু আর একজন প্রায় অখ্যাতনাম্নী নীরব সাহিত্য-সেবিকার কথাই একটু বলিতে ইচ্ছা করি, যিনি তাঁহার অন্তরের শত কল্পনাসম্পদে ভূষিতা হইয়াও বহুকাল রোগ ও শোকে জর্জ্জরিতা থাকিয়া অকালে চলিয়া গিয়াছেন। এই 'ভারতী' এবং ইহার বর্ত্তমান সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরলা দেবী তাঁহার অন্তরে পূজার আসনই পাইতেন। 'লাইকা' ও 'তরুতীর্থে'র লেখিকা ৺হেমনলিনী দেবীর[২] কথা বলিতেছি। আমাদের তরুণ সাহিত্য সেবার সময়ে যখন নিজেদের আত্মীয় ও বন্ধু ভিন্ন অন্য কাহাকেও নিজের অন্তরের সে বস্তুর সন্ধান দেওয়া ধৃষ্টতা বলিয়াই মনে হইত, সেই সময়েই তাঁহার সঙ্গে পরিচয়, এবং সে পরিচয়ের অল্পদিন পরে যখন জানিতে পারা গেল যে ১৩০৮ সালের ভারতীতে প্রকাশিত 'বেহারে বাঙ্গালিনী' শীর্ষক চিত্র-রচনাটির 'প্রবাসিনী' লেখিকা আমাদের এই অন্তরঙ্গা বান্ধবী[৩], তখন তাঁহাকে কি সম্ভ্রমের চক্ষে যে দেখিয়াছিলাম আজও তাহা মনে পড়ে। তখন বেশীর ভাগ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও শ্রীযুক্তা প্রিয়ম্বদা দেবী ইহাদেরই নাম কেবল ভারতীর লেখিকা-শ্রেণীতে দেখিতে পাইতাম। ইন্দিরা ও অনুরূপা দেবী তখনো সাহিত্য-সভায় নামেন নাই, আমাদের তো কথাই নাই! অথচ তখন আমাদেরই মত একজন ভারতীর লেখিকা-শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছেন এ যেন কল্প-লোকের বার্ত্তার মতই সেদিন আমাদের মনে মোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। (ইনি পরে অনেকগুলি গল্প এবং 'লাইকা' নামে কাব্যোপন্যাস খানি 'ভারতীতেই' প্রকাশ করেন।)

ইহার বহুদিন পরে ১৩১৫ সালে যখন অনুরূপা 'অনুপমা' নামে ভারতীতে কয়েকটি গল্প প্রকাশ করিলেন, তখন দেখাদেখি আমরাও দুই একটী রচনা ভারতীকে দিতে সাহসী হইলাম। বলা বাহুল্য, 'ভারতী' তখন দেবী ভারতীর মতই তাঁহার গোপন-সাধকদের সে ব্যক্ত পূজার অঞ্জলি সাদরেই গ্রহণ করিলেন। সেই হইতেই ইনি চিত্র-সাহিত্য, কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি আমাদের বহু পূজাই চিরদিন গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। সে সব ভাল কি মন্দ, বাসহীন কিম্বা মধুর গন্ধ, তাহার বিচার ভারতী-ই করিয়াছেন, আমরা কেবল প্রীতি-পূরিত পরমানন্দ তাঁহার চরণে দান করিয়া আসিয়াছি। আজ সেই ভারতী পঞ্চাশৎবর্ষে পদার্পণ করিল, এ আনন্দে যোগ দিবার আমাদেরও যেন অধিকার আছে, এমনি মনে হইতেছে। ভারতী মাত্র

আমাদেরই বয়োজ্যেষ্ঠা নন, প্রায় সমস্ত বাংলা মাসিকেরই ইনি জ্যেষ্ঠা ভগিনী! "জ্যেষ্ঠা সুতরাং শ্রেষ্ঠা" এই কবি-বাক্যে আমাদের শ্রদ্ধা আছে! ভারতীর জ্ঞান গবেষণা বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষীদের দ্বারা লিখিত হইয়া বহুকাল হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, ইহার অন্যান্য প্রবন্ধ-সমৃদ্ধির আলোচনা করিবার মত যোগ্যতাও আমাদের নাই। কেবল গল্প-উপন্যাস-বিভাগ-বিষয়ে এইটুকু বলিতে পারি যে, ভারতী একদিন এদিকেও শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন। বাংলার নারী-সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবীর ইনি লালিত কন্যা, আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রের যোযান অব্ আর্ক শ্রীযুক্তা সরলা দেবী ও মাননীয়া হিরণ্ময়ী দেবীর ইনি আদরের ভগ্নী, ইহার সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা আমাদের সাজে না, তবে প্রার্থনা করি, ভারতী যেন পূর্ব্ব গৌরবে অচলা থাকিয়া বাংলা মাসিকের জ্যেষ্ঠা ভগিনী রূপেই শতজীবিনী হইয়া থাকেন। পঞ্চাশত বর্ষের উৎসবে আজ সম্মিলিত হইলাম — শতাব্দীর উৎসবে যেন বাংলার ভবিষ্যৎ সাহিত্য-সেবীরাও এইরূপ অথবা ইহাপেক্ষাও আনন্দ লাভ করেন। ভারতী সম্বন্ধে এ আশা শতাব্দী হইতে যেন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে 'চির' শব্দের সঙ্গেও সংযুক্ত হয়, — সাহিত্যসেবীদের জননী বীণাপাণি দেবী ভারতীর শ্রীচরণে আমাদের আজ এটুকুও প্রার্থনা রহিল।

ভারতী, বৈশাখ ১৩৩৩

পুরানো কথা
হেমলতা ঠাকুর

মকর সংক্রান্তির দিন কৃষ্ণনগরে আমার জন্ম। বাবা তখন সেখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। পল্লীর পৈতৃক বাসভূমি আমার দেখার সৌভাগ্য হয়নি, ভিটে আমাদের ছেড়ে আসতে হয়। ছেলেবেলা কেটেছে শহরে। ষোলো বছর বয়সে ঠাকুর পরিবারে আমার বিয়ে হয়। সে-সময়ে আমার দাদাশ্বশুর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পরিবারে ১১৬ জন লোক; একান্নবর্তী, পৃথক হবার কথা কেউ ভাবতেও পারতেন না।

আমার শ্বশুরকুল ঠাকুর পরিবার এবং পিতৃকুল রাজা রামমোহনের বংশধর। এই দুইটির বিরাট প্রবাহ সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষ দেখবার সুযোগ পেয়েছি— কম ভাগ্যের কথা নয়। রাজা রামমোহনের দুই পুত্র—রাধাপ্রসাদ এবং রমাপ্রসাদ।[১৪] রাধাপ্রসাদের পুত্রসন্তান ছিল না, দুই কন্যা চন্দ্রজ্যোতি.এবং মৈত্রেয়ী। বিলেত যাওয়ার আগে রামমোহন আমার ঠাকুরমা চন্দ্রজ্যোতির বিবাহ দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অসামান্যা সুন্দরী। আমার ঠাকুরদাদা শ্যামলাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদে। কিন্তু সে বাড়ি ছেড়ে দিতে হয়েছিল। তার একটা কারণ পরবর্তীকালে রামমোহনকে হিন্দু সমাজ সমর্থন করেনি। আমার ঠাকুরদা সে ঘরে বিবাহ করাতেই কলকাতায় এসে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। চন্দ্রজ্যোতির পুত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় আমার পিতা।

রামমোহন

ছোটোবেলায় ঠাকুরমার কাছে রামমোহনের কথা শুনেছি। দশ বছরের পৌত্রী পিতামহকে স্পষ্ট মনে রেখেছিলেন, তাঁর কাছে শোনা অনেক ঘটনাই আমার কাছে ঝাপ্সা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিছুটা বা স্মৃতি থেকে সরেও গিয়েছে। দু-একটা যা মনে পড়ে তাই আজ তোমাদের কাছে বলি।

চন্দ্রজ্যোতি বলতেন, কী সুঠাম বলিষ্ঠ ছিল তাঁর দেহ! সকালে নিয়মিত মুগুর ভাজতেন, কুস্তি করতেন। আমার দুঃখ সে চেহারা একালে.কেউ দেখল না। তাঁর স্নানেরও বাঁধা নিয়ম ছিল। একটা জলচৌকিতে তিনি বসতেন— একদিকে থাকত আট-দশটা মোটা পেতলের ঘড়া, অন্যদিকেও আট-দশটা। ডান হাতে একটা ঘড়া

তুলে মাথায় জল ঢালতেন, তারপর বাঁ হাতে— এইভাবে স্নান শেষ করতেন।

রামমোহনের কথা ও কাজ ছিল ঠিক ঘড়ির কাঁটার মতো। বাইরের দালানে তিনি লেখাপড়ার কাজ করতেন। বেশির ভাগ সময়ই থাকতেন ঐ বাড়িতে। দুপুরে আসতেন ভিতর বাড়িতে যেখানে স্ত্রী-ছেলেমেয়েরা থাকতেন। দুপুরের স্নান এবং আহার করতেন এই বাড়িতে । ঘড়িতে বারোটা বাজত—ঠিক সেই সময়টিতে এ বাড়িতে আসতেন। পাঁচ মিনিট আগেও নয়, পাঁচ মিনিট পরেও নয়। বাড়ির ছোটো বড় সবাই তাঁকে ঘিরে বসত। মেয়েরা নানা রকম রান্না করে খাওয়াতেন। রামমোহন বলতেন, সমাজে যতদিন না বাধা দূর করা সম্ভব হচ্ছে—লেখাপড়ার কিছুমাত্র সুযোগ যতদিন না দেওয়া যায়, ততদিন রান্না করলে মেয়েরা কিছুটা আনন্দ পাবে। রান্না করুক, যেরকম ওদের ইচ্ছে। এতেও শিক্ষার দিক আছে। কিন্তু ছেলেদের সমান শিক্ষা ওদের দিতে হবে। তখনকার দিনে ঠাকুর রাখার চলন ছিল না। ধনীর ঘরেই হোক আর মধ্যবিত্ত ঘরেই হোক, পাক করতেন ঘরের মেয়েরা।

মেয়েলী ঘরোয়া কথাও শুনেছি ঠাকুরমার কাছে। রামমোহন ভালোবাসতেন সরু চাক্‌লি আর কড়াইয়ের ডাল। খাওয়ার সময় আমার ঠাকুরমারও একটা কর্তব্য ছিল। আঁচাবার জল তিনি একটা গাড়ু করে এনে বারান্দায় রাখতেন—হাতে থাকত গামছা। আচমন করে তাঁর হাত থেকে গামছাটি নিয়ে রামমোহন হাত-মুখ মুছে আবার তাঁর হাতে দিয়ে দিতেন।

চন্দ্রজ্যোতি আমাদের কাছে বলেছেন—রামমোহন মূর্তি-উপাসনায় বিশ্বাস করেননি—কিন্তু একবার তিনি বিগ্রহের সামনে মাথা নুইয়েছেন। পাষাণ মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন, "মায়ের ঠাকুরকে প্রণাম করি।" এ ঘটনার একটা ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস চন্দ্রজ্যোতি শুনেছিলেন তাঁর মায়ের কাছে। রামমোহনের জননী তারিণী দেবীর দেবভক্তি এতই প্রবল ছিল যে, পুত্র রামমোহনকে বিধর্মী জ্ঞানে পরিত্যাগ করতে পেরেছিলেন। দেশে গেলেন রাজা একদিন মায়ের পদধূলি নিতে। মা পরিষ্কার বললেন, আমার ঠাকুরকে যে সন্তান প্রণাম না করে তার প্রণাম আমি নিতে পারি না।

রামমোহনের সম্পর্কিত এক পিসি শ্বশুরবাড়িতে নানা রকম পারিবারিক উৎপীড়নের মধ্যে ছিলেন—দুঃখের খবর কোনো প্রকারে বাপের বাড়িতে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না। বাড়ির ছোটো ছেলেরা যেত পাঠশালায়, ঘরে ফিরে দেয়ালময় এবং মেঝেতে রামখড়ির আঁক কেটে নোংরা করে রাখত। নিঃশব্দে আত্মীয়া মহিলাটি অক্ষর নিষ্পলক দেখতেন—চেনাও হয়ে গেল। ছেলেরা পাঠশালায় গেলে অবসরে বসে বসে তিনিও রামখড়ি দিয়ে অক্ষরের উপরে দাগা বুলোতেন। সবই আয়ত্তের মধ্যে এসে গেল, প্রথম অক্ষর পরিচয়, পরে ভাষার প্রকাশ। গ্রামের অন্ত্যজ একটি মেয়ে চলেছিল বাপের বাড়ির গাঁয়ে কী একটা কাজে। গোটা গোটা ছাঁদে এক

টুকরো কাগজে তিনি চিঠি লিখে পাঠালেন, সে কাগজ রামমোহনের হাতে পড়ল। চিঠি পড়ে বিস্ময়ে তিনি স্তম্ভিত। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এত বুদ্ধি মেয়েদের ? কিছুই না শিখে এমন একখানি চিঠি লিখে পাঠিয়েছে! সুযোগ দিলে না জানি এরা কত বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারবে। রামমোহন লোক পাঠিয়ে সেই আত্মীয়াকে আনিয়ে নেন এবং দুঃখ মোচনের জন্য যথাসাধ্য করেন।

যে সমাজ-বিপ্লব রামমোহন এনেছিলেন, তার অনেকটা দিকেই আলোকসম্পাত হয়নি। তুচ্ছ বোধেই হয়তো অনেক ঘটনা লিখিত ইতিহাসে স্থান পায়নি। স্থান না পেলেও এই সব স্বল্পবিদিত ঘটনারও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম।

আমার ঠাকুরমার বিবাহ দিয়েছিলেন রাজা তাঁর কলকাতার বাড়িতে। কন্যার পিতা রাধাপ্রসাদকে দিয়ে সম্প্রদান তিনি করাননি। কন্যা-সম্প্রদান করেছিলেন মাতা যজ্ঞেশ্বরী দেবী।

যে-গায়ত্রী মেয়েদের কানে শোনাও নিষিদ্ধ ছিল রামমোহন এনে দিলেন সে মন্ত্র মেয়েদের কণ্ঠে, হৃদয়ে, মনে। রমাপ্রসাদের স্ত্রী দ্রবময়ী দেবী ভোর রাত্রি থেকে মহানির্বাণ তন্ত্রোক্ত ব্রহ্মপ্রতিপাদ্য শ্লোক উচ্চারণ করতেন, আমরা নিজেরা কানে শুনেছি। তিনি নিয়মিত গায়ত্রী জপও করতেন। রামমোহন কুলগুরু প্রথা বন্ধ করলেন; পরিবার থেকে গুরু উঠে গেল। রাজা নিজের দুই স্ত্রীকে ব্রহ্মগায়ত্রী এবং ওঁকার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন স্বয়ং। নিয়মিত বাড়ির মেয়েদের সে মন্ত্র উচ্চারণ করতে হতো। দ্রবময়ী তাঁর শাশুড়ী উমা দেবীর কাছে গায়ত্রী মন্ত্রের দীক্ষা পান। রামমোহনের এ দিকটার কথা তখন বাইরে ছড়িয়ে পড়েনি ; পরিবারের মধ্যেই সংস্কারের সূত্রপাত এবং উদ্‌বোধন।

রাজার সৌজন্যের কথা ঠাকুরমার কাছে শুনেছি। সারা দুপুর বাহির-মহলে কাজ করে বিকেলে পায়ে হেঁটে তিনি বেড়াতে বের হতেন। প্রতিদিন তিনি যেতেন মানিকতলার দিকে প্রায় এক ক্রোশ। সে-সময়ে অন্দরে এসে কিছুক্ষণ বসে যেতেন—কোনো দিনই তার ব্যতিক্রম হয়নি। চেয়ার পাতা হতো তিনটি—দু'খানি দুই স্ত্রীর, একটি নিজের। স্ত্রীরা না বসলে তিনি আসন গ্রহণ করতেন না– সেকালে সে ছিল অভূতপূর্ব ব্যাপার। কৌতূহলী আর-পাঁচজন উঁকি-ঝুঁকি মারত, বলত, দেখ, কর্তাদেওয়ানজী দাঁড়িয়ে, স্ত্রীরা না বসলে বসবেন না। বড়ো স্ত্রী বসবার আগেই একবার ছোটো স্ত্রী এসে চেয়ারে বসেছিলেন, রামমোহন বারণ করে আগে বড়ো স্ত্রীকে বসবার জায়গা করে দিতে অনুরোধ করলেন। বস্তুত ছোটো স্ত্রীর কোনো দোষ ছিল না। রাজা অন্দরে এলে বড়ো স্ত্রী দুয়ার-আড়ালে দাঁড়িয়ে এগিয়ে দিতেন ছোটো স্ত্রী উমা দেবীকে—তুই যা, দেওয়ানজীর সামনে বস গে, আমি বাপু থাকি আড়ালে। রাজার সামনে দিনের বেলায় বেরুতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করতেন। উমা দেবী এগিয়ে আসাতে রাজা বলেছিলেন, দাঁড়াও, তোমার বসা হবে না আগে।

জড়সড় হয়ে বড়ো স্ত্রী সামনে এসে ধীরে ধীরে বসতেন, তারপর বসতেন উমা দেবী, শেষে রাজা।

রামমোহনের মা ছিলেন অসাধারণ নারী। শ্বশুরকুলে তাঁর ডাকনাম ছিল ফুলঠাকুরাণী। বিষয়বুদ্ধি তাঁর এতই প্রখর ছিল যে স্বামী জমিদারির কাজ চালিয়েছিলেন তাঁর পরামর্শ নিযে। বৈধব্যে তিনি স্বয়ং জমিদারি পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। জীবনের শেষ বয়সে মায়ের মন নরম হয়ে আসে। রাজাকে ডেকে বললেন, তোর ধর্ম তুই পালন কর, আমাকে পাঠিযে দে শ্রীক্ষেত্রে। তখন পুরীতে আসতে হতো জলপথে নৌকায়—না হলে পায়ে হেঁটে। রাজা সুবন্দোবস্ত করে এক আত্মীয়া মহিলা সঙ্গে দিয়ে মাকে শ্রীক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন। জীবনান্ত পর্যন্ত তারিণী দেবী পুরীতে বাস করেন। মন্দিরের পাণ্ডাদের খাতায় ফুলঠাকুরাণীর নাম লেখা আছে। তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরের এক-এক ধাপ সিঁড়ি প্রতিদিন সমুদ্র থেকে জল বয়ে এনে নিজের হাতে ধুয়ে দিতেন।

রামমোহনের দ্বিতীয়া স্ত্রী উমা দেবী অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন, তাঁর পুত্র-কন্যা ছিল না। বড়ো স্ত্রীর দুই পুত্র—রাধাপ্রসাদ আর রমাপ্রসাদ। রমাপ্রসাদ বড়ো ভাইয়ের চেয়ে আঠারো বছরের ছোটো ছিলেন, জন্ম থেকেই বিমাতা উমা দেবী রমাপ্রসাদকে পালনের ভার নেন। রমাপ্রসাদ জানতেনই না যে তিনি তাঁর বিমাতা কি গর্ভধারিণী। আমার ঠাকুরমা চন্দ্রজ্যোতি ছিলেন রমাপ্রসাদের সমবয়সী। ভাইঝিকে রমাপ্রসাদ দিদি বলে ডাকতেন, পিঠোপিঠির মতো দুজনের মধ্যে ভাবও ছিল খুব, মারামারিও হতো। শুনেছি, শিশু রমাপ্রসাদকে পিতা রামমোহন পরীক্ষা করার জন্য দুই মায়ের সামনে একদিন বলেছিলেন—কে তোমার মা, বলো তো ? শিশু দৌড়ে বিমাতাকে জড়িয়ে ধরে বললে, এই। বড়ো স্ত্রীর মৃত্যু হয় রাজা দেশে থাকতে; ছোটো স্ত্রী জীবিত ছিলেন রাজার বিলেত যাত্রাকালে। যাওয়ার খবর রাজা তাঁকে দিয়ে যেতে পারেননি। কে জানত যে তিনি আর ফিরবেন না। এই শোক উমা দেবী জীবনে ভোলেননি। এই ঘটনা রাজার পৌত্রীর চোখে দেখা, শোনা খবর নয়।

রাজার বড় ভাই জগমোহনের মৃত্যুর পর স্ত্রীকে সহমরণে যেতে হয়েছিল। সেই অন্ত্যেষ্টি রামমোহন প্রত্যক্ষ করেন। সেই নিদারুণ ঘটনা তাঁকে বিচলিত করে। বাড়ির আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গে তিনিও শ্মশানে গিয়েছিলেন। লালপেড়ে শাড়ি পরে শ্বেতচন্দন সিঁদুর কপালে লেপন করে সতী দাঁড়িয়েছিলেন—গলায় গাঁদাফুলের মালা। চিতা সাজানো হল তাঁরই সামনে। কাঠের উপর শায়িত দেহের উপর আবার কাঠ সাজানো হল—তার উপর স্ত্রীকে এনে বসানো হল। বসা অবস্থায় সর্বাঙ্গ ঢেকে দেওয়া হল কাঠ দিয়ে, শুধু মুখটি রইল অনাবৃত। ঢাক-ঢোল-কাঁসর বেজে উঠল, ভয়জনক জনকোলাহল—ঘি ঢেলে চিতায় আগুন দেওয়া হল। ধোঁয়া আর আগুন। অগ্নিশিখার ফাঁকে ক্ষণিকের জন্য দেখা গেল মেয়েটির ব্যাকুল মুখ; জীবিত

প্রাণী তো! উর্দ্ধমুখে তিনি তাকিয়ে, শরীর কেঁপে উঠল। অগ্নিশিখা আর ধোঁয়ায় তার পরে আর কিছুই দেখা গেল না। স্তম্ভিত হয়ে এ দৃশ্য দেখলেন রামমোহন—বললেন, এ প্রথা, জীবিত লোককে দাহ করা ঈশ্বর-অভিপ্রেত হতে পারে না, প্রতিজ্ঞা করলেন, এ প্রথা রদ করতেই হবে। দিল্লিতে তখন মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহের রাজত্ব। তাঁকে আবেদন জানালেন, সতীদাহ এবং গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন রদ করতে হবে—সাহায্য চাই। বাদশাহের নিজেরও সমর্থন ছিল, দুই কাজই যাতে সম্পন্ন হয় সেই উদ্দেশ্যে তাঁকে অর্থ দিলেন, রাজা উপাধিতে ভূষিত করলেন, বিলেতে গিয়ে আবেদন করার সব ব্যবস্থাও হয়ে গেল।

তখন সুয়েজ খাল তৈরী হয়নি, যেতে হতো আফ্রিকা ঘুরে। একবার গিয়ে ঘুরে আসা অনেক সময়েই সম্ভব হতো না। রামমোহনেরও তাই হয়েছিল। বিলেত গিয়ে তিনি ফিরে আসতে পারেননি। ব্রিস্টল শহরে দেহরক্ষা করেছিলেন।

ব্রিস্টলে অন্তিমকাল যখন সমাগত, রামমোহন মেরি কার্পেন্টারকে শয্যাপার্শ্বে ডাকলেন, গলা থেকে যজ্ঞোপবীত খুলে তাঁকে দিলেন। বললেন, "আমার মরদেহ নিয়ে এদেশে যেভাবেই অন্ত্যেষ্টি হয় হোক, কিন্তু এই যজ্ঞোপবীত আমার ধর্মের, আমার জাতীয় প্রতীক। তুমি এটা যত্ন করে রেখে দিও।"

মেরি কার্পেন্টার এই উপবীত পরে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এখন রামমোহন লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে।

ব্রিস্টলের বাড়ির মধ্যেই একটা বড় গাছের নীচে রামমোহনের সমাধি দেওয়া হয়েছিল। পরে দ্বারকানাথ ঠাকুর যখন দ্বিতীয়বার বিলেত যান তখন তিনি শবাধার তুলে এনে ব্রিস্টলের সাধারণ সমাধিস্থানে রাখবার ব্যবস্থা করেন। তিনি ভারতীয় ভাস্কর্যের অনুকরণে সমাধিমন্দিরটি স্থাপন করেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পেই তিনি দ্বিতীয়বার বিলেত দান।

রোমে সেন্ট পল্‌স্‌ ক্যাথিড্রালের উপাসনায় রামমোহন যোগ দিয়েছিলেন। ভারতীয়দের পোশাকেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। পোপের সঙ্গেও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল, উপাসনার পূর্বে তাঁকে বলা হল ক্যাথিড্রালের উপাসনার সময় টুপি খুলে রাখতে হয়; তিনিও যেন তাঁর শামলা ঐ সময়টুকুর জন্যে খুলে রাখেন—রামমোহন সম্মত হননি। ভারতবর্ষের প্রথা সর্বভূষণে সজ্জিত হয়ে দেবতার পূজা করা। এই প্রথানুযায়ী তিনি শামলা খুললেন না। রামমোহনের কথা যুক্তিযুক্ত বলে ধর্মযাজক মনে করেছিলেন। তাঁকে পূর্ণ ভারতীয় সাজে প্রার্থনায় যোগ দিতে দেওয়া হয়েছিল।

এর অনেকদিন পরের কথা, আমার দাদা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়[৫] যখন ভেটিক্যানে যান সে সময়ে পোপের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলে পোপ খুবই প্রীত হন। পোপ তাঁকে বলেছিলেন—

—তুমি খৃষ্টকে ভালোবাসো ?

—হ্যাঁ, ভালোবাসি।

—খৃষ্টান ধর্ম ভালোবাসো ?

—হ্যাঁ, ভালোবাসি।

—তবে কেন তুমি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করো না ? ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, আমি নিজে তোমাকে ব্যাপটাইজ করব।

—খৃষ্টকে ভালোবাসি, ভালোবাসি খৃষ্টান ধর্ম কিন্তু ধর্মান্তরের ইচ্ছে নেই।

পোপ তাঁকে বললেন, সেন্ট পল গির্জার বেদীতে তুমি নতজানু হয়ে রাত্রে প্রার্থনা করে দেখো। যদি তোমার মধ্যে মনের বা ভাবের কিছু পরিবর্তন হয় তো আমাকে বলো। যদি ইচ্ছে হয় তো ধর্ম গ্রহণ করতে পার। আমার দাদা বেদীর সামনে নতজানু হয়ে সমস্ত রাত অতিবাহিত করলেন। ধ্যান করলেন। কিন্তু ধর্মান্তর গ্রহণের ইচ্ছে তাঁর মধ্যে জাগ্রত হয়নি। প্রাতে পোপকে সে কথা তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৩০ সালে আমি ভেটিক্যান গিয়েছিলুম—দাদার স্মৃতি আমার মনে ছিল। আমিও রোমের সেন্ট পল গির্জার বেদীর সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলুম—ভগবানের নাম স্মরণ করলুম—তবে সে অল্প সময়ের জন্য।

মহর্ষি

বিয়ের পর উঠলুম জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। বৃহৎ পরিবার বললেও ছোট করে বলা হবে। আমার শ্বশুর সাতজন; পিসশাশুড়ী চারজন, পিসশ্বশুর সকলেই ছিলেন ঘরজামাই। মহর্ষির চাকরের সংখ্যা তখন দেখেছি ১৬! আমার স্বামী বলতেন, মরে ভৃত্যবৎসল, কর্তাদাদার চাকর হয়ে জন্মাব। নাতিরা কথাটা যা বলতেন তার অর্থ আছে। মহর্ষির তীক্ষ্ণ নজর ছিল চাকরদের যেন অতিরিক্ত পরিশ্রম না করানো হয়। বিশ্রামের নির্দিষ্ট দিন বাঁধা ছিল। তা ছাড়া তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন চাকররা কেউ দুই ঘন্টার বেশী এক নাগাড় পরিশ্রম করবে না। এই ভৃত্যবাৎসল্য পরম্পরায় দেখেছি ছেলেদের মধ্যেও।

ঠাকুর এস্টেটের সরকার জগন্নাথবাবুর অসুখ। অসুখ আর সারে না। ডাক্তার দেখে বললেন, যক্ষ্মা। তখনকার দিনে এ-ব্যাধি ছিল দুরারোগ্য। বাড়ির ডাক্তার বললেন, কোথাও পাঠিয়ে দাও, বাড়িতে এ রোগী রাখা বিপজ্জনক। কিন্তু জগন্নাথ সরকারের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার বা দেখাশোনা করার কোনো নিকট আত্মীয় ছিল না। রবীন্দ্রনাথ বললেন, না, ওকে বাড়িতে রেখেই চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। বিচিত্রা বাড়ির একতলার কোণার ঘরে তার সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা হল। সমস্ত খরচ কাকামশাই করেছিলেন।

বিয়ে করে উঠেছি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। কিন্তু মহর্ষি তখন ৫৫ পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে বাস করতেন। আমার স্বামী দ্বিপেন্দ্রনাথের সঙ্গে মহর্ষিকে প্রণাম করতে যাই। পকেটে আকবরী মোহর আগে থেকেই রাখা ছিল—তারই দুটো দিয়ে আমাকে, আর দুটো দিয়ে বড় নাতিকে আশীর্বাদ করলেন। পার্ক স্ট্রীটের বাড়িতে পরে আমিও গিয়ে বছরখানেকের বেশী থেকেছি।

বেশির ভাগ সময়ই মহর্ষি হাতজোড় করে ধ্যানে বসে থাকতেন। খুব সকালের দিকে কুক কোম্পানির ভাড়া করা ঘোড়া আসত, মহর্ষির ল্যাণ্ডোবডির গাড়ি ছিল, তাইতে করে একটু বেড়িয়ে আসতেন। তা-ছাড়া সমস্ত দিনই বাড়িতে থাকতেন। কাজ চলত সব বাঁধা নিয়মে। জমিদারির বা সংসারের হিসাব রাখতেন আমার স্বামী দ্বিপেন্দ্রনাথ।

ধার্মিক পরিবারে আমার জন্ম। বাপের বাড়ির ধর্মগুরু ছিলেন পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী। আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার সঙ্গে শৈশবকাল থেকেই আমার কিছুটা পরিচয় ছিল। মহর্ষি একদিন আমায় ডেকে বললেন—তুমি আমার কাছে রোজ আসবে—বেলা ১টা থেকে ২টা—এক ঘন্টা। সে সময়ে আর কেউ থাকবে না।

প্রথম দিনে বললেন—মেয়েরা পুতুল-খেলা করতে ভালোবাসে। সেই দিকেই ওদের ঝোঁক। আমি দেখছি, তুমি সে স্বভাবের মেয়ে নও, ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী তুমি। বললেন, তোমাকে পড়তে হবে, আমি ব্যবস্থা করে দেব।

আদি ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়[১৬]—বিকেল চারটার সময় তিনি আমাদের বাড়ি আসতেন। আমার সঙ্গে অন্যান্য বউরা এবং মেয়েরা ঐ পাঠে যোগ দিতেন। হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন আমায় উপনিষদ্ পড়াতে আরম্ভ করলেন। সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের[১৭] অনূদিত ১০টি উপনিষদের বই তাঁর কাছে পড়ি। মহর্ষি বললেন, বৃহদারণ্যকের বাংলা অনুবাদ নেই, সে-বই সংস্কৃত থেকে পড়তে হবে। বইয়ের দাম ২০ টাকা, বোম্বে থেকে আনিয়ে নিতে হবে।

মহর্ষি এই সময়ে প্রতিদিন আমাকে ধারাবাহিকভাবে বৃহদারণ্যকের কথা বাংলায় ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। এর পরে নাতি বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর[১৮] মহর্ষি নিয়মিত বৃহদারণ্যক পাঠ করে বাড়ির সকলকে শুনিয়েছেন।

পার্ক স্ট্রীটের বাড়িওয়ালা মহর্ষিকে বলল—ছাত সারাতে হবে। কিছুদিনের জন্য এ-বাড়ি আপনাকে ছাড়তে হবে। মহর্ষির শরীর তখন ভেঙে পড়েছে। বললেন,টানা-হেঁচড়া করে কি হবে। জোড়াসাঁকোর বাড়িতেই শেষ পর্যন্ত থাকব।

নির্বাণের দিন সকাল থেকে সমস্ত ছেলেরা-নাতিরা নুয়ে পড়ে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। শহরের সেরা ডাক্তার স্যাণ্ডহার্স্ট আগে থেকেই দেখে গেছেন। বোঝা গেল, অন্তিম কাল আসন্ন। প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মাথার কাছে বসে বলতে লাগল, ওঁ ব্রহ্ম, ওঁ ব্রহ্ম। মহর্ষি উচ্চারণ করতে পারলেন না, শুধু ঠোঁট নড়ে উঠল। শেষ। দেখেছি, রবীন্দ্রনাথকে

মহর্ষির পায়ের উপর পড়ে কী কান্না। তাঁকে সরানো যায় না। স্যান্ডহার্স্ট ডাক্তার শুধু বললেন, হোয়াট এ ওয়াণ্ডারফুল ম্যান! মহর্ষির পিঠে বেড-সোর হওয়াতে শেষের দিকে খাটে শুতে পারতেন না। কৌচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানেই শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এই কৌচ সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর বাবাকে দিয়েছিলেন।

মহর্ষি হিমালয় যেতেন অধ্যাত্ম চিন্তায়। কিন্তু যাওয়া যোগী সন্ন্যাসীর মতো নয়। সে ছিল একেবারে পুরোপুরি গৃহীর স্থানে বদলানো। ড্যালহৌসি, সিমলা বা মসৌরী পর্বতে আগে লোকজন যেত, বাড়ি ঠিক হতো। রান্নাবান্নার পুরো ব্যবস্থার পর তিনি যেতেন।

মহর্ষিকে দেখেছি, প্রধানত দুধ খেতেন—তা-ছাড়া যতদিন আম থাকত, ততদিন আমের রস খেতেন, আমরা, ঘরের বউরা জানতুম, ছাঁচি কুমড়োর মোরব্বাও তাঁর প্রিয় ছিল।

মহর্ষি জোড়াসাঁকোতে যখন পার্ক স্ট্রীট থেকে উঠে এলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে ঐ বাড়ির তেতালায় ছিলেন—সমস্ত তেতালাটাই ছেড়ে দিতে হল। মহর্ষি তখন বিচিত্রা বাড়িটা তৈরি করিয়ে রবীন্দ্রনাথের নামে লিখে দিলেন।

স্বামী

মহর্ষির জ্যেষ্ঠ নাতি দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমার বিবাহ হয় ১১ই বৈশাখ। আমার তখন ১৬ বছর চার মাস বয়স। বিবাহের ৮ দিন পরে শান্তিনিকেতনে আসি। সেই আমার প্রথম শান্তিনিকেতনে আসা। তখনো ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়নি, কিন্তু আমার স্বামীকে প্রায়ই সেখানে আসতে হতো। তাঁরই তত্ত্বাবধানে তখন শান্তিনিকেতন মন্দির তৈরি হচ্ছিল।

সন্ধ্যার অল্প আগে আমরা চারজন বোলপুর স্টেশনে এসে নামলুম। আমার সঙ্গে দিনু নলিনী। একটা পালকিতে রইলুম আমি আর নলিনী, আর ওঁরা দুজন বাপ-ছেলে, গরুর গাড়িতে।

বোলপুরের নীরব শান্ত ভাব আমার হৃদয় জয় করেনি। তখন ভাবিনি, দীর্ঘ ৬৫ বৎসরকাল আমার এই নির্জন প্রান্তে কাটবে—এই ক্ষুদ্র স্থান এত বিরাটরূপে প্রকাশিত হবে।

মহর্ষি তাঁর প্রত্যেক ছেলেকে জমিদারির আয় থেকে মাসিক টাকা দিতেন তিনশত করে। আমার শ্বশুর দ্বিজেন্দ্রনাথের অনেক ছেলেমেয়ে—শুধু তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল ৬০০ টাকা। এ-ছাড়া খরচের জন্য মহর্ষি রাখতেন বাৎসরিক ৫০০০০ টাকা। এর নাম ছিল স্বতন্ত্র তহবিল। এই ক্যাশ পরিচালনার ভার দিয়েছিলেন তিনি তাঁর বড়ো নাতির উপর। এ-কাজের জন্য তাঁর বৃত্তি ছিল মাসিক দেড়শত টাকা।

মহর্ষির দান-ধ্যান সবই এই স্বতন্ত্র তহবিল থেকে দেওয়া হতো।

প্রিন্স দ্বারকানাথের বড়ো নাতির বড়ো ছেলে আমার স্বামী। সেই সূত্রে দ্বারকানাথের ব্যবহৃত কয়েকটি জিনিস স্বামীর জিম্মায় আসে। কুইন ভিক্টোরিয়া যে-দুটি মেডেল দিয়েছিলেন, দ্বারকানাথ নামাঙ্কিত সোনার ঘড়ি এবং একটি সোনার আতরের কৌটো এই জিনিসের মধ্যে ছিল। আতরের কৌটোটি একটি মাদার-অফ-পার্লের কেসে রক্ষিত ছিল—শুনেছি, এই আতর সব সময় প্রিন্সের পকেটে থাকত। স্বামীর মৃত্যুর পর আমার মনে হল, এসব সংগ্রহ দিনুর কাছেই থাকা উচিত—আমি দিয়ে দিলুম। অনেকদিন পরে প্রশ্ন করায় দিনু আমাকে বলেছিল, ঐ মেডেল দুটি দিনু কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সংগ্রহে দান করেছে।

আমার স্বামী আর স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন বাল্যবন্ধু। একই সঙ্গে এঁরা জেনারেল অ্যাসেম্বলি স্কুল থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেন। সন্ন্যাস-ধর্ম নেওয়ার আগে তিনি প্রায়ই আমার স্বামীর কাছে আসতেন, কিন্তু পরে দেখা সাক্ষাৎ হতো মধ্যে মধ্যে। এনট্রান্স পাশ করে স্বামী আর পড়লেন না, বিবেকানন্দ কলেজে ভর্তি হলেন। বিবেকানন্দ যখন বাল্য বয়সে আমার স্বামীর কাছে এসেছেন, তখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেননি — সে আমি দেখিনি। কিন্তু পরে বিবেকানন্দ আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসেছেন, পরনে গেরুয়া বসন, মাথায় পাগড়ি। আসতেন মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে। আলাপ-আলোচনা করে চলে যেতেন। বিবেকানন্দের বোন প্রিয়ম্বদা স্কুলে আমার সঙ্গে পড়তেন। আমরা ছিলুম রামবাগানের ডাফ স্কুলের ছাত্রী; স্কুলের নিজস্ব ঘোড়ার বাস-গাড়ি ছিল— তাইতে ছাত্রীদের আসবার ব্যবস্থা ছিল।

দিনেন্দ্রনাথের মা সুশীলা দেবী ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যা। সমস্ত অলঙ্কার তিনি খুলে রেখে শুধু একগাছি চুড়ি হাতে রাখতেন। আমার গুরু ছিলেন শিবনারায়ণ স্বামী। এই কথার উল্লেখ করে মহর্ষি আমার স্বামীকে একদিন ডেকে পাঠান। তিনি বলেছিলেন, তোমার আমার যে-ধর্মবিশ্বাস, তাতে এঁদের কেন অনুপ্রাণিত করতে পারো না! আমার স্বামী উত্তর দিয়েছিলেন, আমি বিয়ে করেছি সে ইহলোকের, পরলোকের জন্য নয়।

আমার মনে আছে, শিকাগো পার্লামেন্ট অফ রিলিজন থেকে ফিরে এসেই বিবেকানন্দ জোড়াসাঁকোতে এসে মহর্ষির সঙ্গে দেখা করেন। কী কথা হয়েছিল, আমার জানা নেই। তবে শুনেছি, শিকাগো বক্তৃতার সম্পর্কে আমার দাদার কথা বিবেকানন্দ বারবার উল্লেখ করেছিলেন। আমার দাদা মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় বিদেশে পাঁচ বৎসরাধিক কাল ছিলেন। প্রথম তিন বছর য়ুরোপে, তারপর আমেরিকায়। সেখানে তিনি গীতার অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। বিবেকানন্দ বলেছিলেন, বেদান্ত বা হিন্দু দর্শন সম্পর্কে শিকাগোতে আমি যা বলেছি, তা কেউই বুঝতে পারতেন না, যদি না তাঁদের মধ্যে কিছুটা ব্রহ্মজ্ঞান হতো। সেটা হতে পেরেছিল মোহিনীমোহনের

গীতার অনুবাদ থেকে।

রামকৃষ্ণ এবং মহর্ষির মধ্যে পরস্পরের গভীর আকর্ষণ দেখেছি। সে ঘনিষ্ঠতা শেষ দিন পর্যন্ত ছিল। মৃত্যুর আগে মহর্ষি যখন জোড়াসাঁকোর বাড়ির তিনতলায় আছেন—সে সময়ের একদিনের কথা আমার পরিষ্কার মনে আছে। পরিষ্কার কেন মনে আছে, সে কথা বলি— রামকৃষ্ণ এসেছেন মহর্ষির সঙ্গে দেখা করতে। সকাল বেলা। আধ ঘন্টা মতো তত্ত্ব আলোচনার পর রামকৃষ্ণ নেমে এলেন। সে-আলোচনায় আমরা যাইনি। সব আলোচনা কথাবার্তার সময়ে আমরা বাড়ির বউরা যেতুমও না। নীচে নেমে এসে রামকৃষ্ণ ঠাকুর দালানে এখন যেখানে গানের বেদী, সেখানে বসলেন। এসে কিছুক্ষণ বাদেই সমাধিস্থ। সমাধিস্থ হওয়া আমরা কখনো দেখিনি। বেশ কিছুক্ষণ বাদে গাড়ি করে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল।

দিনেন্দ্রনাথ

দিনেন্দ্রনাথের মা সুশীলা দেবী খুবই সুন্দর গান গাইতে পারতেন। মায়ের কাছেই দিনেন্দ্রনাথের গান শেখার গোড়াপত্তন। দিনুর মায়ের কাছেই শুনেছি যে,ও চার বছর বয়সের সময় থেকেই গান শিখতে শুরু করে এবং মায়ের গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান করত। কাশিয়াবাগানে স্বর্ণকুমারী দেবীর বাড়িতে একদিনের কথা মনে পড়ে, সুশীলা দেবী হারমনিয়াম বাজাচ্ছেন আর দিনু গাইছে—

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি...

সে-গান এখনো কানে বাজছে। বিয়ে না হলেও তখন ও-বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা ছিল। প্রথম দিকে সরলা দেবী, ইন্দিরা দেবী গান তৈরী করে দিনুকে শেখাতেন।

দিনু ম্যাট্রিক দেবার পর শান্তিনিকেতনে যাওয়া-আসা করত। স্থায়িভাবে বাস করেছে বিলেত থেকে ফিরে, স্থায়িভাবে বাস করার আগে থেকেই রবীন্দ্রনাথ দিনুকে ডেকে গান শিখিয়ে দিতেন, পাছে ভুলে যান। দিনু এসে উঠত নীচু বাংলার বাড়িতে—সেখানে এসেও রবীন্দ্রনাথ গানের সুর শিখিয়ে গেছেন। সে যে কত গান, তার হিসাব কে রেখেছে!

গান শেখাতেন রবীন্দ্রনাথ। সুর সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন বা কোনো পরিবর্তনের প্রস্তাব দিনুকে দিতে দেখিনি। দিনু ছিল ছাত্র, শ্রুতিধর,আর রবীন্দ্রনাথ শিক্ষক, সুরকার।

পরিশিষ্ট

ব্রাহ্মিকাগণ কর্ত্তৃক মিস মেরী কার্পেন্টারের অভ্যর্থনা

উপরোক্ত পরোপকারিণী সদাশয়া মহিলা গত ৬ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার দিবস কলিকাতা মহানগরীতে উপনীত হইয়াছেন। তিনি যে মহৎ অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন তাহা আমাদিগের পাঠিকাগণ পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন। তিনি এখানে আসিয়া ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তীর[১১] বাটীতে অবস্থিতি করিতেছেন। এখানকার যাবতীয় বালিকাবিদ্যালয় দর্শন করা এবং স্ত্রীশিক্ষানুরাগী ও দেশহিতৈষী ব্যক্তিদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্ত্রীগণের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সদুপায় নির্দ্দেশ করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি অবিলম্বেই তৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১০ই অগ্রহায়ণ শনিবার দিবস বেলা চারটার সময় তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মিকাসমাজ দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি সমাজ বাটীর দ্বারে শকট হইতে অবতরণ করিয়া যৎকালে বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছিলেন, কতিপয় ব্রাহ্মিকা দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া সাদরে এবং সসম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি সমাজ গৃহে প্রবৃষ্ট হইলেন এবং তথায় ব্রাহ্মিকাদিগের সহিত নানা প্রকার সদালাপ করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মিকাদিগের মধ্যে ইংরাজীতে কথা কহিতে প্রায় কেহই সমর্থা ছিলেন না এবং মিস কার্পেন্টারও বাঙ্গালা ভাষার কিছুই জানিতেন না। ব্রাহ্মিকা-বিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন শিক্ষিকা মিস পিগট তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তাহাদিগের পরস্পরের কথা বুঝাইয়া দিয়া অত্যন্ত উপকার করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সমাজের কার্য্য আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মিকাগণ প্রশান্ত এবং সমাহিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিলেন। পবিত্রমূর্ত্তি আচার্য্যদ্বয় বেদীতে আসীন হইলেন। মেরী কার্পেন্টার এবং কুমারী পিগট এক দিকে উপবিষ্ট হইলেন। সকলই নীরব এবং নিস্তব্ধ হইল। আচার্য্য বেদী হইতে পরব্রহ্মের অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ; এবং উপাসনা কার্য্য শেষ হইবার সময় মেরী কার্পেন্টারের অদ্য এখানে উপস্থিতির নিমিত্ত কিছু বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই।—

> প্রকৃত প্রীতির দেশ কাল কোন ব্যবধান নাই। মিস মেরী কার্পেন্টারের অদ্য এই স্থানে উপস্থিতি তাহা প্রমাণ করিতেছে ; তিনি স্বদেশ এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া কষ্ট এবং ব্যয় স্বীকার করতঃ এই অপরিচিত দেশে আগমন করিয়াছেন। তিনি যাবজ্জীবন অবিবাহিতা থাকিয়া এবং ধর্ম্ম-পরায়ণা হইয়া পৃথিবীস্থ নানাস্থানের স্ত্রীলোকদিগের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। সেই সাধু ইচ্ছার বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি ভারতবর্ষের এবং এই বঙ্গদেশের দুর্ভাগা ভগ্নীদিগের উন্নতি সাধন করিবার জন্য অদ্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ভগ্নীগণ! তোমরা তাঁহার সেই উপকার গ্রহণের যেন উপযুক্ত হও। এখানকার স্ত্রীদিগের যে প্রকার হীনাবস্থা তাহা তিনি অদ্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ঈশ্বর তাঁহার এই সাধু কার্য্য সকল সফল করুন।

অনন্তর একজন ব্রহ্মপরায়ণ আচার্য্যের সহিত এক কোমল-হৃদয়া পবিত্রচিত্ত ব্রাহ্মিকা

এই সঙ্গীতটী গান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদিগের পশ্চাৎ আরো কতিপয় ব্রাহ্মিকা মৃদু-মন্দ স্বরে যোগ দিয়াছিলেন।

রাগিণী —বিভাস

তোমার কন্যা সকলে পিতা গো ডাকে কাতরে।
বদ্ধ হয়ে আছে তারা দিবানিশি কারাগারে।
সহিতে না পারি দুখ, বিদরি যাইছে বুক, কোথায় না পাই সুখ,
ডাকিছে নাথ তোমারে।
তোমার করুণাগুণে, তার এ-দুঃখিনীগণে, থাকি তাহাদের সনে
বল বিতর অন্তরে।

এমন পবিত্র উপাসনার অবস্থায় সরলহৃদয় ব্রহ্মনিষ্ঠা ব্রাহ্মিকাগণের মুখবিনির্গত বিশুদ্ধ সঙ্গীত, উপস্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রায় কেহই কখন শ্রবণ করেন নাই; সুতরাং সেই অশ্রুতপূর্ব্ব সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণে অধিকাংশ লোকের হৃদয় আধ্যাত্মিক ভাবে বিগলিত হইয়াছিল।

উপাসনা কার্য্য শেষ হইলে একটী ব্রাহ্মিকা দণ্ডায়মানা হইয়া এই পত্রখানি পাঠ করিলেন এবং কুমারী কার্পেণ্টারের হস্তে প্রদান করিলেন।

অভ্যর্থনাপত্র।
কুমারী শ্রীমতী মেরী কার্পেণ্টার
মাননীয়াসু।

মহাশয়া

আপনি আমাদের এবং আমাদের দেশস্থ ভগ্নীদিগের হিতসাধন জন্য যে এত কষ্ট স্বীকার করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন তজ্জন্য আমরা হৃদয়ের সহিত আপনাকে ধন্যবাদ করি। ঈশ্বর আপনার সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

সৌদামিনী
যোগমায়া চক্রবর্ত্তী
যোগমায়া গোস্বামী
রুক্মিণী মহলানবীস
কাদম্বিনী গুপ্ত
মহামায়া বসু
গোলাপী গুপ্ত
রাজলক্ষ্মী সেন
কুমারী অন্নদা লাহিড়ী
কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী

কলিকাতা
১ লা অগ্রহায়ণ

বিরাজমোহিনী সিংহ
জগন্মোহিনী সেন
মুক্তকেশী ভাদুড়ী
কামিনী গুপ্ত
রাজকুমাবী বন্দ্যোপাধ্যায়
পতিতপাবনী দত্ত
সৌদামিনী
বারাণসী
নিত্যকালী ঘোষ
ব্রহ্মময়ী
শ্যামাসুন্দবী (২১)

অতঃপর এই পত্রেব লিখিত বিষয় ইংরাজীতে মেরী কার্পেণ্টারকে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। তিনি পত্রখানি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মিকাদিগকে বলিলেন—

আমি তোমাদিগের প্রদত্ত এই পত্রখানি আদরের সহিত গ্রহণ করিলাম। আমি আশা করি নাই যে উপাসনাব জন্য এরূপ স্ত্রীসমাজ এখানে দেখিতে পাইব। এইরূপ সমাজের সংখ্যা এখানে বৃদ্ধি হউক। আমি তোমাদিগকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। তোমাদিগের এবং ইংলণ্ড-বাসিনী স্ত্রীদিগের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রীতি হইবার যে বাধা ছিল, অদ্য সেই বাধা দূর হইল এবং পরস্পরের প্রীতি বন্ধনের সূত্রপাত হইল।

অনন্তর, মেরী কার্পেণ্টারের নিমিত্ত ব্রাহ্মিকাগণ আতা, আনারস, দাড়িম, পেস্তা, বেদানা প্রভৃতি বিবিধ সুস্বাদু ফল এবং উত্তম উত্তম মিষ্ট দ্রব্যের আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। জননী সদৃশ বৃদ্ধা কার্পেণ্টার কন্যাসম ব্রাহ্মিকাগণে পরিবৃত হইয়া ঐ সকল খাদ্য দ্রব্যের কিয়দংশ আপনি ভক্ষণ করিলেন, এবং ব্রাহ্মিকাদিগকে ভক্ষণ করিতে দিলেন। পরিশেষে নানাপ্রকার বিষয়ে কথা বার্ত্তা কহিয়া তিনি ব্রাহ্মিকাদিগকে তাঁহার আবাসে সোমবার দিবস যাইতে নিমন্ত্রণ করিলেন এবং ব্রাহ্মদিগকে সস্ত্রীক হইয়া সেই দিবস যাইতে বারম্বার অনুরোধ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মতি গ্রহণ করিলেন। পরে রাত্রি অনুমান সাতটার সময় তিনি ব্রাহ্মিকা ও ব্রাহ্মদিগের নিকট বিদায় লইলেন।

কুমারী কার্পেণ্টার গমন করিলে পর, ব্রাহ্মিকাগণ পরস্পরের মধ্যে স্বাধীন ভাবে বিশুদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি দ্বারা আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের পবিত্র স্বাধীন ভাব দেখিয়া অনেকেরই মনোমধ্যে বিশুদ্ধ হর্ষের উদয় হওয়াতে, একজন, ব্রাহ্মিকাদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, আজ আপনাদের পবিত্র ভাব দেখিয়া আমাদিগের অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে। অতএব (কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া) আমাদিগের সকলের হইয়া ইনি আমাদিগের মনের ভাব আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিবেন।

অতঃপর সেই উন্নত ও পবিত্রভাবসম্পন্ন শান্তপ্রকৃতি পুরুষ উৎসাহপূর্ণ উপদেশবাক্যে

ব্রাহ্মিকাদিগকে উদ্বোধন করিলেন। তিনি এইরূপ ভাবে অনেক কথা বলিলেন।—

অদ্য তোমাদিগের মনে যে প্রকার পবিত্র স্বাধীনতার ভাব উদয় হইয়াছে, তোমরা তাহার মত কার্য্য কর। আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যে-প্রকার নীচ অপবিত্র লজ্জার ভাব আছে, তাহা অদ্য হইতে তোমরা দূর কর। তোমরা জড়বস্তু নও, পশুও নও যে, স্বামী যাহা বলিবে তাহাই করিবে। আমরা তোমাদিগকে সেরূপ নীচভাবে শিক্ষা দিতে চাহি না। আমাদিগের ন্যায় তোমাদিগেরও চিন্তা কার্য্য সকল বিষয়ে তুল্য স্বাধীনতা আছে। তোমরা যাহা ভাল জ্ঞান কর, তাহাই কর ; আমাদিগের তাহাতে বাধা দিবার কোন অধিকার নাই। তোমরা যদি ধর্ম্মপরায়ণা হও, হৃদয়ের পবিত্রতা সাধন কর, উন্নত ও ত্যাগশীল ভ্রাতাদিগেব কার্য্যকে ভাল বলিয়া স্বীকার কর এবং তাহাদিগের ন্যায় উন্নত ও পবিত্র হইয়া বঙ্গবাসিনী চিরদুঃখিনী ভগ্নীগণের উন্নতি সাধন ব্রতে ব্রতী হও, তাহা হইলে আমরা আনন্দিত হইব। যদি সেরূপ না হও কি করিব। তোমাদের দুঃখ হইবে, আমাদিগেরও দুঃখ হইবে। আমরা তোমাদিগের মতে চালিত হইতে পারি না এবং তোমরাও শুদ্ধ আমাদিগের আদেশে চালিত হইতে পার না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

তিনি বক্তব্য বিষয় শেষ করিয়া ব্রাহ্মিকাদিগকে বলিলেন, আপনাদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের উপাসনা করিবার মনের ভাব হইয়াছে, তাঁহারা এখন উপাসনা করিতে পারেন। কিয়ৎক্ষণ সকলই নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে তিন চারিটী ব্রাহ্মিকা অতি মৃদুস্বরে কাতর ভাবে পরব্রহ্মের অর্চ্চনা এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেন। ব্রাহ্মিকাগণের এরূপ পবিত্র স্বাধীন ভাব দর্শনে সকলই পুলকিত হইলেন। পরিশেষে উপস্থিত ব্রাহ্মভ্রাতাগণ পরস্পরের সহধর্ম্মিণীর সহিত পবিত্র হৃদয়ে ভ্রাতৃ ভগিনীভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সম্ভাষণ করিয়া এবং উপদেশছলে মনোগত বিশুদ্ধ ভাব সকল ব্যক্ত করিয়া ক্রমে ক্রমে আপন আপন গৃহে গমন করিলেন।

* *বামাবোধিনী পত্রিকা*, অগ্রহায়ণ ১২৭৩

বেথুন বালিকাবিদ্যালয়

আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম যে এদেশের সর্ব্বপ্রধান বেথুন বালিকাবিদ্যালয়ে এক্ষণে ৩০টী মাত্র ছাত্রী অধ্যয়ন করিতেছে। এই বিদ্যালয়ের যে প্রকার সুন্দর অট্টালিকা এবং ইহার শিক্ষা ইত্যাদি কার্য্যে যেরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে, বঙ্গদেশের মধ্যে এরূপ বালিকাবিদ্যালয় আর নাই। মহাত্মা বেথুন সাহেব এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত বহু ব্যয় ও শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই বিদ্যালয়টী বঙ্গদেশে স্থাপিত করেন। ইহার ন্যায় প্রাচিন বালিকাবিদ্যালয়ও অতি অল্প আছে। কিন্তু ইহার অর্থ প্রভৃতি সকল বিষয়ে যথেষ্ট সুবিধাসত্বেও ইহার শিক্ষোন্নতির বিবরণ সন্তোষকর শুনা যায় না। "ফ্রেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদ পত্র লিখিয়াছে যে এই বিদ্যালয় উনিশ বৎসর স্থাপিত হইয়াছে, এই সময়ের মধ্যে গবর্ণমেন্টের

ইহার শিক্ষা কার্য্যে (১,৪২,৭৭৬) এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার সাতশ ছিয়াত্তর টাকা ব্যয় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ইহার সংস্থাপক এককালে ৬০,০০০ ষাটি হাজার টাকা দান করেন এবং প্রতি তিন বৎসর অন্তর বাটীর সংস্কার কার্য্যেও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হয়। এরূপ প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া যখন শুদ্ধ ৩০টী মাত্র সাত আট বৎসর বয়স্কা বালিকার সামান্য শিক্ষা লাভ হইতেছে তখন ইহাতে অর্থের কেবল অপব্যয় হইতেছে বলিতে হইবে। উক্ত পত্র আরো বলিয়াছে যে বেথুন বালিকাবিদ্যালয়সভার সভ্যগণ এইরূপ শিক্ষাফলের জন্য যে বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা বিবি মিস্ পিগটের প্রতি দোষার্পণ করিয়াছেন তাহা অন্যায় কার্য্য হইয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার দোষে শিক্ষার ফল এরূপ হয় নাই। তিনি যে সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এবং সম্পাদকের দোষেই এইরূপ অনুন্নতি হইয়াছে বিলক্ষণ প্রতীত হয়। তিনি বলেন যে ছাত্রীদিগের নিকট হইতে বেতন গ্রহণের নিয়ম করায় এবং পরীক্ষান্তে বর্ষে বর্ষে তাহাদিগের উৎসাহার্থে পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য এককালে স্থগিত হওয়ায় এবং অপর কতিপয় বিষয়ে সম্পাদকের নিতান্ত অমনোযোগ ও শৈথিল্য প্রকাশ পাওয়ায় বিদ্যালয়ের এই বর্ত্তমান দুর্গতি হইয়াছে।

এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের নিমিত্ত মিস্ পিগটকে আমরা যে প্রকার যত্নবতী দেখিতে পাই তাহাতে তাঁহার ন্যায় বঙ্গবালাগণের হিতৈষিণী বিদেশীয়া স্ত্রীলোক প্রায় দেখা যায় না। অতএব তাঁহার অযত্নে যে বিদ্যালয়ের এরূপ অবস্থা হইয়াছে আমরাও তাহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাইতেছি না। আমরা আরো এরূপ শুনিয়াছি যে বালিকাদিগের শিল্পকর্ম্ম শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় হইতে পশম, কাপড় ইত্যাদি না পাওয়ায় তিনি স্বয়ং তাহাদিগকে ঐ সকল দ্রব্য দিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের অর্থ দ্বারা যে সামান্য ফল লাভ হইতেছে যদি এই অর্থের প্রকৃত ব্যবহার হয় তাহা হইলে উহা দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার বিলক্ষণ উন্নতি সাধিত হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত পত্র বলিয়াছে যে এ দেশীয় স্ত্রীশিক্ষানুরাগী অনেক শিক্ষিত লোক শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের আবশ্যকতা বোধ করিতেছেন, অতএব ঐ বিদ্যালয়ের প্রশস্ত অট্টালিকা এবং প্রচুর অর্থ ঐরূপ কার্য্যে যদি নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে বহুল পরিমাণে স্ত্রীশিক্ষার যথার্থ উন্নতি হইতে পারে। ফলতঃ মহাত্মা বেথুন সাহেবের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টির দ্বারা যাহাতে স্ত্রীশিক্ষার সম্যক উন্নতি হইতে পারে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্টের এবং ঐ বিদ্যালয়সভার মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। উপযুক্ত বাটী এবং আবশ্যক অর্থ অভাবে যখন স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির মহৎ সঙ্কল্প সকল ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, তখন স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এরূপ অর্থের অপব্যয় দেখিলে দেশহিতৈষী ব্যক্তিমাত্রেই তাহাতে দুঃখিত হইবেন।

বামাবোধিনী, পৌষ ১২৭৪